গোলাম মুরশিদ

মুক্তিযুদ্ধ ও তারপর

একটি নির্দলীয় ইতিহাস

মুক্তিযুদ্ধ ও তারপর : একটি নির্দলীয় ইতিহাস

গোলাম মুরশিদ

প্রথমা

যে সীমাহীন ত্যাগের মধ্য দিয়ে
স্বাধীনতা এসেছিল, তা মানুষের মনে
কী স্বপ্ন জন্ম দিয়েছিল
বাস্তবে তাঁরা কী পেলেন, এবং
কোন আদর্শের ভিত্তিতে
বাংলাদেশ নির্মিত হয়েছিল এবং শেষ
পর্যন্ত কোন পথে গেল সেই বাংলাদেশ—
সে সম্পর্কে নিরপেক্ষ ইতিহাস দুর্লভ।
এ বইতে লেখক মুক্তিযুদ্ধ এবং তারপরের
বাংলাদেশ সম্পর্কে একটি সঠিক চিত্র
তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।
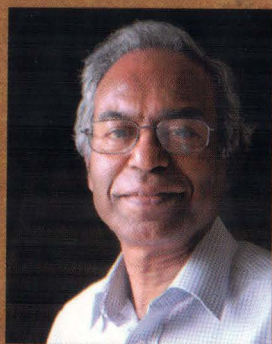
গোলাম মুরশিদ

গবেষক ও লেখক। ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, সংস্কৃতি, মানবীবিদ্যা ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে তাঁর বিচরণ। ১৯৮৩ সালে প্রকাশিত বাঙালি নারীদের আধুনিকায়ন-সম্পর্কিত তাঁর গ্রন্থ *রিলাক্ট্যান্ট ডেবিউটান্ট* এই উপমহাদেশে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছিল। ১৯৯৪ সালে প্রকাশিত তাঁর মাইকেল-জীবনী *আশার ছলনে ভুলি*তে তিনি কিংবদন্তির ধূম্রজাল থেকে মুক্তি দিয়ে মাইকেলের জীবন বস্তুনিষ্ঠভাবে পুনর্নির্মাণ করেছিলেন। ২০০৬ সালে প্রকাশিত তাঁর *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি* এমনই একটি মননশীল এবং পথিকৃতের কাজ। পুরোনো বাংলা গদ্যের ইতিহাস রচনায়ও তিনি অসাধারণ অবদান রেখেছেন। *রবীন্দ্রনাথ, বিলেতে বাঙালিদের ইতিহাস, নারী-প্রগতি* ইত্যাদি নানা বিষয়ে তাঁর গবেষণা বাংলা সাহিত্যের জগৎকেই বস্তুত সমৃদ্ধ করেছে।

বহু বছর অধ্যাপনা এবং বেতার সাংবাদিকতা করেছেন। সিকি-শতাব্দীরও বেশি কাল তিনি প্রবাসী।

প্রচ্ছদ শিল্পী : কাইয়ুম চৌধুরী

মুক্তিযুদ্ধ ও তারপর : একটি নির্দলীয় ইতিহাস

দশম মুদ্রণ : চৈত্র ১৪২২, মার্চ ২০১৬
প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৪১৬, জানুয়ারি ২০১০
প্রকাশক : প্রথমা প্রকাশন
সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫, বাংলাদেশ
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : কাইয়ুম চৌধুরী
সহযোগী শিল্পী : অশোক কর্মকার
মুদ্রণ : কমলা প্রিন্টার্স
৪১ তোপখানা, ঢাকা ১০০০

মূল্য : ৪৫০ টাকা

Muktijuddha O Tarpor : Ekti Nirdaliyo Itihas
by Ghulam Murshid
Published in Bangladesh by Prothoma Prokashan
CA Bhaban, 100 Kazi Nazrul Islam Avenue
Karwan Bazar, Dhaka 1215, Bangladesh
Telephone: 8180081
e-mail: prothoma@prothom-alo.info

Price : Taka 450 only

ISBN 978 984 8765 37 1

উৎসর্গ

যাঁদের ত্যাগের বিনিময়ে আজ আমরা স্বাধীন
—'সবারে আমি নমি'।

ভূমিকা

মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিলো প্রায় চল্লিশ বছর আগে। নিরাসক্ত ইতিহাস রচনার জন্যে সময়ের যে-দূরত্ব দরকার, চল্লিশ বছর তার জন্যে কম নয়। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে ইতিমধ্যে যে-শতাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যে সত্যি সত্যি কী হয়েছিলো, কেন হয়েছিলো, তার ফলাফলই বা কী হলো, কার কেমন অবদান ছিলো—এর নির্লিপ্ত পরিচয় কমই মেলে।

মুক্তিযোদ্ধারা নিজেরা যেসব ইতিহাস লিখেছেন, তার মধ্যে নিজেদের ভূমিকাকে বড়ো করে দেখার একটা প্রবণতা আছে। যাঁরা দেশের ভেতরে অথবা বাইরে থেকে এই যুদ্ধকে দেখেছিলেন, তাঁরা অনেকে আংশিক দৃষ্টিতে দেখেছেন। যাঁরা কেবল অন্যের রচনার ওপর ভিত্তি করে লিখেছেন, নিজেদের কোনো অভিজ্ঞতা ছিলো না, তাঁরা যুদ্ধের সত্যিকার পরিবেশের পরিচয় দিতে পারেননি। ভারতীয় এবং পাকিস্তানী যে-সেনাপতিরা লিখেছেন, তাঁরাও নিজেদের দিকটাই প্রধান করে তুলেছেন।

কিন্তু সবচেয়ে বিকৃত ইতিহাস লিখেছেন, যাঁরা দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে মুক্তিযুদ্ধকে দেখেছেন, তাঁরা। বিশেষ করে রাজনৈতিক বিশ্বাস এবং দলীয় আনুগত্যের কারণে অনেকে রীতিমতো ইতিহাস দখলের প্রয়াস চালিয়েছেন। তদুপরি, মুক্তিযুদ্ধের ভিত্তিতে যে-বাংলাদেশ গঠিত হয়েছিলো, কয়েক বছরের মধ্যে তার চেহারা বদলে যাওয়ায়, তরুণ সমাজ যে-ইতিহাসের কথা শুনেছেন, তার অনেকটাই ভিত্তিহীন অথবা আংশিক সত্য। আংশিক সত্য কোনো কোনো সময় মিথ্যার চেয়েও খারাপ। আমাদের তরুণ প্রজন্ম তাই মুক্তিযুদ্ধের যে-ইতিহাস নিজেদের পাঠ্যপুস্তক এবং কিংবদন্তী থেকে জানেন, তা সঠিক নয়। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের কথা ভেবেই এ বই লিখেছি। তাঁরা পড়লে পরিশ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো।

আমার এই বইতে আমি একটি নির্দলীয় ইতিহাস লিখতে চেষ্টা করেছি। জ্ঞানত কাউকে ছোটো করে দেখিনি। কাউকে পূজার আসনেও বসাইনি। যাঁর যতোটুকু প্রাপ্য, তাঁকে ততোটাই দিতে চেষ্টা করেছি। মানুষ মাত্রেই ভুল করে। সব মানুষই দোষেগুণে মানুষ। তাই বহু বিখ্যাত ব্যক্তির অবদানের পাশাপাশি তাঁদের সীমাবদ্ধতার কথাও পরিষ্কার করেই বলতে হয়েছে। বাংলাদেশে বর্তমানে রাজনীতির যে-মেরুকরণ হয়েছে, তাতে এ রকম নিরপেক্ষ কথা বলাও মুশকিল। আমি জীবনে কোনো দলীয় রাজনীতিতে অংশ নিইনি। ছাত্রজীবনেও না। আমি কারো তল্পিবাহক নই, কারো প্রতি আমার ব্যক্তিগত বিদ্বেষও নেই। তাই যা লিখেছি, সত্য জেনেই লিখেছি।

ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে যুদ্ধের সময়কার বিদেশী পত্রপত্রিকা ব্যবহার করার সুযোগ দিয়েছেন শাহাবুদ্দীন চৌধুরী। ড. কামাল হোসেন, বীর উত্তম রফিকুল ইসলাম এবং মুজাহিদুল ইসলাম সেলিমের সঙ্গে তিনটি সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করে দেন স্নেহভাজন বিধানচন্দ্র পাল। তা ছাড়া, তিনি জিয়াউর রহমানের একটি দুর্লভ প্রবন্ধ জোগাড় করে দেন। তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

আমাদের দেশে লেখার সময় অনেকের হয়। কিন্তু অন্যের লেখা পড়ার সময় হয় না। তা সত্ত্বেও *প্রথম আলোর* মতিউর রহমান, স্বরোচিষ সরকার এবং আহসানুল মামুন চৌধুরী যত্নের সঙ্গে আমার খসড়া পড়ে বিস্তারিত মন্তব্য করেছেন। বইটি প্রকাশে আগ্রহ দেখিয়েছেন *প্রথম আলো* পত্রিকার সাজ্জাদ শরিফ। খুব কম সময়ের মধ্যে বইটি ছাপানো সম্ভব হয়েছে *প্রথমা প্রকাশনের* অরুণ বসু, তারা রহমান আর অশোক কর্মকারের ব্যক্তিগত উদ্যোগের ফলে। এঁদের সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তাড়াহুড়ো করে লেখার ফলে ভুলত্রুটি দু-এক জায়গায় থাকতে পারে—নামে, তারিখে। কিন্তু মূল যুদ্ধের স্পিরিট এবং পরিবেশ তার ফলে নষ্ট হয়নি বলেই বিশ্বাস করি।

লন্ডন
ডিসেম্বর ২০০৯

গোলাম মুরশিদ

সূচিপত্র

বাংলা ও বাঙালির কথা

এখন যাকে বলা হয় বাংলাদেশ, আগে তা ছিলো বৃহত্তর বঙ্গদেশের একটা অংশ। পুব দিকের অংশ বলে এর নাম ছিলো পূর্ববঙ্গ অথবা পূর্ববাংলা। আর পশ্চিম দিকের অংশের নাম পশ্চিম বাংলা—যা এখন ভারতের একটা রাজ্য। এই দুই বাংলায় হিন্দু আর মুসলমানের সংখ্যা ছিলো প্রায় সমান। কিন্তু ১৮৮০ সালের দিকে মুসলমানদের সংখ্যা হিন্দুদের ছাড়িয়ে যায়। মুসলমানরা বেশির ভাগ বাস করতেন পূর্ববাংলায়; আর, হিন্দুদের বেশির ভাগ পশ্চিম বাংলায়। তাই বলা যায়, বঙ্গদেশের দুই অংশ যেমন দুই রাষ্ট্রে বিভক্ত, ধর্মের দিক দিয়েও বঙ্গদেশ দু ভাগে বিভক্ত। কিন্তু দুই বাংলাতেই যা এক, তা হলো বাংলা ভাষা।

সামাজিক শ্রেণী হিশেবেও বাঙালিদের পরিষ্কার দুটি ভাগ ছিলো। আগে সমাজের উপর তলায় বাস করতেন উচ্চবর্ণের হিন্দুরা আর সামান্য কিছু উর্দু-ভাষী মুসলমান। বাকি শতকরা ৯০ জনেরও বেশি ছিলেন গ্রামের মুসলমান আর নিচু জাতের হিন্দু। গ্রামের এই মুসলমানরা এবং নিম্নবর্ণের হিন্দুরা লেখাপড়া সামান্যই জানতেন। এঁরা প্রায় সবাই ছিলেন চাষী, জেলে, কামার, কুমোর, ছুতোর, জোলা ইত্যাদি। লেখাপড়া না-শিখে, পূর্বপুরুষের পেশাই পালন করতেন তাঁরা। পুরুষের পর পুরুষ চাষীর ছেলে চাষ করতো, জেলের ছেলে মাছ ধরতো, নাপিতের ছেলে নাপিত হতো। তেমনি ব্যবসায়ীর ছেলে ব্যবসায়ী হতো, তাঁতির ছেলে তাঁতি হতো ইত্যাদি। এসব পেশা থেকে যথেষ্ট আয় হতো বলে লেখাপড়া শেখার প্রয়োজন তাঁরা বোধ করেননি।

কিন্তু ইংরেজ আমলে সমাজের চেহারা দ্রুত পাল্টে যেতে আরম্ভ করলো। এ সময়ে রাজধানী কলকাতায় ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শিক্ষার নতুন পথ খুলে গেলো। এর সুযোগ নিলেন কলকাতা এবং ঐ অঞ্চলের উচ্চবর্ণের হিন্দুরা। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, বৈদ্য. আর কায়স্থরা। এঁরা ছিলেন হিন্দুদের মোটামুটি পাঁচ ভাগের এক ভাগ। লেখাপড়া

শিখে শতাব্দীর পর শতাব্দী তাঁরা সমাজে প্রভাব-প্রতিপত্তি খাটিয়েছেন। ব্রাহ্মণরা পুরুতগিরি করতেন, লেখাপড়া শেখাতেন, জমিদারের চাকরি করতেন ইত্যাদি। এমন কি, অনেকে জমিদারও ছিলেন। এই জমিদারের ছেলেরা আবার জমিদার হতেন। বৈদ্য অর্থাৎ চিকিৎসকের ছেলেরা বৈদ্য হতেন। কায়স্থরাও লেখাপড়া শিখে নানা রকমের চাকরি করতেন। সংখ্যার দিক দিয়ে এই উচ্চবর্ণের হিন্দুরা কম ছিলেন, কিন্তু এঁরাই ধনী ছিলেন এবং ছিলেন সমাজের প্রভাবশালী অংশ।

উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানদের সংখ্যা ছিলো আরও কম। মোট মুসলমানদের শতকরা দু ভাগের চেয়েও কম। তাঁরা বেশির ভাগই এসেছিলেন বাংলার বাইরে থেকে। তাঁদের অনেকেই তাই নিজেদের বাঙালি বলে শনাক্ত করতেন না। অনেকে কথাও বলতেন উর্দু ভাষায়। গ্রামের বদলে তাঁরা বেশির ভাগ বাস করতেন শহরে। তাঁরা ছিলেন জমিদার অথবা শিক্ষার সঙ্গে জড়িত কোনো পেশায় লিপ্ত। তখনকার সরকারী ভাষা ছিলো ফারসি। এঁদের বেশির ভাগই ফারসিতে শিক্ষিত ছিলেন। আর্থিক দিকে দিয়ে তাঁরা ছিলেন ধনী অথবা মধ্যবিত্ত।

অপর পক্ষে, সাধারণ মুসলমানরা গ্রামে বাস করতেন। কথা বলতেন বাংলায়। তাঁদের মধ্যে খুব কম লোকই লেখাপড়া জানতেন। এঁরা বেশির ভাগই ছিলেন চাষী। অনেকে ছিলেন তাঁতি, দরজি, জেলে, ঘরামি অথবা অন্য কোনো পেশায় লিপ্ত। এসব থেকে তাঁরা যে-আয় করতেন, তাই দিয়ে তাঁদের কোনোমতে দিন চলে যেতো। পেশা বদল করার কথা, অথবা লেখাপড়া শেখার কথা তাঁরা ভাবতেন না।

কিন্তু, আগেই বলেছি, সমাজে মস্ত পরিবর্তন এসেছিলো ইংরেজ আমলে। ঈস্ট ইন্ডিয়া কম্পেনির সদস্য হিশেবে ইংরেজরা বঙ্গদেশে এসেছিলেন ব্যবসা-বাণিজ্য করতে। দেশ জয় অথবা শাসন করতে তাঁরা আসেননি। গঙ্গার ধারে দক্ষিণ বাংলার তিনটি গ্রাম—কলকাতা, গোবিন্দপুর আর সুতানুটি—কিনে নিয়ে সেখানে তাঁরা ব্যবসার কেন্দ্র খুলে বসেন। সেটা ১৬৯০ সালের কথা। কিন্তু স্বার্থ নিয়ে গোল বাধায়, ১৭৫৬ সালে বঙ্গদেশের নবাব সিরাজউদ্দৌলার সঙ্গে তাঁদের গোল বাধে। এ বছর নবাব কলকাতা আক্রমণ করে বহু ইংরেজকে হত্যা করেন। পরের বছর পলাশীতে ঈস্ট ইন্ডিয়া কম্পেনির যুদ্ধ হয় নবাবের সঙ্গে। এই যুদ্ধে নবাব হেরে যান। ফলে ব্যবসায়ী ইংরেজরাই বঙ্গদেশের শাসনকর্তায় পরিণত হন। এভাবে শুরু হয় ইংরেজ রাজত্ব। তবে ১৭৫৭ সালের পরও ইংরেজরা বছর পনেরো মুরশিদাবাদের নবাবদের নামে-মাত্র শাসক হিশেবে রেখেছিলেন। রাজধানীও ছিলো মুরশিদাবাদে। তারপর রাজধানী আসে কলকাতায়। এ জায়গায় যাঁরা বাস করতেন, তাঁরা বেশির ভাগ ছিলেন হিন্দু। মুসলমানও ছিলেন, কিন্তু তাঁরা ছিলেন আধা-বাঙালি, কথাবার্তা বলতেন উর্দুতে।

এই কলকাতাকে ঘিরে দুটি বিরাট পরিবর্তন এসেছিলো বাঙালি সমাজে। প্রথমত, ইংরেজদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করে হিন্দুদের মধ্যে একটা বড়ো

ব্যবসায়ী সম্প্রদায় তৈরি হলো। এই ব্যবসায়ীদের অনেকে আবার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের (১৭৯৩) পরে জমিদারী কিনে জমিদার হলেন। এ ছাড়া কলকাতায় ঘটলো শিক্ষার বিকাশ। কারণ তখন কেউ ইংরেজি শিখতে পারলে চাকরি-বাকরি করে দ্রুত ধনী হতে পারতেন। যেমন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্বপুরুষরা বাস করতেন খুলনায়। তাঁরা ছিলেন গরিব ব্রাহ্মণ। কলকাতার জেলেদের আহ্বানে সেখানে গিয়ে তাঁরা বাস করতে আরম্ভ করেন তাঁদের পুরোহিত হিশেবে। কিন্তু তাঁরা কেবল পুরুতগিরি করতেন না। তাঁদের কেউ কেউ ইংরেজি শিখে এবং তাদের সঙ্গে ব্যবসা করে খুব কম সময়ের মধ্যে ধনী হয়েছিলেন। এমন কি, কেউ কেউ ফরাসি ভাষা শিখে ফরাসি ব্যবসায়ীদের সঙ্গেও ব্যবসা করেন। অথবা তাদের চাকরি করেন। তারপর তাঁরা জমিদারি কিনে জমিদার হন।

কলকাতার নতুন জমিদার এবং ব্যবসায়ীদের প্রায় সবাই ছিলেন উচ্চবর্ণের হিন্দু। এভাবে নতুন যে-বাঙালি সমাজ গড়ে উঠলো, তার নেতা হলেন উচ্চবর্ণের হিন্দুরা। পুরো উনিশ শতক ধরে চলতে থাকে এঁদেরই প্রতিপত্তি। তাঁরাই জমিদার, তাঁরাই মহাজন। আর তাঁদের প্রজারা ছিলেন নিম্নশ্রেণীর হিন্দু এবং মুসলমান। এই প্রজাদের ওপর এই জমিদার আর মহাজনরা অনেক অত্যাচার এবং শোষণ করতেন। পুব বাংলায় এই হিন্দু জমিদার এবং মহাজনদের অধিকাংশ প্রজা এবং খাতকরা ছিলেন মুসলমান। এভাবে উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে পুব বাংলায় হিন্দু আর মুসলমানদের সম্পর্ক বেশ তিক্ত হয়ে ওঠে।

ইংরেজি শিখলে রাতারাতি ধনী হওয়া যেতো, কিন্তু ইংরেজি শেখার সুযোগ মুসলমান অথবা নিম্নবর্ণের হিন্দুরা পাননি। কারণ, শিক্ষা গ্রহণ করা সেকালে খুব ব্যয়সাপেক্ষ ছিলো। তা ছাড়া, ইংরেজি শেখার কেন্দ্র ছিলো কলকাতা। কিন্তু সেখানে নিম্নবর্ণের হিন্দু এবং মুসলমান কমই বাস করতেন। তার ওপর, ঐ অঞ্চলের অভিজাত মুসলমানরা ইচ্ছে করেই ইংরেজি শেখেননি। ইংরেজদের তাঁরা শত্রু বলে গণ্য করতেন। কারণ ইংরেজরা মুসলমান নবাবদের পরাজিত করে বঙ্গদেশ দখল করেছিলেন। মোট কথা, শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করে উঁচুবর্ণের হিন্দুরা চাকরি-বাকরি পেলেন এবং সেই সুবাদে ধনী হলেন। উনিশ শতকের বাঙালি সমাজে এঁরাই শিক্ষাদীক্ষা এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেন। বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সঙ্গীতের বিকাশ ঘটান। অপর পক্ষে, শিক্ষা গ্রহণ না-করায় নিম্নশ্রেণীর হিন্দু এবং মুসলমানরা পড়ে থাকলেন পেছনে।

এই বৈষম্যের ফল ভালো হয়নি। কারণ, উচ্চবর্ণের হিন্দুরা ছিলেন জমিদার, ব্যবসায়ী, তালুকদার, জোতদার, অফিসের চাকুরে, শিক্ষক ইত্যাদি। আর সাধারণ মুসলমান এবং নিচু শ্রেণীর হিন্দুরা ছিলেন অশিক্ষিত ও গরিব। হিন্দু আর মুসলমানদের এই ভেদাভেদ থেকেই পরে তাঁদের সম্পর্ক তিক্ত হয়ে ওঠে এবং তাঁরা একে অন্যের সঙ্গে বাস করতে আপত্তি করেন।

অবশ্য এর পেছনে রাজনৈতিক কারণও ছিলো। যেমন, শাসনের প্রথম এক শো বছর ইংরেজরা দেশীয়দের কাছ থেকে তেমন বিরোধিতার মুখোমুখি হননি। কিন্তু ১৮৫৭ সালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় বহু দেশীয় সৈন্য ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। এই বিদ্রোহের নাম সিপাহী বিপ্লব। খুব কঠিন হাতে ইংরেজরা এটা দমন করেছিলেন। এই বিদ্রোহের প্রতি বঙ্গদেশের শিক্ষিত হিন্দুদের কোনো সমর্থন ছিলো না। তাঁরা ইংরেজদেরই সমর্থন করেছেন। কারণ ইংরেজদের আগমনের ফলেই তাঁদের ভাগ্যের অতো উন্নতি হয়েছিলো। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো : এর বছর দশেক পরেই বাঙালি হিন্দুরা ধীরে ধীরে জাতীয়তাবাদী হয়ে ওঠেন। এর অর্থ : তাঁরা দেশকে ভালোবাসতে আরম্ভ করলেন। নিজেদের হিন্দু পরিচয়কে বড়ো করে তুললেন। দেশটা যে ইংরেজদের অধীনে আছে, সেটা তাঁদের আর পছন্দ হলো না। নিজেদের ঐক্যবদ্ধ করার জন্যে তাঁরা 'হিন্দু মেলা' (১৮৬৭) গঠন করলেন। সেখানে হিন্দুদের কীর্তি এবং বীরত্বের প্রদর্শনী হতো। তা ছাড়া, তাঁরা নিজেদের পত্রিকা প্রকাশ করলেন। দেশপ্রেমের গান লিখলেন ইত্যাদি। তবে জাতি বলতে তাঁরা তখন বোঝাতেন কেবল হিন্দুদের। মুসলমানদের নয়।

এরও বছর দশেক পরে ১৭৭৬ সালে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' নামে রাজনৈতিক দল গঠন করলেন। সেও হিন্দুদেরই প্রতিষ্ঠান। এই সমিতি সরাসরি স্বাধীনতার দাবি করলো না। কিন্তু চাইলো আরও রাজনৈতিক অধিকার। তারপর ১৮৮৫ সালের ডিসেম্বরে গঠিত হলো 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস'। এটি ছিলো রীতিমতো একটি রাজনৈতিক দল। এই দলেরও প্রায় সব সদস্য হিন্দু ছিলেন। আর নেতাদেরও বেশির ভাগ ছিলেন বাঙালি হিন্দু। তবে বলা দরকার যে, হিন্দু নেতারা মুসলমানদের ইচ্ছে করে বাদ দিলেন, তা নয়; আসলে মুসলমানদের মধ্যে তখন রাজনীতি-সচেতন লোক কমই ছিলেন।

মোট কথা, উনিশ শতকের শেষ দিকে শিক্ষিত হিন্দুরা দেশের নামে ঐক্যবদ্ধ হতে আরম্ভ করলেন। কেবল রাজনৈতিক অধিকার নয়, শিক্ষিত সম্প্রদায় হিশেবে চাকরি-বাকরিও তাঁরা বেশি দাবি করলেন। কিন্তু সোজাসুজি ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলন না-করে, আগেকার মুসলিম শাসনের সমালোচনা করতে আরম্ভ করেন তাঁরা। ফলে অনেকের মধ্যে মুসলমানদের প্রতি একটা বিদ্বেষও দেখা দিলো। এই বিদ্বেষ প্রকাশ করার জন্যে তাঁরা আগের মুসলিম শাসকদের অনেক নিন্দা করতেন। আর সাধারণ মুসলমানদের প্রতিও তুচ্ছতার ভাব দেখাতেন। তাঁদের গাল দিতেন 'যবন' বলে। যবন কথাটার মূল অর্থ বিদেশী। কিন্তু এর মধ্য দিয়ে একটা ঘৃণার ভাব প্রকাশ পেতো। বিশেষ করে হিন্দু লেখকদের রচনায় এবং আচরণে এই বিদ্বেষ প্রকাশ পেতো। যেমন, তখনকার সবচেয়ে বিখ্যাত এবং জনপ্রিয় লেখক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর উপন্যাস এবং অন্যান্য লেখায় মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষের মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন।

মুসলিম জাগরণের সূচনা

সিপাহী বিপ্লবের পর ইংরেজরা দেশ-শাসনের নতুন কৌশল গ্রহণ করেন। তাঁরা আর কেবল অ-মুসলমানদের ওপর নির্ভর করতে পারলেন না। ঠিক করলেন যে, তাঁরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের কাজে লাগাবেন, আর মুসলমানদের কাজে লাগাবেন হিন্দুদের বিরুদ্ধে। আসলে হিন্দুদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনা প্রবল হয়ে ওঠায় মুসলমানদের কাজে লাগানোর প্রয়োজন দেখা দিলো। এই নীতিকে বলা হতো 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল'। অর্থাৎ দেশের জনগণকে দুই ভাগে ভাগ করে এক ভাগকে অন্য ভাগের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দেওয়া। কিন্তু বাঙালি হিন্দুদের বিরুদ্ধে বাঙালি মুসলমানদের কাজে লাগানো অতো সহজ ছিলো না। কারণ বাঙালি মুসলমানরা হিন্দুদের তুলনায় অনেক পিছিয়ে ছিলেন—শিক্ষাদীক্ষায়, টাকাপয়সায়, সামাজিক অবস্থানের দিক দিয়ে।

ইংরেজরা তাই মুসলমানদের খানিকটা সুযোগ-সুবিধা দিয়ে তাঁদের সামাজিক অবস্থান একটু উন্নত করতে চাইলেন। এই বাড়তি সুযোগসুবিধা দেওয়ার বিষয়টাকে ন্যায্য প্রমাণ করার জন্যে সরকার ১৮৭২ সালে উইলিয়াম হান্টারকে দিয়ে মুসলমানদের সম্পর্কে একটি বই লেখালেন—*ইন্ডিয়ান মুসলমানস* নামে। এতে হান্টার দেখাতে চেষ্টা করেছিলেন যে, ইংরেজ আমলে মুসলমানরা অর্থনৈতিক এবং সামাজিক দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এবং পিছিয়ে পড়েছেন হিন্দুদের তুলনায়। সরকার তখন এর প্রতিকার করার জন্যে মুসলমানদের শিক্ষার সুযোগ বাড়াতে চেষ্টা করলেন। এবং চাকরিতে একই যোগ্যতা-সম্পন্ন হিন্দু এবং মুসলমান প্রার্থীর মধ্যে মুসলমান প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়ার নীতি গ্রহণ করলেন। ছোটোখাটো কিছু চাকরিও দেওয়া হলো তাঁদের।

শিক্ষার হার বাড়ানোর জন্যে কিছু মক্তব-মাদ্রাসাও খোলা হলো। এর ফলে ১৮৯০-এর দশক থেকে শিক্ষা এবং চাকরিবাকরি সম্পর্কে মুসলমানদের মধ্যে কিছু

সচেতনতা দেখা দিলো। তবে যা বিস্ময়ের কারণ, তা হলো : সমাজের মুসলমান নেতারা সাধারণ শিক্ষার বদলে তখনো দাবি করেছেন মক্তব-মাদ্রাসার শিক্ষা অর্থাৎ ইসলামী শিক্ষা। এসব মক্তব-মাদ্রাসার লেখাপড়ার মান ছিলো খুব নিচু। তখনকার শিক্ষা বিভাগের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, সাধারণ প্রাইমারিতে যে-ছাত্ররা পড়তো, তারা চিঠি লিখতে এবং সাধারণ অঙ্ক করতে পারতো। কিন্তু মক্তবের ছাত্ররা চিঠি লেখার অথবা সাধারণ অঙ্ক করার মতো শিক্ষা পেতো না। অর্থাৎ খানিকটা সচেতন হলেও, মুসলমানরা ইহলৌকিক শিক্ষার ধারা অনুসরণ করে আধুনিকতার দিকে এগিয়ে যেতে চেষ্টা করেননি।

এ সত্ত্বেও, বিশ শতকের প্রথম ২০/৩০ বছর সরকার মুসলমানদের সামনের দিকে ঠেলে দেওয়ার জন্যে আরও ছোটোখাটো পদক্ষেপ নিয়েছিলো। যেমন, শিক্ষা বিভাগে মুসলিম কর্মচারী নিয়োগ। যেমন, মক্তব-মাদ্রাসার জন্যে কিছু বাড়তি অর্থ বরাদ্দ। এমন কি, ১৯২০-এর দশকে বঙ্গদেশের শিক্ষামন্ত্রীও নিয়োগ করা হয় মুসলমান দেখে, যাতে তাঁরা ব্যক্তিগত আগ্রহ এবং উদ্যোগ দেখান। এসব পদক্ষেপ নেওয়া সত্ত্বেও বিশ শতকের প্রথম দিকে মুসলমানদের অবস্থার বিশেষ উন্নতি হয়নি। কারণ, গ্রামের বিরাট সংখ্যক মুসলমানের মধ্যে এ ব্যাপারে তখনও সচেতনতা দেখা দেয়নি। আর, যদি বা কেউ সচেতন হয়ে থাকেন, তা হলেও শহরের স্কুলে ইংরেজি শিক্ষা নেওয়ার মতো সঙ্গতি তাঁদের ছিলো না। উইলিয়াম হান্টার লিখেছেন যে, ১৮৭২ সালে জেলা স্কুলগুলোতে নবম-দশম শ্রেণীতে মাসে ছাত্র-বেতন ছিলো চার টাকা। আর তখন দিন-মজুরদের সারা দিনের বেতন ছিলো দু আনা। সাধারণ চাষী মুসলমানদের পক্ষে সে জন্যে ইচ্ছে থাকলেও ছেলেদের ইংরেজি স্কুলে পড়ানোর উপায় ছিলো না।

শুধু তাই নয়, মুসলমান নেতারা অনেকে পিছিয়ে থাকার আত্মঘাতী অবস্থান নিয়েছিলেন। যেমন, তাঁরা সহজে বাংলাকে মাতৃভাষা হিশেবে স্বীকার করতে চাননি। কেউ কেউ বাংলার বদলে ছেলেদের পড়াতে চেয়েছেন আরবি-ফারসি। ইংরেজি শেখার দিকেও তাঁরা উৎসাহ দেখাননি। অর্থাৎ যেসব বিষয় লেখাপড়া করলে চাকরি-বাকরি পাওয়া যাবে, আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে, তাতে তাঁদের আগ্রহ ছিলো না। এটা যদি কেবল অবাঙালি মুসলমানরা করতেন, তা হলে তার মানে বোঝা যেতো। কিন্তু ১৯২২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যখন বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম করার সিদ্ধান্ত নেয়, তখন বাঙালি মুসলমান নেতারাও তাতে আপত্তি করেছিলেন। যেমন, ফজলুল হক ছিলেন বরিশালের একটি গ্রামের অধিবাসী। কিন্তু তিনি ব্যবস্থাপক সভায় বাংলার বিরোধিতা করেছিলেন। কেবল তাই নয়, কয়েক মাস পরে বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম করার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নিতে তিনি মুসলমান ছাত্রদের উৎসাহ দিয়েছিলেন।

সত্যি বলতে কি, কেবল মুসলমান নেতারাই নন, সাধারণ মুসলমানদের মধ্যেও অনেকে মনে করতেন যে, বাংলা হিন্দুর ভাষা, মুসলমানের ভাষা নয়। সুতরাং বাংলা ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করা হলে হিন্দুরা যতোটা লাভবান হবেন, মুসলমানরা ততোটা হবেন না। তা ছাড়া, বাংলা শিক্ষায় পিছিয়ে থাকায়, তাঁরা মনে করতেন যে, বাংলার মাধ্যমে তাঁরা হিন্দুদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এঁটে উঠতে পারবেন না। অপর পক্ষে, একটি ভিন্ন ভাষাভাষী সম্প্রদায় হিশেবে নিজেদের প্রমাণ করতে পারলে, তাঁরা তাঁদের স্বার্থ রক্ষা করতে পারবেন।

বিশ শতক গোড়ায় লেখাপড়ায় হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানরা কতোটা পিছিয়ে ছিলেন, তার দু-একটা তথ্য দেওয়া যেতে পারে।

১৯০১ সালে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু ও বঙ্গের মুসলমান পুরুষদের লেখাপড়ার হার		
	হিন্দুদের হার	মুসলমানদের হার
সাধারণ শিক্ষা	২১.৮%	৯.৭%
ইংরেজি শিক্ষা	৯.৭%	০.৮৫

উচ্চশিক্ষায় মুসলমানরা পিছিয়ে ছিলেন আরও বেশি। পাঞ্জাব থেকে বর্মা পর্যন্ত বিরাট এলাকায় ১৮৫৭ সাল থেকে ১৯০১ সালের মধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যতোজন বিএ পাশ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা ছিলো মাত্র ৩৩৮ (শতকরা ৪.৫); আর বাঙালি হিন্দুদের মধ্যে কেবল 'মুখোপাধ্যায়' পদবীধারী গ্র্যাজুয়েটের সংখ্যাই ছিলো ৫১৮ (শতকরা ৭)। অথচ মুখোপাধ্যায়দের সংখ্যা মোট হিন্দুদের শতকরা ০.৫ ভাগেরও কম। কিন্তু এই বৈষম্য সত্ত্বেও মুসলমানরা স্বেচ্ছায় নিজেদের মক্তব-মাদ্রাসার মধ্যে বন্দী রেখে আত্মঘাতী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। বাংলা এবং ইংরেজি ভাষা সম্পর্কে তাঁদের মনোভাব সত্যিকার অর্থে উন্নতির পথে বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলো।

বাংলা ভাষা নিয়ে মুসলমানদের বিতর্ক

বঙ্গদেশে মুসলমানদের শাসন আরম্ভ হয় ১২০৪ সালে। তখন থেকে এ দেশে বেশ জোরে-শোরে ইসলাম ধর্ম প্রচারিত হয়। এবং দেশীয় লোকেদের মধ্যে অনেকেই এ ধর্ম গ্রহণ করেন। শিক্ষিত লোক তখন ছিলেন খুবই কম। কাজেই সবাই যে মুসলমান হয়ে সুরা-কালাম শিখে ইসলাম ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান ঠিকমতো পালন করতেন, তা নয়। বরং মধ্যযুগের সাহিত্য থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, দেশীয়রা নামে মাত্র মুসলমান ছিলেন। মুসলমান হয়েও আসলে পালন করতেন পূর্বপুরুষদের আচার-অনুষ্ঠান। বাংলায় কথা বলতেন। এবং পূর্বপুরুষদের পেশা দিয়ে জীবিকা অর্জন করতেন। নিজেরা আরব-ইরান থেকে এসেছেন, এ কথা চিন্তাও করতেন না। কিন্তু উনিশ শতকে এই চিন্তায় পরিবর্তন এলো যখন তাঁদের মধ্যে সামান্য পরিমাণে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে পড়লো। তখন শিক্ষিত মুসলমানরা নিজেদের পরিচয় কী, সে বিষয়ে সচেতন হলেন।

মুসলমানদের প্রতি হিন্দু লেখকদের বিজাতীয় মনোভাব এবং বাংলা ভাষায় হিন্দু উপকরণ মুসলমানদের বাংলা শিখতে এবং বাঙালি বলে ভাবতে বাধা দিতো। ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে মুসলিম সমাজের বিশেষ কোনো যোগাযোগ ছিলো না। ইংরেজি এবং বাংলা শিক্ষায় এগিয়ে ছিলেন বলে তখনকার বাংলা সাহিত্য গড়ে তুলেছিলেন হিন্দু কবি-সাহিত্যিকরাই। অপর পক্ষে, লেখাপড়ার দিকে না-যাওয়ায়, উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে মুসলমানরা তেমন অবদান রাখতে পারেননি। ফলে মুসলমানদের মধ্যে এক ধরনের হীনতার মনোভাব তৈরি হয়েছিলো। এমন কি, তাঁরা বাংলাকে মাতৃভাষা হিশেবে অস্বীকার করলেন।

বাংলার মুসলমানদের মধ্যে যাঁরা মধ্যযুগে বিদেশ থেকে এসে বঙ্গদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করেছিলেন, তাঁরা প্রায় সবাই এ দেশেই বিয়ে করেছিলেন এবং

তাঁদের সন্তান-সন্ততিরা কয়েক প্রজন্মের মধ্যে বাঙালি হয়ে যেতেন। কিন্তু তার পরেও তাঁদের মধ্যে এমন একটি ছোটো জনগোষ্ঠী থেকে যান, যাঁরা বাংলা ভাষাকে নিজেদের ভাষা বলে মেনে নিতে পারেননি। এঁরা নিজেদের দেশ বলে বঙ্গদেশকেও স্বীকার করতে পারেননি। এঁদের সংখ্যা ছিলো খুব কম। যাঁদের পূর্বপুরুষরা বিদেশ থেকে এসেছিলেন বলে দাবি করতেন, ১৮৭২ সালের আদমশুমারি থেকে তাঁদের সংখ্যার আভাস পাওয়া যায়। এতে দেখা যায় যে, তখন শতকরা মাত্র ১ দশমিক ৫ জন মুসলমান দাবি করেছিলেন যে, তাঁদের পূর্বপুরুষরা মধ্যপ্রাচ্য অথবা উত্তর ভারত থেকে বঙ্গদেশে এসেছিলেন।

এই বিদেশ থেকে আসা মুসলমানদের বেশির ভাগ বাস করতেন শহরে, কথা বলতেন উর্দুতে এবং নিজেদের দাবি করতেন আশরাফ বা অভিজাত বলে। কিন্তু শতকরা ৯৮ ভাগ মুসলমান বাস করতেন গ্রামে, কথা বলতেন বাংলায় এবং জীবিকার জন্যে নির্ভর করতেন প্রধানত জমির ওপর। জোলা, দরজি, ঘরামি, কশাই ইত্যাদি পেশায়ও নিয়োজিত ছিলেন অনেকে। আশরাফরা গ্রামের মুসলমানদের ঢালাওভাবে আতরাফ অথবা নিম্নশ্রেণীর মুসলমান বলে চিহ্নিত করতেন এবং দেখতেন অবজ্ঞার চোখে। আশরাফ এবং আতরাফদের মধ্যে খাওয়া-দাওয়া এবং বিয়েও হতো না। এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে আঞ্চলিক ভেদও ছিলো। উর্দুভাষীরা বেশির ভাগই বাস করতেন পশ্চিমবঙ্গে, আর বাংলাভাষীরা পূর্ববঙ্গে। অবাঙালি মুসলমানদের সঙ্গে বাংলাভাষী মুসলমানদের আরও পার্থক্য ছিলো—শিক্ষা এবং আর্থিক দিক দিয়ে। বাংলাভাষী মুসলমানদের তুলনায় অবাঙালি মুসলমানরা এই দুই দিকেই এগিয়ে ছিলেন।

বাংলাভাষী মুসলমানরা যখন লেখাপড়ায় এগিয়ে আসতে শুরু করেন, তখন নিজেদের শিক্ষা এবং পরিচয় নিয়ে তাঁদের মনে অনেক প্রশ্ন জেগেছিলো। তাঁদের সামনে ছিলো শিক্ষিত এবং অভিজাত মুসলমানদের দৃষ্টান্ত—যাঁরা কথা বলতেন উর্দুতে। ভাষার ব্যাপারে আরও একটি মনোভাব কাজ করতো। উর্দু-ফারসি-আরবি ভাষার সঙ্গে একটা ধর্মীয় অনুষঙ্গ ছিলো। এটাও একটা কারণ, যার জন্যে বহু বাঙালি মুসলমান মূল ধারার শিক্ষাকে প্রাসঙ্গিক মনে করতেন না। এমন কি, মক্তব-মাদ্রাসায়ও বাংলা ভাষা পড়ানোও হতো না। বাংলার প্রতি সবচেয়ে বিরোধিতা ছিলো মোল্লা-মৌলবিদের। তাঁরা বাংলাকে হিন্দুর ভাষা অথবা 'কুফুরি জবান' অর্থাৎ কাফেরের ভাষা বলে ফতোয়া দিয়েছিলেন। তাঁরা আরবি-ফারসি-উর্দু জানতেন। তাই ধর্মীয় ব্যবসা এবং প্রতিপত্তি স্থায়ী করে রাখার জন্যে তাঁরা এমন কথা বলতেন।

বাংলা ভাষার প্রতি এই বিরোধিতা সত্ত্বেও বিশ শতকের গোড়ায় শিক্ষিত মুসলমানদের অনেকে বাংলা শেখার প্রয়োজন বোধ করেছিলেন। তাঁরা অনুভব করেছিলেন যে, বাংলা না-শিখলে অথবা বাংলার মাধ্যমে লেখাপড়া না-শেখালে

তাঁদের পক্ষে ব্যাপক হারে শিক্ষিত হওয়া সম্ভব হবে না। এ থেকেই তাঁদের মাতৃভাষা বাংলা কিনা—এ নিয়ে বিশ শতাব্দীর শুরুতেই বিতর্কের সূচনা হয়। এর সবচেয়ে পুরোনো দৃষ্টান্ত হলো ১৯০০ সালে প্রকাশিত *প্রচারক* পত্রিকার "বিবাদ" প্রবন্ধ :

> সহস্র বছর যে দেশে বাস করিয়া আসিতেছি, যাহার শীত, গ্রীষ্ম, সৌভাগ্য, দুর্ভাগ্য, দুর্ভিক্ষ, সুখসম্পদ, হর্ষবিষাদ সমভাবে ভোগ করিয়া আসিতেছি, সে আমার স্বদেশ নহে, তাহার বাহিরে আবার আমার এক নিজের দেশ আছে, এ কথা কখনও কেহ মনে করিতে পারে না।

তিন বছর পর *নবনূরে* বলা হয় :

> বঙ্গভাষা ব্যতীত বঙ্গীয় মুসলমানের মাতৃভাষা আর কি হইতে পারে? যাঁহারা জোর করিয়া উর্দ্দুকে বঙ্গীয় মুসলমানের মাতৃভাষার আসন প্রদান করিয়া সমগ্র ভারতে মুসলমানদের একই মাতৃভাষা করিতে চান, তাঁহারা কেবল অসাধ্য সাধনের প্রয়াস করেন মাত্র।

১৯০৯ সালে *বাসনা* পত্রিকায় হামেদ আলী যা লেখেন, তাও উল্লেখযোগ্য এ প্রসঙ্গে :

> আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ আরব, পারস্য, আফগানিস্থান অথবা তাতারের অধিবাসীই হউন, আর এতদ্দেশবাসী হিন্দুই হউন, আমরা এক্ষণে বাঙ্গালী,—আমাদের মাতৃভাষা বাঙ্গালা। ... যে দেশে আমরা সাত শত বৎসর কাল বাস করিতেছি—সে দেশকে যদি আমরা এখনও স্বদেশ জ্ঞান না করি—তাহার অপেক্ষা আশ্চর্য্য এবং পরিতাপের বিষয় আর কি আছে?

সৈয়দ এমদাদ আলী ছিলেন সেকালের একজন প্রধান মুসলমান লেখক। তিনি লিখেছিলেন যে, 'বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা যে বাঙ্গালা এ বিষয়ে কোন মতদ্বৈধ থাকা উচিত নয়।' তখনকার এই বিতর্কে মওলানা আকরম খাঁও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি ১৯১৮ সালের বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মিলনে সভাপতির ভাষণে সরাসরি এবং অত্যন্ত জোরালো ভাষায় বলেছিলেন :

> দুনিয়াতে অনেক রকম অদ্ভুত প্রশ্ন আছে। 'বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা কি? উর্দ্দু না বাঙ্গালা?' এই প্রশ্নটা তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভুত।

শেখ আবদুল গফুর জালালী এবং মুহম্মদ শহীদুল্লাহও মোটামুটি একই সময়ে বাংলার সমর্থনে বক্তব্য রেখেছিলেন। বিতর্কের শেষে বাঙালি মুসলমানরা বাংলাকে কেবল তাঁদের মাতৃভাষা হিশেবেই স্বীকার করে নেননি, বরং তাকে আগের তুলনায় ভালোওবেসেছিলেন বেশি করে। মোহাম্মদ লুৎফর রহমানের একটি লেখা থেকে এই ভালোবাসার মাত্রা এবং প্রকৃতি বোঝা যায় :

> আমি ভিখারী হইতে পারি, দুঃখ অশ্রুর কঠিন ভারে চূর্ণ হইতে আপত্তি নাই। আমি মাতৃহারা অনাথ বালক হইতে পারি—কিন্তু আমার শেষ সম্বল—ভাষাকে ত্যাগ করিতে পারি না। আমার ভাষা চুরি করিয়া আমার সর্ব্বস্ব হরণ করিও না।

তিরিশের দশকে এসে বাংলা ভাষা নিয়ে মুসলমান সমাজের দ্বিধাদ্বন্দ্ব কেটে যায়। কিন্তু চল্লিশের দশকে পাকিস্তান আন্দোলনের সময়ে তা আবার ফিরে আসে ভিন্ন চেহারায়। তবে মুসলমানদের মাতৃভাষা বাংলা কিনা—এ বিতর্ক তখন আর ফিরে আসেনি। বিতর্ক শুরু হলো বাংলা ভাষা কতোটা মুসলমানী চেহারা নেবে, তা নিয়ে।

বাংলা ভাষা নিয়ে এতো বিস্তারিত আলোচনা করার কারণ, এর সঙ্গে বাঙালি মুসলমানদের স্বরূপের প্রশ্নও ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। যাঁরা বাংলাকে একটা মুসলমানী চরিত্র দিতে চাইলেন, তাঁদের কাছে ধর্মীয় পরিচয়টা গুরুত্বপূর্ণ। আর যাঁরা ভাষার ব্যাপারে ধর্মীয় প্রশ্ন তুললেন না, তাঁদের প্রধান পরিচয় বাংলাভাষী হিশেবে। ধর্মীয় পরিচয় তারপর।

বঙ্গভঙ্গ

বাঙালি হিন্দুরা প্রথম দিকে দেন-দরবারের রাজনীতি শুরু করলেও, ১৯০০ সাল নাগাদ একটা বড়ো রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হন। বিশেষ করে ইন্ডিয়ান কংগ্রেসকে ঘিরে তাঁদের মধ্যে স্বাধীনতার ধারণা দানা বাঁধছিলো। তাঁরা তখন দেশ শাসনে আরও অধিকারও দাবি করছিলেন।

এসব দেখে ইংরেজরা নতুন এক কৌশল নিলেন। তাঁরা ঠিক করলেন, বাঙালি হিন্দুদের রাজনৈতিক ক্ষমতা খর্ব করতে হবে। এর জন্যে তাঁরা তখনকার বৃহত্তর বঙ্গদেশকে ভেঙে দু ভাগ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। পশ্চিম অংশের নাম দেওয়া হলো: "বেঙ্গল"। এই প্রদেশ গঠিত হলো পশ্চিমবঙ্গ, বিহার আর ওড়িষা নিয়ে। এই অংশে বাঙালি হিন্দুদের সংখ্যা ছিলো শতকরা মাত্র ৩২ ভাগ। পূর্ববাংলা আর আসাম নিয়ে গঠিত হলো আর-একটি প্রদেশ। তার নাম হলো: পূর্ববঙ্গ এবং আসাম। এর রাজধানী হলো ঢাকায়। আর এতে মুসলমানদের সংখ্যা দাঁড়ালো শতকরা ৫৮ ভাগে। ফলে দুই প্রদেশেই হিন্দুরা হলেন সংখ্যালঘু। (মিশ্র, ১৯৬১; সু. সরকার, ১৯৭৩) বৃহত্তর বঙ্গদেশকে এভাবে দু ভাগে ভাগ করা হলো ১৯০৫ সালের শেষ দিকে।

পুব বাংলায় সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় মুসলমানরা এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানালেন। কিন্তু শিক্ষিত হিন্দুরা এ সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারলেন না। তাঁদের অনেকেরই আদি বাড়ি ছিলো পুব বাংলায়। লেখাপড়া শিখে তাঁরা কলকাতায় চাকরি-বাকরি করতেন, হাই কোর্টে ওকালতি করতেন, ডাক্তারি করতেন, অথবা অন্য কোনো কাজ করতেন। যেসব জমিদারের বাড়ি ছিলো পূর্ববাংলায়, তাঁরাও কলকাতায় সুখে বাস করতেন, কিন্তু তাঁদের আয়ের উৎস ছিলো পুব বাংলায়। তাঁরা অনুভব করলেন যে, বঙ্গদেশ বিভক্ত হলে তাঁরা বেকায়দায় পড়বেন। সে জন্যেই তাঁরা এর বিরোধিতা আরম্ভ করেন। (রায়, ১৯৭০) বঙ্গদেশকে দু ভাগ করার বিরুদ্ধে তাঁরা

রীতিমতো আন্দোলন আরম্ভ করলেন। এর নাম বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন। ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজত্ব আরম্ভ হওয়ার পর, এ রকমের আন্দোলন আর কখনো হয়নি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও এই আন্দোলনে যোগদান করেন। তিনি দেখলেন যে, বঙ্গদেশকে এভাবে বিভক্ত করলে বাংলা যাঁদের মাতৃভাষা, তাঁরাও দু ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়বেন। এক ভাগে হিন্দুরা থাকবেন বেশি। অন্য ভাগে মুসলমান থাকবেন বেশি। ফলে কালে কালে পুব এবং পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ভাষা দু রকম চেহারা নেবে। বাঙালি সংস্কৃতিও খানিকটা আলাদা হয়ে যাবে।

বঙ্গভঙ্গ রদ করার জন্যে শিক্ষিত হিন্দুরা ইংরেজ-বিরোধী সভা-সমাবেশ করলেন। বিক্ষোভ দেখালেন। বিলেতী কাপড় এবং অন্য জিনিশপত্র কেনা বন্ধ করলেন। অনেকে নিজেরাই তাঁতের কাপড় তৈরি করে, তা পরতে আরম্ভ করলেন। লবণ তৈরি করে, তা ব্যবহার করলেন। এমন কি, কোথাও কোথাও বিলেতী মালে আগুন ধরিয়ে দিলেন। এক কথায়, ইংরেজদের প্রচণ্ড বিরোধিতা শুরু করলেন। কেউ কেউ আবার বোমা মেরে ইংরেজদের তাড়িয়ে দিয়ে স্বাধীনতা আনার স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেন। একে বলা হয়, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন। এই সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে প্রথমে প্রাণ দিয়েছিলেন ক্ষুদিরাম বসু আর প্রফুল্ল চাকী। পরে এই আন্দোলনের বড়ো নেতা হয়েছিলেন বাঘা যতীন।

খুব অল্প সংখ্যক বাঙালি মুসলমান বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করলেন। বেশির ভাগই বরং তা সমর্থন করলেন। বিশেষ করে ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ হলেন এর প্রধান সমর্থক। তার পরের বছর (১৯০৬) তিনিই ঢাকায় 'মুসলিম লীগ' নামে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করলেন। এতে ভারতবর্ষের অন্যান্য এলাকার মুসলমান নেতাদেরও যোগ দেবার জন্যে আহ্বান করেছিলেন তিনি। কালে কালে ইন্ডিয়ান কংগ্রেস আর মুসলিম লীগের বিরোধিতার ফলেই ভারতবর্ষ দু ভাগে বিভক্ত হয় ১৯৪৭ সালে।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন এমন প্রবল হয়ে উঠেছিলো যে, ইংরেজরা বঙ্গদেশকে জোড়া দিতে বাধ্য হন, ১৯১২ সালে। তখন ঢাকা শহর আর 'পুব বাংলা ও আসাম' প্রদেশের রাজধানী থাকলো না। কলকাতাই আবার বঙ্গদেশের রাজধানী হলো। রাজধানী হিশেবে কয়েক বছরে ঢাকা শহরের কিছু উন্নতি হয়েছিলো। লোকসংখ্যা বেড়েছিলো। খানিকটা প্রসার হয়েছিলো ব্যবসা-বাণিজ্যের। শিক্ষার দিক দিকেও মুসলমানদের মধ্যে আগ্রহ খানিকটা বেড়েছিলো। তাই বঙ্গভঙ্গ বাতিল হওয়ায়, পুব বাংলার মুসলমানরা ক্ষুব্ধ হলেন। সরকার তখন তাঁদের সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে ঢাকায় একটা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার কথা ঘোষণা করলো। এই বিশ্ববিদ্যালয় অবশ্য চালু হয় আরও ন বছর পরে—১৯২১ সালে।

মুসলমানদের ক্ষমতায়ন

দুই বঙ্গকে জোড়া দিলেও, হিন্দুদের রাজনৈতিক ক্ষমতা কমানোর সূক্ষ্ম পরিকল্পনা বহাল রাখলেন ইংরেজরা। তখন রাজনৈতিক শক্তি হিশেবে মুসলমানরা গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন না। কিন্তু আইন পরিবর্তনের মাধ্যমে ইংরেজ সরকার ধীরে ধীরে হিন্দুদের দুর্বল করে দেয় আর মুসলমানদের শক্তিশালী করে তোলে। যেমন, ১৯০৯ সালে তাঁরা বঙ্গীয় আইন পরিষদের সংস্কার করেন। তার আগে এই পরিষদে মুসলমান সদস্য ছিলেন খুব কম। মুসলমান ভোটদাতাদের সংখ্যা ছিলো আরও কম। সেকালে সবার ভোট দেওয়ার অধিকার ছিলো না। যাঁদের অনেক জমিজমা থাকতো অথবা থাকতো বিশেষ শিক্ষাগত যোগ্যতা, তাঁরাই ভোটদাতা হতে পারতেন। এ রকমের ভোটদাতারা ছিলেন শতকরা ৮০ ভাগই হিন্দু। কিন্তু ১৯০৯ সালে বঙ্গীয় আইন সভার আসন বাড়িয়ে দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে বাড়ানো হলো মুসলমান ভোটদাতাদের সংখ্যা। এর পর ১৯১৯ সালে আরও একবার আইন সভার আসন বাড়ালো। তারপর আরও একবার আইন সংস্কার করা হলো ১৯৩৫ সালে। নিচের তালিকা থেকে দেখা যাবে, কিভাবে ধাপে ধাপে মুসলমান সদস্য ও ভোটার সংখ্যা বেড়ে গেলো আর কমে গেলো হিন্দুদের আসন সংখ্যা এবং ভোটারদের আনুপাতিক সংখ্যা।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় আসন বণ্টন					
বছর	মোট আসন	মুসলমানদের জন্যে সংরক্ষিত	অমুসলমানদের জন্যে সংরক্ষিত	ইউরোপীয়দের জন্যে সংরক্ষিত	ভোটার সংখ্যা
১৯০৯	৫৪	৫	০	১৮	৯,২৮৯
১৯১৯	১১৯	৩৯	৪৬	২২	১০,২১,৪১৮
১৯৩৫	২৫০	১১৭	৭৮	৩৩	৬৬,৯৫,৫৮৩

দেখা যাচ্ছে, ১৯১৯ সালে আইন সভায় মুসলমানদের আসন ১৯০৯ সালের তুলনায় প্রায় আট গুণ বেড়ে যায়। ১৯৩৫ সালে বেড়ে যায় আরও তিন গুণ। অন্যদিকে, হিন্দুদের আসন না-বেড়ে বরং অনেক কমে যায়। ১৯০৯ সাল পর্যন্ত ভোটারদের সংখ্যা ছিলো দশ হাজারেরও কম। ১৯১৯ সালে তা বাড়ে এক শো গুণেরও বেশি। ১৯৩৫ সালে আবার বাড়ে ছ গুণ। এই ভোটদাতাদের মধ্যে মুসলমান এবং নিম্নবর্ণের হিন্দুদের সংখ্যা "ভদ্রলোক" হিন্দুদের থেকে অনেক বেশি হলো। এভাবে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ দলে পরিণত হলেন। কখনো কখনো তাঁরা আবার নিম্নবর্ণের হিন্দুদের সমর্থন পেয়েছেন।

এ কে ফজলুল হক

এর ফলে আস্তে আস্তে রাজনৈতিক ক্ষমতা উচ্চবর্ণের হিন্দুদের হাত থেকে মুসলমানদের হাতে চলে গেলো। মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতাও বৃদ্ধি পেলো। ১৯২৫ সালে কলকাতার প্রথমবারের মতো ডেপুটি মেয়র হলেন একজন মুসলমান—হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। আরও দশ বছর পরে ফজলুল হক প্রথম মুসলমান মেয়র হওয়ার কৃতিত্বও অর্জন করেন। এ ছাড়া, ১৯২০-এর দশকে থেকে মুসলমানরা মন্ত্রীও হতে আরম্ভ করলেন। এমন কি, ১৯৩৭ সালে বঙ্গদেশের প্রধানমন্ত্রী হলেন ফজলুল হক। যাঁকে অনেকে এখন বলেন 'শেরে বাংলা'।

১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের আগে কোন কোন প্রদেশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবে, অথবা ভারতের অধীনে থাকবে, তা ঠিক করার জন্যে ১৯৪৬ সালে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। দেখা গেলো যে, পূর্ববাংলায় মুসলমানদের সংখ্যা অনেক বেশি। তাঁরা পাকিস্তানে থাকতে চাইলেন। শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতির জন্যেই মুসলমানদের মধ্যে এই বিচ্ছিন্নতাবাদ অতোটা দানা বাঁধেনি। আর একটা কারণ ছিলো তাঁরা রাজনৈতিক ক্ষমতার আস্বাদ পেয়েছিলেন। ১৯৩৭ সাল থেকে শুরু করে একে-একে ফজলুল হক, খাজা নাজিমউদ্দীন এবং সোহরাওয়ার্দী বঙ্গদেশের প্রধানমন্ত্রী
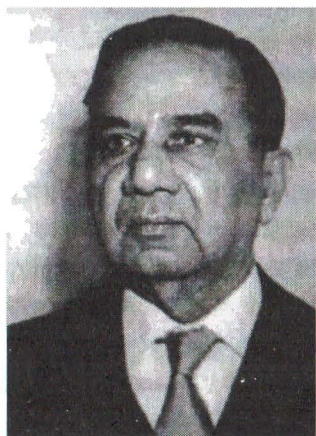
হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

হয়েছিলেন। এর ফলে মুসলমানদের আত্মবিশ্বাস সীমাহীনভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিলো। আর, হিন্দুদের মনে সৃষ্টি হয়েছিলো ক্ষোভ এবং হতাশা। এর আগে সংখ্যা নয়, গুণগত মান ছিলো রাজনৈতিক প্রাধান্যের মানদণ্ড। কিন্তু গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মানদণ্ড হলো সংখ্যা। এই মানদণ্ডই হিন্দুদের মেনে নিতে হয়েছিলো। হিন্দু নেতারা তখন আর অখণ্ড বঙ্গদেশের মধ্যে থাকতে চাইলেন না। কারণ, অখণ্ড বঙ্গদেশে থাকলে তাঁরা হবেন সংখ্যালঘু এবং মুসলমানরাই তাঁদের শাসন করবেন। অপর পক্ষে, মুসলমান নেতারা যখন দেখলেন যে, অখণ্ড বঙ্গদেশে তাঁরাই হবেন সংখ্যাগুরু, তখন তাঁদের কেউ কেউ যুক্তবঙ্গের দাবি করলেন। কিন্তু বেশির ভাগই পাকিস্তানের অংশ হতে চাইলেন।
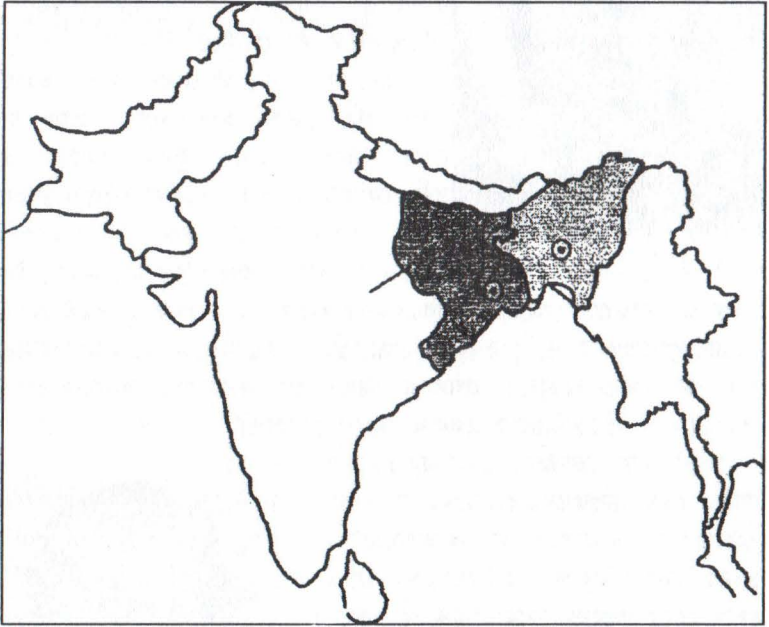
অবিভক্ত **বঙ্গদেশের** মানচিত্র

শেষ পর্যন্ত ১৯৪৭ সালের ১৪ই অগস্ট বঙ্গদেশ স্থায়ীভাবে বিভক্ত হয়। হিন্দু-প্রধান পশ্চিমবঙ্গ থাকলো স্বাধীন ভারতের সঙ্গে। আর, মুসলমান-প্রধান পূর্ববাংলা পরিণত হয় পাকিস্তানের একটা অংশে। অন্য কথায় বলা যায়, বঙ্গদেশ বিভক্ত হলো ধর্মীয় কারণে। এই যে 'দুই ধর্ম, দুই জাতি'র নীতি—একে বলা হয়েছে দ্বিজাতিতত্ত্ব (টু নেইশন থিওরি)। মানচিত্রের দিকে তাকালেই দেখা যাবে, ভারতের উত্তর-পশ্চিমের চারটি প্রদেশ নিয়ে গঠিত হয়েছিলো পশ্চিম পাকিস্তান। পুব বাংলার নতুন নাম হলো পূর্ব পাকিস্তান।

দেশবিভাগ : অসম মিলন

ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তান গঠিত হওয়ায়, বাঙালি মুসলমানরা খুব আনন্দিত হয়েছিলেন। তার আগের এক শো বছর তাঁরা হিন্দুদের থেকে পিছিয়ে ছিলেন—শিক্ষাদীক্ষা, টাকাপয়সা, রাজনীতি এবং সামাজিক অবস্থায়। তাঁরা বেশির ভাগই ছিলেন হিন্দু জমিদারদের প্রজা, মহাজনদের খাতক। অনেকেই এই জমিদার এবং মহাজনদের হাতে শোষিত হয়েছিলেন। অসম্মানের শিকার হয়েছেন। কাজেই স্বাধীন পাকিস্তানকে তাঁরা স্বপ্নের দেশ বলে কল্পনা করেছিলেন। আশা করেছিলেন, সেখানে তাঁরা সব পাবেন। কিন্তু কার্যকালে তাঁরা তা পাননি। বিয়ের পরে বর অথবা বধূর যখন প্রত্যাশা পূরণ হয় না, তখন তাঁরা যেমন হতাশ হন, পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানদের অবস্থাও হয়েছিলো তেমনি। স্বাধীন হওয়ার আনন্দ তাঁরা বেশি দিন উপভোগ করতে পারেননি। অল্পকালের মধ্যেই তাঁরা অনুভব করলেন যে, পাকিস্তানের দু অংশের মধ্যে মিলন সমতার ভিত্তিতে হয়নি।

রাষ্ট্র হিশেবে পাকিস্তানের অনেক দুর্বলতাও চোখে পড়লো তাঁদের। পশ্চিম পাকিস্তান ছিলো বিশাল দেশ ভারতের পশ্চিমে। আর পূর্ব পাকিস্তান ভারতের পুবে। এই দুই অংশের মধ্যে সরাসরি দূরত্ব ছিলো বারো শো মাইলেরও বেশি। একটা শক্তিশালী দেশের জন্যে এটা আদর্শ নয়। শক্তিশালী হতে হলে দেশের সমস্ত এলাকা এক সঙ্গে লাগোয়া থাকা দরকার। দেশ হিশেবে এ ছিলো পাকিস্তানের সবচেয়ে বড়ো দুর্বলতা। পাকিস্তানের আরও দুর্বলতা ছিলো। যেমন, পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের লোকেদের খাদ্য, পোশাক, রুচি এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ ছিলো ভিন্ন রকমের। বেশির ভাগ লোকের পেশাও এক ছিলো না।

পাকিস্তানের শাসকরাও ছিলেন বেশির ভাগ পশ্চিম পাকিস্তানী। মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ্‌র নেতৃত্বেই পাকিস্তান এসেছিলো। তাঁকে সম্মান করে বলা হতো কায়দে আজম—অর্থাৎ প্রধান নেতা। তিনি ছিলেন পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল।

প্রধানমন্ত্রী ছিলেন লিয়াকত আলি খান। অন্য মন্ত্রীরাও প্রায় সবাই ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের লোক। কেবল রাজনৈতিক নেতৃত্বই যে পশ্চিম পাকিস্তানীদের হাতে থাকলো, তাই নয়, সমস্ত সরকারী উচ্চপদও থাকলো তাঁদের হাতে। পাকিস্তান যে-সৈন্যবাহিনী উত্তরাধিকার সূত্রে পায়, তাও সমস্তটা গঠিত ছিলো পশ্চিম পাকিস্তানীদের নিয়ে। মোট কথা, পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন হলো নামে মাত্র। আগে তার প্রভু ছিলো ইংরেজ সরকার, নতুন প্রভু হলো পশ্চিম পাকিস্তান। রাজধানীও ঢাকায় হলো না, হলো করাচিতে। এক কথায়, দু পাকিস্তান একটা দেশের সমান শরিক হলো না।

কিন্তু এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুর্বলতা হলো—দু অংশের লোকেদের ভাষা এক ছিলো না। পশ্চিম পাকিস্তানে চারটি প্রদেশ ছিলো। প্রতিটি প্রদেশের ভাষা ছিলো আলাদা। সিন্ধুর ভাষা সিন্ধী, পাঞ্জাবের ভাষা পাঞ্জাবী, বেলুচিস্তানের ভাষা বালুচী, আর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ভাষা পাশতু। এসব প্রাদেশিক ভাষা ছাড়া, কিছু লোকের ভাষা ছিলো উর্দু। তবে ভাষাগুলো খানিকটা আলাদা হলেও এগুলোর মধ্যে মিলও ছিলো যথেষ্ট। তা ছাড়া, এগুলো লেখা হতো একই ধরনের হরফে। অপর পক্ষে, পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় সবারই মাতৃভাষা ছিলো বাংলা। বাংলা ভাষার হরফও আলাদা। উর্দুর সঙ্গে যার আদৌ কোনো মিল নেই।

তা হলে, দেশের দু অংশের মধ্যে মিল কোথায়? কিসের ভিত্তিতে মিলন হলো উভয়ের? এই ভিত্তিটা হলো ধর্মের মিল। পাকিস্তানের শতকরা আশি জনের ধর্মই ছিলো ইসলাম। কিন্তু মুশকিল হলো : কেবল ধর্মের মিল থাকলেই যেমন সুখের বিবাহ হয় না, পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যেও তেমনি শুধু ধর্মের কারণে ঐক্য গড়ে উঠলো না। এক কথায়, পাকিস্তানের ভিত্তিটাই ছিলো দুর্বল। পাকিস্তানের দু অংশকে এক সঙ্গে বেঁধে রাখার মতো শক্ত কোনো সূত্র ছিলো না।

পাকিস্তানের নেতারাও এই দুর্বলতার কথা ভালো করে জানতেন। তাঁরা তাই ভাবলেন যে, বাংলা ভাষার বদলে পূর্ব পাকিস্তানে উর্দু চালু করতে পারলে দেশের দু অংশের মধ্যে ঐক্য তৈরি হতে পারে। কিন্তু একটা দেশের ভাষা বদলে দেওয়া অসম্ভব কাজ। তা সত্ত্বেও পাকিস্তান সরকার সেই চেষ্টাই আরম্ভ করলো। যেমন, সরকারী কাজে-কর্মে বাংলাকে বাদ দিয়ে ইংরেজি আর উর্দু ব্যবহার করা হলো।

তখন পূর্ব পাকিস্তানে মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার হার ছিলো খুব কম। তার ওপর, শতকরা নব্বই জনেরও বেশি বাস করতেন গ্রামে। পূর্ব পাকিস্তানের সরকারী ভাষা কী হবে—এ নিয়ে তাঁরা ভাবেননি। কিন্তু কিছু শিক্ষিত দেশবিভাগের সময় থেকেই এ নিয়ে ভেবেছিলেন। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এবং আবদুল হক যেমন। সৈয়দ মুজতবা আলিও এ নিয়ে পরের বছর (১৯৪৮) একটি চটি বই লিখেছিলেন। এঁদের মধ্যে শহীদুল্লাহ বলেন যে, বাঙালির সংখ্যা বেশি হওয়ায় দেশের সরকারী ভাষা হওয়া উচিত বাংলা। তবে উর্দুকে দ্বিতীয় ভাষা হিশেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। অন্যরা বললেন, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত বাংলা এবং উর্দু—উভয়ই।

মুজতবা আলী দৃষ্টান্ত দেখিয়ে বলেন, কোনো কোনো দেশে একাধিক রাষ্ট্রভাষা চালু আছে। সুতরাং পাকিস্তানেও একাধিক ভাষা রাষ্ট্রভাষা হতে কোনো বাধা নেই।

এদিকে, পাকিস্তান গঠিত হওয়ার পরেই—১৯৪৭ সালের পয়লা সেপ্টেম্বর—ঢাকায় গঠিত হয় 'তমদ্দুন মজলিশ' নামে একটি সমিতি। এর নেতা ছিলেন অধ্যাপক আবুল কাসেম। 'তমদ্দুন' কথাটার মানে হলো সংস্কৃতি। বস্তুত, 'তমদ্দুন' এবং 'মজলিশ'—এই শব্দ দুটোর কোনোটাই বাংলা নয়। এই সমিতির সদস্যরা প্রামাণ্য বাংলার বদলে আরবি-ফারসি-উর্দু মেশানো এক ধরনের মুসলমানী বাংলার পক্ষপাতী ছিলেন। তবু তাঁরা বাংলা ভাষাকে ভালোবাসতেন।
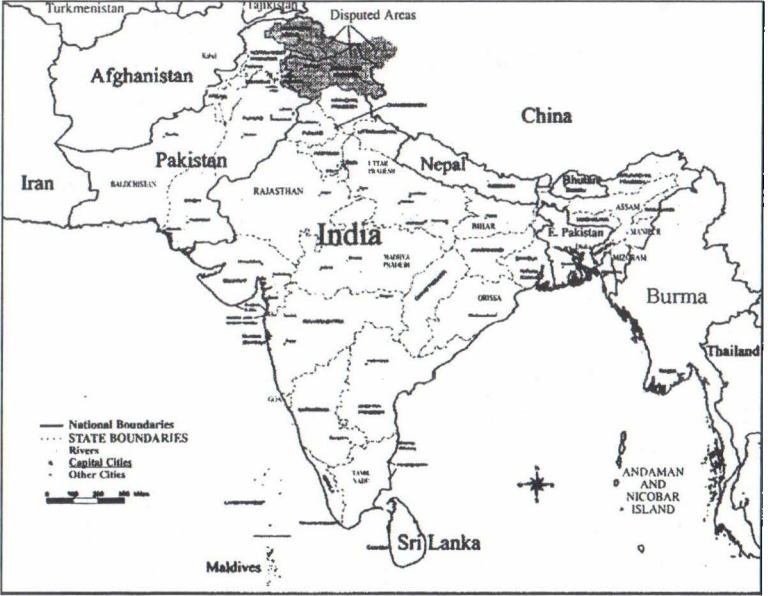
দুই পাকিস্তানের মানচিত্র। মাঝখানে ১২০০ মাইল ভারত

এই সমিতির পক্ষ থেকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা হবে, নাকি উর্দু—এ নিয়ে ১৫ই সেপ্টেম্বর একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। এতে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানানো হয়। এর পর ৬ই ডিসেম্বর একই দাবি করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা। তাঁরা সেদিন সভা এবং মিছিল করেন বাংলার দাবিতে। এ মাসের শেষ দিকে তাঁরা 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ'ও গঠন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো কোনো অধ্যাপক এতে তাঁদের অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন। বলা যেতে পারে, ভাষার গুরুতর সমস্যাটা পাকিস্তান গঠিত হওয়ার সময় থেকেই দেখা দিয়েছিলো।

'মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়'

বাংলাকে সরকারী ভাষা করার যে-দাবি বাঙালিরা করছিলেন, তা ছিলো ন্যায্য দাবি। কিন্তু সরকারী ভাষা হিশেবে বাংলাকে গ্রহণ করতে পাকিস্তানের নেতারা মোটেই তৈরি ছিলেন না। এই নিয়েই ভাষা আন্দোলনের সূচনা। আর এই আন্দোলন শেষ হয়, বাংলা ভাষাকে সরকার যখন রাষ্ট্রভাষা হিশেবে মেনে নেয়, তখন—১৯৫৬ সালে। কিন্তু এ আন্দোলন সত্যিকার অর্থে কখনো থেমে যায়নি। কেবল তারপর তার চেহারা পাল্টে যায়।

বাংলার দাবি পাকিস্তানের নেতারা মেনে নেবেন না—এটা বেশ পরিষ্কার হয় ১৯৪৮ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি। তখন করাচিতে গণপরিষদ অর্থাৎ পার্লামেন্টের অধিবেশন চলছিলো। সদস্যদের বলা হয় যে, তাঁরা বক্তৃতা করবেন ইংরেজি অথবা উর্দুতে। কিন্তু এর প্রতিবাদ করেন পূর্ব পাকিস্তান কংগ্রেস দলের ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি প্রস্তাব করেন যে, বাংলাতেও বক্তৃতা দেওয়ার অধিকার দেওয়া হোক। যুক্তি দেখিয়ে তিনি বলেন যে, পাকিস্তানের মোট লোকসংখ্যা ছ কোটি নব্বুই লাখ। এঁদের মধ্যে চার কোটি চল্লিশ লাখ লোকের ভাষাই হলো বাংলা। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খান এই যুক্তিপূর্ণ দাবি প্রত্যাখ্যান করেন। পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দীনও এর বিরোধিতা করেন। এ খবর যখন ঢাকায় পৌঁছালো, তখন অনেকেই বাংলার যুক্তিপূর্ণ দাবি সমর্থন করেন। এমন কি, পাকিস্তানপন্থী পত্রিকা *আজাদেও* এর পক্ষে জোরালো মতামত দেওয়া হয়।

গণপরিষদে বাংলা ব্যবহার করা যাবে কিনা—এ নিয়ে যে-বিতর্ক দেখা দিলো, তারই সূত্র ধরে পরের মাসে ছাত্ররা বাংলা ভাষার পক্ষে আন্দোলন আরম্ভ করেন। এ সময়ে এ আন্দোলন করার আরও একটা কারণ ছিলো: উনিশে মার্চ পাকিস্তানের প্রধান নেতা মোহাম্মদ আলি জিন্নাহর ঢাকায় আসার কথা। এগারোই মার্চ ছাত্রদের বিক্ষোভ মিছিল কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়ে আর লাঠি-পেটা করে পুলিশ

ভেঙে দেয়। তা ছাড়া, কাজী গোলাম মাহবুব, শামসুল হক, শেখ মুজিবুর রহমান, অলি আহাদ-সহ কয়েকজন ছাত্রনেতাকেও গ্রেফতার করে। প্রতিবাদে ছাত্ররা ১২ই মার্চ থেকে ১৫ই মার্চ পর্যন্ত ধর্মঘট পালন করেন।

ছাত্ররা আশা করেছিলেন যে, জিন্নাহ সাহেবের কাছে বাংলা ভাষার দাবি তুললে, বিষয়টা তিনি বিবেচনা করে দেখবেন। কিন্তু ২১শে মার্চ রেসকোর্সের বিরাট জনসভায় জিন্নাহ সাহেব পরিষ্কার ঘোষণা করলেন যে, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে একটাই—উর্দু। পরে কার্জন হলে বক্তৃতার সময়েও তিনি একই ঘোষণা দেন। এই দুই সভাতেই কেউ কেউ 'নো, নো' বলে তাঁর ঘোষণার প্রতিবাদ করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের প্রতিবাদ জোরালো ছিলো না। এর পর ছাত্রদের একটি দল গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানালেন। জিন্নাহ সাহেব তাঁদের দাবি সরাসরি নাকচ করে দিলেন।

তখন পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন খাজা নাজিমউদ্দীন। তিনি অবশ্য ছাত্রদের ভরসা দিলেন যে, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কী হবে সেটা পার্লামেন্ট ঠিক করবে, কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের সরকারী ভাষা কী হবে সেটা ঠিক করবে পূর্ব পাকিস্তানের আইন পরিষদ। তা ছাড়া, 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদে'র ছাত্রদের তিনি একটি লিখিত প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্যে তিনি চেষ্টা চালিয়ে যাবেন। জিন্নাহ সাহেব এর ছ মাস পরে সেপ্টেম্বর মাসে যখন মারা গেলেন, তখন পাকিস্তানের গবর্নর জেনারেল হলেন নাজিমউদ্দীন। পরের বছর অক্টোবর মাসে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খান নিহত হওয়ার পর, তিনি হলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু তিনি পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ হলেও, বাংলা তাঁর মাতৃভাষা ছিলো না। বাংলার প্রতি কোনো দরদও ছিলো না তাঁর। বাংলার দাবিকে তিনি তাই যুক্তিপূর্ণ বলে গণ্য করেননি। ফলে পাকিস্তানের নীতি থেকে তিনি একটুও সরে গেলেন না। হাতে ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তিনি বাংলার পক্ষে কিছুই করেননি। প্রতিটি সরকারী কাজে সে জন্যে ইংরেজির সঙ্গে উর্দু ভাষা ব্যবহার করা হলেও, বাংলাকে ইচ্ছে করেই বাদ দেওয়া হলো। যেমন, ছোট্টো একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে : টাকা আর মুদ্রার গায়ে উর্দু আর ইংরেজিতে লেখা থাকতো। কিন্তু বাংলায় নয়। তেমনি ডাকটিকিটে, মনি-অর্ডার ফর্মে, সরকারী কাগজপত্রে বাংলা ভাষা ছিলো অনুপস্থিত।

এ ছাড়া, সরকার অন্যভাবেও বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে আরম্ভ করে। যেমন, ইসলামপন্থী কবি-লেখকদের দিয়ে বাংলা ভাষায় আরবি-ফারসি শব্দ আমদানি করে তাকে মুসলমানী চেহারা দেওয়ার চেষ্টা চালানো হয়। এ সময়ে সরকারী উদ্যোগে ঢাকায় দুটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়—মাসিক *মাহে নও*, আর রেডিওর অনুষ্ঠানসূচি নিয়ে *এলান*। *মাহে নও* এবং *এলান*—এর কোনো শব্দই বাংলা নয়। এই দুই পত্রিকায় যেসব লেখা প্রকাশিত হতো, তাও অনেক

সময়ে মুসলমানী বাংলার চেহারা নিতো। রেডিও পাকিস্তানকেও নির্দেশ দেওয়া হয় আরবি-ফারসি প্রভাবিত বাংলা ব্যবহার করতে। ফলে মুখ্যমন্ত্রী হয়ে গেলেন 'উজিরে আ'লা'; প্রধানমন্ত্রী হলেন 'উজিরে আজম'। এটা একটি ছোট্টো দৃষ্টান্ত। আসলে রেডিওর ভাষাটাই মুসলমানী বাংলার চেহারা নিলো। অন্য যেসব পত্রিকা তখন ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়, তাদের নাম থেকেও—আরবি-ফারসি শব্দ আমদানির আভাস পাওয়া যায়—যেমন, *মিল্লাত, ইত্তেহাদ, ইত্তেফাক, ইনসাফ* ইত্যাদি।

গোলাম মোস্তফার মতো কবি এ সময়ে নজরুল ইসলামের সব কবিতা পূর্ব পাকিস্তানের জন্যে পাঠের উপযোগী বলে মনে করেননি। তিনি নজরুলের কবিতার 'হিন্দুয়ালি' শব্দ বাদ দিয়ে মুসলমানী শব্দ আনার প্রস্তাব দিলেন। যেমন 'সজীব করিব মহাশ্মশান'-এর বদলে 'সজীব করিব গোরস্তান' লেখার দৃষ্টান্ত দিলেন। 'ভগবানে'র পরিবর্তে পরামর্শ দিলেন 'রহমান' লেখার। অর্থাৎ তিনি মুসলমান কবি হিশেবে নজরুল ইসলামকে গ্রহণ করতে রাজি হলেন, তবে সংস্কারের মাধ্যমে। নজরুলের অনেক রচনাকেই তিনি পাকিস্তানের জন্যে অবাঞ্ছিত মনে করলেন।

এ সময়ে যেসব কবি-সাহিত্যিক মুসলমানী বাংলা চালু করার চেষ্টা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে তালিম হোসেন, মোফাখখারুল ইসলাম, ফররুখ আহমেদ, *মাহে নও*-এর মীজানুর রহমান প্রমুখও ছিলেন। আবুল মনসুর আহমেদ, সৈয়দ সাজ্জাদ হুসায়েন, সৈয়দ আলী আহসান প্রমুখ যে-মুসলমানী বাংলার পক্ষে কয়েক বছর আগে যুক্তি দিয়েছিলেন, সেই বাংলাই এঁরা লিখলেন। তাতে থাকলো প্রচুর আরবি-ফারসি শব্দ। এমন কি, অপ্রচলিত আরবি-ফারসি শব্দ। যেমন, ব্যবসার বদলে 'তেজারতি'। ফলে তখনকার পত্রপত্রিকা, রেডিও এবং সাহিত্যের ভাষায় অনেক নতুনত্ব দেখা গেলো। মুশকিল হলো, এই কৃত্রিম বাংলাকে সাধারণ মানুষরা গ্রহণ করলেন না। তাঁরা প্রচলিত বাংলা ভাষাতেই লিখতে থাকলেন।

বাংলার বদলে উর্দুকে সরকারী ভাষা হিশেবে গ্রহণ করার ব্যাপারে বাঙালিদের বাধা পাকিস্তানের নেতারা অনুভব করতে পেরেছিলেন। তা সত্ত্বেও উর্দুকে চালু করার চেষ্টা তাঁরা চালিয়ে যেতে থাকলেন। আরও বিকল্পের কথাও তাঁরা ভাবলেন। যেমন, পাকিস্তানের বাঙালি শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান প্রস্তাব করলেন, আরবি হরফে বাংলা ভাষা লেখার। তাঁর যুক্তি ছিলো : আরবি মুসলমানদের ধর্মীয় ভাষা। এর সঙ্গে অনেকেরই পরিচয় আছে। সুতরাং বাংলা ভাষা আরবি হরফে লিখলে আলাদা করে ধর্মীয় ভাষার হরফ শিখতে হবে না। অথবা ধর্মীয় ভাষার হরফ শিখলে, আলাদা করে বাংলার হরফ শিখতে হবে না। তা ছাড়া, এর ফলে বাংলা আর উর্দুর মধ্যে দূরত্ব কমে যাবে। বাঙালিরা কোনো বাড়তি চেষ্টা ছাড়াই উর্দু পড়তে পারবেন। পশ্চিম পাকিস্তানী নেতারা আরও ভেবেছিলেন যে, বাংলা ভাষা

আরবি হরফে লেখা হলে, তার ফলে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গেও পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা এবং সংস্কৃতির মিল হ্রাস পারে।

আরবি হরফে বাংলা লেখার জন্যে সরকার এ সময়ে কতোগুলো পরীক্ষামূলক কেন্দ্রও চালু করেছিলো। কিন্তু মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতো প্রবীণ ভাষাতাত্ত্বিক এর বিরুদ্ধে মত দিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকেও এর বিরুদ্ধে মতামত দেওয়া হয়। বাঙালি পণ্ডিতরা বললেন যে, বাংলা ভাষা আরবি হরফে লেখা সম্ভব নয়। আরবি হরফে বাংলা লেখার প্রস্তাব যখন বাঙালি পণ্ডিতরা প্রত্যাখ্যান করলেন, তখন ধুয়ো উঠলো, তা হলে ইংরেজি হরফে বাংলা লেখা হোক। কিন্তু একই কারণে বাঙালি পণ্ডিতরা এ প্রস্তাবও বাতিল করে দিলেন।
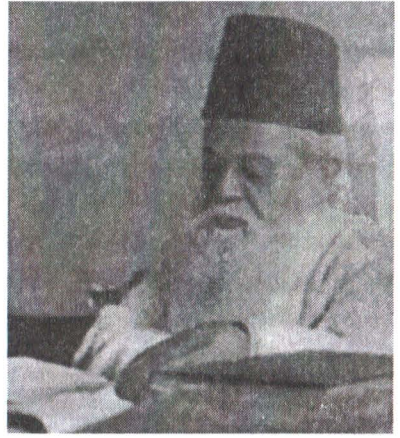
মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, যিনি আগাগোড়া বাংলার ভাষার পক্ষে জোরালো বক্তব্য রেখেছিলেন

সত্যিকার অর্থে, বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে আন্দোলন শুরু হলেও, আসলে এ ছিলো গণতান্ত্রিক আন্দোলন। অধিকার আদায়ের আন্দোলন। এমন কি, ভাষাভিত্তিক ধর্মনিরপেক্ষ আন্দোলন। এ আন্দোলনে একদিকে যেমন রাজনীতিকরা যোগ দিচ্ছিলেন, অন্যদিকে তেমনি যোগ দিচ্ছিলেন শিক্ষিত সমাজ—ছাত্র এবং শিক্ষকরা।

এ আন্দোলন শিক্ষিত লোকেদের মনকে কিভাবে প্রভাবিত করেছিলো, তার একটা প্রমাণ দেওয়া যায়, মুহম্মদ শহীদুল্লাহর দৃষ্টান্ত থেকে। তিনি নিজে ছিলেন ধর্মপরায়ণ মুসলমান। নিজেকে খাঁটি পাকিস্তানী বলেই মনে করতেন। কিন্তু বাংলা ভাষার প্রতি আন্তরিক ভালোবাসার কারণে নিজেকে তিনি বাঙালি বলেই ঘোষণা করলেন। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় এবং ধর্মীয় পরিচয়ের চেয়ে ভাষিক পরিচয়কে তিনি বড়ো করে দেখলেন। তিনি এই ঘোষণা দিয়েছিলেন ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনে'। এই সম্মেলন শুরু হয়েছিলো '৪৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর। বছর দুয়েক পরে—১৯৫১ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি আইন সভা ও গণপরিষদের বহু সদস্য, অধ্যাপক, লেখক, সাংবাদিক এবং শিল্পীরা মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমীনের কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ করেন। এতে তাঁরা দাবি করেন যে, পয়লা এপ্রিল থেকে পূর্ব পাকিস্তানের সমস্ত সরকারী কাজকর্ম বাংলা ভাষায় করা হোক।

বাংলা ভাষার ব্যাপারে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ছিলেন, সবচেয়ে সোচ্চার। বাঙালি পরিচয় সম্পর্কে তাঁর মনে কোনো দ্বিধা ছিলো না। ঐ বছরেরই

১৬ই মার্চ কুমিল্লায় যখন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ শিক্ষকদের সম্মেলন হয়, তখনো সভাপতি হিশেবে বাংলার পক্ষে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেছিলেন, 'বাংলা ভাষা অবহেলিত হইলে আমি ব্যক্তিগতভাবে বিদ্রোহ করিব। নতুন ভাষা আরোপ করা পূর্ববঙ্গে গণহত্যারই সামিল হইবে।' (উমর, ১৯৮৫)

এই সম্মেলনের ঠিক আগে চট্টগ্রামের যে-সাহিত্য সম্মেলন হয়, তাতেও বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ এই সম্মেলনে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বহু শতাব্দীর ঐহিত্য এবং হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সাধনার কথা সবাইকে স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি বলেন, এই ঐতিহ্যকে ভুলে গেলে পূর্ববঙ্গ মননশীলতার দিক দিয়ে হতদরিদ্র হয়ে পড়বে।

মোট কথা, যতো সময় যেতে থাকলো, বাংলা ভাষার দাবি সম্পর্কে শিক্ষিত লোকেরা ততোই সচেতন হতে থাকলেন। এ নিয়ে ছাত্ররা এক সময়ে খাজা নাজিমউদ্দীন যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, তখন তাঁর কাছে, এবং পরে মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমীনের কাছে দেন-দরবার করতে থাকেন। কিন্তু উর্দুর সঙ্গে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার অথবা পূর্ব পাকিস্তানের সরকারী ভাষা করার—কোনো দাবিই নাজিমউদ্দীন অথবা নুরুল আমীন মেনে নেননি।

'রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি'

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দীন ১৯৫২ সালের ২৭শে জানুয়ারি পল্টন ময়দানে এক জনসভায় ঘোষণা করেন যে, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। এই প্রসঙ্গে তিনি জিন্নাহ সাহেবের ঘোষণার কথা সবাইকে মনে করিয়ে দেন। তা ছাড়া, আরবি হরফে বাংলা লেখার বিষয়টিও তিনি সমর্থন করেন। গর্বের সঙ্গে তিনি বলেন যে, ইতিমধ্যে সরকারী উদ্যোগে একুশটি কেন্দ্রে আরবি হরফে বাংলা লেখার কাজ চলছে।

এই ঘোষণা দেওয়ার ফলে রাষ্ট্রভাষা-বিতর্ক হঠাৎ আগুনের মতো দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো। ২৯শে জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এর প্রতিবাদে একটি সভা হয়। এতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, পরের দিন ছাত্রছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘট পালন করবেন। পরের দিন কেবল ধর্মঘট পালিত হয়নি, সেই সঙ্গে ছাত্ররা মিছিল করে বর্ধমান হাউস পর্যন্ত যান (বর্তমান বাংলা একাডেমী)। এটাই ছিলো মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন। ছাত্ররা ঘোষণা করেন যে, ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ঢাকা শহরের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালন করা হবে।

পরের দিন রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি, যুব লীগ, আওয়ামী মুসলিম লীগ, মুসলিম ছাত্রলীগ, তমদ্দুন মজলিশ এবং অন্য অনেকগুলো সংগঠনের প্রতিনিধিরা মিলিত হন বার লাইব্রেরিতে। সভাপতিত্ব করেন মওলানা ভাসানী। বিভিন্ন দলের চল্লিশজন সদস্যকে নিয়ে এখানে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। সভায় নাজিমউদ্দীনের ঘোষণার প্রতিবাদ জানানো হয়। বলা হয় যে, পাকিস্তানের বেশির ভাগ লোকের ভাষা বাংলা এবং তা-ই হবে রাষ্ট্রভাষা। আর পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলো চাইলে উর্দুও একটি রাষ্ট্রভাষা হিশেবে স্বীকৃতি পেতে পারে।

এ দিকে চৌঠা ফেব্রুয়ারি যাতে ঢাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হতে না-পারে, সরকার তার জন্যে চেষ্টা করেছিলো। এ জন্যে মুসলিম লীগের ছাত্ররা

'সংগ্রাম পরিষদে'র সভা এবং বিক্ষোভ ভণ্ডুল করারও পরিকল্পনা করেন। এ সত্ত্বেও চৌঠা ফেব্রুয়ারির বিক্ষোভ পালিত হয় সাফল্যের সঙ্গে। এই উপলক্ষে আমতলার সভায় সভাপতিত্ব করেন গাজীউল হক। বক্তৃতা করেন গোলাম মাহবুব এবং আবদুল মতিন। এতে সিদ্ধান্ত হয়, ছাত্ররা মিছিল করে রাজপথ প্রদক্ষিণ করবেন। তারপর হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর বিরাট মিছিল উপাচার্য এবং মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন হয়ে এবং হাই কোর্টের সামনে দিয়ে নবাবপুর রোড-সহ ঢাকার প্রধান রাস্তায় ঘোরে। এ মিছিল শেষ হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে। ঐ দিনই 'সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি'র সভায় একুশে ফেব্রুয়ারি সারা দেশে সাধারণ ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

চৌঠা ফেব্রুয়ারি ধর্মঘট পালনের আহ্বান জানানো হয়েছিলো ঢাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। কিন্তু এদিন তা মফস্বলের অনেকগুলো শহরেও পালিত হয়েছিলো। এ থেকে বাংলা ভাষার প্রতি দেশের সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থনই প্রকাশ পায়। এ থেকে এও আভাস পাওয়া যায় যে, ৪৮ সালে যে-আন্দোলন শুরু হয়েছিলো কেবল ঢাকা শহরে, তা ততোদিনে কতোটা ছড়িয়ে পড়েছিলো।

এর ষোলো দিন পরে—বিশে ফেব্রুয়ারি পূর্ব পাকিস্তান আইন সভার বাজেট অধিবেশন আরম্ভ হয়। এ দিনই ঢাকা শহরে জারি করা হয় এক মাসের জন্যে ১৪৪ ধারা। এর অর্থ, সেদিন থেকে ঘরের বাইরে চারজনের বেশি লোক সমবেত হতে পারবে না। ছাত্ররা যাতে ধর্মঘট করতে না-পারে, তার জন্যেই এই ঘোষণা দেওয়া হয়েছিলো। তা সত্ত্বেও ছাত্রনেতারা ঠিক করেছিলেন যে, বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে তাঁরা পূর্ব পাকিস্তান আইন সভায় যাবেন। সেখানে সদস্যদের তাঁরা মনে করিয়ে দেবেন বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি।

ছাত্ররা আগে থেকে এ রকমের সিদ্ধান্ত নিলেও, বিশে ফেব্রুয়ারি 'সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি' ঠিক করে যে, ১৪৪ ধারা অমান্য করা হবে না। কারণ, অমান্য করলে সরকারের হাতে একটা অস্ত্র তুলে দেওয়া হবে। সেটা ভাষা আন্দোলনের পক্ষে যাবে না। এ কথা বলেছিলেন, রাজনীতিকরা। কিন্তু উৎসাহী ছাত্রনেতারা এর সঙ্গে একমত হতে পারলেন না। তাঁরা তাই রাতের বেলা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি ছাত্রাবাসে এই সিদ্ধান্ত না-মানার জন্যে প্রচার চালান। তা ছাড়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদে'র নেতৃস্থানীয় ছাত্ররা সেদিন রাতের বেলা এক বৈঠকে মিলিত হন। সেখানে তাঁরা ১৪৪ ধারা ভাঙার পক্ষে সিদ্ধান্ত নেন। এতে উপস্থিত ছিলেন গাজীউল হক, হাবিবুর রহমান (পরবর্তীকালে বিচারপতি), যুব লীগের মোহাম্মদ সুলতান, জিল্লুর রহমান (পরবর্তী কালে রাষ্ট্রপতি), এম আর আখতার মুকুল, আবদুল মোমিন, আনোয়ারুল হক প্রমুখ। এঁরা ঠিক করেন যে, পরের দিন আমতলার সভায় সভাপতিত্ব করবেন গাজীউল হক। গাজীউল হক লিখেছেন যে, পাছে রাতের বেলাতেই ছাত্রনেতাদের পুলিশ গ্রেফতার করে, সে

জন্যে রাত দিনটার সময়েই তিনি বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে গিয়ে হাজির হন। (গাজীউল, ২০০০) অন্য ছাত্রনেতারাও বেশ সকাল-সকাল উপস্থিত হন।

সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় জমা হতে থাকলেন সকাল সাড়ে আটটা-নটা থেকে। ১৪৪ ধারা ভাঙলে বিপদ হতে পারে, তা জানা সত্ত্বেও তাঁরা সেখানে যান। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে তাঁরা ছোটো ছোটো দলে বিভক্ত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে সমবেত হন, আমতলায়। আম গাছটি ছিলো বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের সামনে। গাছটি খুব বড়ো ছিলো না। কিন্তু ছাত্র আন্দোলনের কারণে এটি ইতিহাসে নাম করে নিয়েছে।

ছাত্রনেতারা সবাই একমত ছিলেন না। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ এসেছিলেন 'সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদে'র ১৪৪ ধারা না-ভাঙার সিদ্ধান্ত নিয়ে। এঁদের মধ্যে মুসলিম ছাত্র লীগ এবং আওয়ামী মুসলিম লীগের নেতারাও ছিলেন। এঁরা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পক্ষে ছিলেন। আওয়ামী লীগপন্থী ছাত্রনেতা শামসুল হক এসেছিলেন জিন্নাহ-টুপি আর শেরওয়ানি পরে। (গাজীউল, ১৯৮০; উমর, ১৯৮৫) তিনি গোড়া থেকেই ১৪৪ ধারা ভাঙার বিরোধী ছিলেন। তাঁর মতামত প্রকাশ করায় অন্য ছাত্রনেতারা তাঁর ওপর ক্ষিপ্ত হন। আসলে উৎসাহী ছাত্রনেতারা 'শান্তির ললিত বাণী' শোনার জন্যে তৈরি ছিলেন না।

বেলা দশটার দিকে আমতলায় হাজার খানেক ছাত্রছাত্রী একত্রিত হন। (উমর, ১৯৮৫) আরও ছাত্রছাত্রী নানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আসতে থাকেন। এ সময়ে সভা শুরু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। মুসলিম লীগের নেতারা ঠিক করে এসেছিলেন যে, গোলাম মাহবুবকে সভাপতি করা হবে। কিন্তু শান্তিবাদী ছাত্ররা তাঁদের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে পারেননি। আমতলায় একটা চেয়ারের ওপর দাঁড়িয়ে হঠাৎ এম আর আখতার (মুকুল) সভায় সভাপতিত্ব করার প্রস্তাব করেন। তিনি প্রস্তাব করেন গাজীউল হকের নাম। কামরুদ্দীন শহুদ তা সমর্থন করেন। শামসুল হক, মোহাম্মদ তোয়াহা, গোলাম মাহবুব এবং খালেক নওয়াজ ১৪৪ ধারা ভাঙার বিরোধিতা করে বক্তৃতা করেন। কিন্তু সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের মনোভাব ছিলো অন্য রকম। আবদুল মতিন ১৪৪ ধারা ভাঙার পক্ষে বক্তব্য রাখেন। বক্তৃতা না-করলেও, অলি আহাদও একই মত প্রকাশ করেন (তিনি ছাত্র ছিলেন না)।

ঘণ্টাখানেক বক্তৃতার পর গাজীউল হক সভাপতি হিশেবে আন্দোলনকে এগিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে ১৪৪ ধারা ভাঙার পক্ষে তাঁর মত দেন। তাঁর কথার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা অস্থির হয়ে ওঠেন এবং তক্ষুনি রাস্তায় বেরিয়ে পড়তে চান। যাঁরা আইন অমান্য করতে তৈরি ছিলেন, তাঁদের একটা তালিকা করার দায়িত্ব দেওয়া হয় মোহাম্মদ সুলতানকে। হাসান হাফিজুর রহমানও এতে পরে যোগ দেন। ঠিক হয় যে, বিক্ষিপ্তভাবে বের না-হয়ে ছাত্রছাত্রীরা দশজন ছোটো ছোটো দলে বের হবেন।
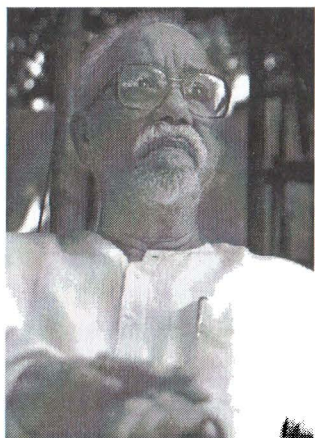
গাজীউল হক

প্রথম যে-দলটি রাস্তায় বের হয়, তার নেতৃত্ব দেন হাবিবুর রহমান। দ্বিতীয় দলের নেতৃত্ব দেন ইবরাহিম তাহা ও আবদুস সামাদ। তৃতীয় দল নিয়ে বের হন আনোয়ারুল হক খান এবং আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ। তিনটি দলের সদস্যদেরই পুলিশ গ্রেফতার করে তাঁদের ভ্যানে তুলে নেয়। ছাত্রনেত্রী সাফিয়া খাতুনের পরিচালনায় এর পর বের হয় চতুর্থ দলটি। এই দলের সদস্যরা সবাই ছিলেন ছাত্রী। এর পর এস এ বারী, শামসুল হক, আনোয়ারুল আজিম, সাইয়িদ আতিকুল্লাহ প্রমুখের নেতৃত্বে আরও ছাত্ররা রাস্তায় বেরিয়ে আসেন। (গাজীউল হক, ১৯৮০) ওদিকে ছাত্রদের ৯১ জনকে গ্রেফতার করার পর আরও ছাত্র গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়ার জন্যে পুলিশের কোনো ভ্যান ছিলো না। তখন পুলিশের লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ এবং ছাত্রদের ইট-পাটকেল ছোঁড়ার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে দেখা দেয় দারুণ বিশৃঙ্খলা। সে সময়ে ছাত্ররা দেয়াল টপকে মেডিকেল কলেজ হসপিটালের প্রাঙ্গণে ঢুকে পড়েন। কেউ বা পুলিশের সামনে দিয়েই রাস্তায় নামেন। তারপর অনেকে চেষ্টা করেন আইন পরিষদের দিকে মিছিল করে যাওয়ার।

পরে যে-ভবনটি জগন্নাথ হলের মিলনায়তনে পরিণত হয়, সেটি ছিলো তখনকার পরিষদ ভবন। পুলিশের অনবরত লাঠিচার্জ আর কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়ার কারণে ছাত্রছাত্রীরা মিছিল নিয়ে এগুতে পারেননি। বরং কেউ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল প্রাঙ্গণে, কেউ বা মেডিকেল কলেজের ছাত্রাবাসের দিকে ছোটাছুটি আরম্ভ করেন। এখন যেখানে শহীদ মিনার, সেখানে ছিলো মেডিকেল কলেজের ছাত্রাবাস—ব্যারাক। অনেকগুলো টিন-শেড ছিলো সেখানে। কলাভবনের বদলে বেলা একটার দিকে সেখানেই ছাত্রদের প্রধান সমাবেশ ঘটে। ছাত্রদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। ছাত্রদের সঙ্গে পুলিশের 'লড়াই' চলছে—এ খবর পেয়ে আরও ছাত্র এবং সাধারণ জনতা এসে বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠে জড়ো হতে থাকেন। ছাত্ররা চেষ্টা করতে থাকেন পরিষদ ভবনের দিকে যেতে। আর, পুলিশ লাঠি চালিয়ে এবং কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়ে তাঁদের ঠেকাতে চেষ্টা করে। এভাবে ছাত্রদের সঙ্গে পুলিশের খণ্ডযুদ্ধ চলতে থাকে অনেক ক্ষণ ধরে।

ওদিকে, সাড়ে তিনটের সময় আইন পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হওয়ার কথা ছিলো। সময় যতো এগিয়ে আসতে থাকে, ছাত্ররা পরিষদের দিকে যাওয়ার জন্যে

ততোই বেপরোয়া হয়ে ওঠেন। আইন পরিষদের কোনো কোনো সদস্য এ সময়ে মেডিকেল কলেজের সামনে দিয়ে পরিষদ-ভবনের দিকে যাচ্ছিলেন। ছাত্ররা তাঁদের অনুরোধ করেন হাসপাতালে গিয়ে আহতদের দেখার জন্যে। এঁদের মধ্যে ছিলেন ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, মনোরঞ্জন ধর এবং প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী। একজন মন্ত্রীও ছিলেন। তবে তিনি গাড়ি থেকে নামেননি।

শেষ পর্যন্ত পুলিশ ছাত্রদের বিশৃঙ্খলা থামাতে ব্যর্থ হলো। বেলা তিনটের একটু পরে তারা গুলি চালায় ছাত্রদের ওপর। কয়েক রাউন্ড গুলি তারা করেছিলো খেলার মাঠের দিকে তাক করে, কিন্তু বেশির ভাগ গুলিই করেছিলো টিন-শেডগুলোর দিকে। গুলি শুরু হওয়ার পর ছাত্রছাত্রীরা যে যে-দিকে পারলেন, পালাতে আরম্ভ করলেন।

যাঁরা মিছিল করে বের হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্য থেকেই পুলিশের গুলিতে নিহত হলেন, তা ঠিক নয়। গুলি গিয়ে লাগলো নানাজনের গায়ে। পুলিশের গুলিতে রফিকউদ্দীন বলে একজন ছাত্রের মাথার খুলি উড়ে গিয়েছিলো (*আজাদ* পত্রিকায় পরের দিন এঁর নাম ভুল করে সালাহউদ্দীন বলে ছাপা হয়। তারই সূত্র ধরে বদরুদ্দীন উমরও এঁকে সালাহউদ্দীন বলে সনাক্ত করেছেন। [উমর, ১৯৮৫]) আবুল বরকত সকাল থেকে ছাত্রসভায় যোগ দিয়েছিলেন (গাজীউল হক, ১৯৮০) তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন ছাত্রাবাসের একটি টিন-শেডের সামনে। তাঁর গায়ে গিয়ে গুলি লাগলো। তিনি আহত হলেন। পরে তিনি মারা যান হসপিটালে। বছর দশেকের একটি ছেলেও গুলির আঘাতে নিহত হলো। নিহত হলেন এক রিক্সাওয়ালা। মোট কথা, এদিন রফিক, সালাম, বরকত, জব্বার প্রমুখ বেশ কয়েকজন নিহত হন। তাঁদের কেউ ঘটনার জায়গাতেই মারা যান, কেউ বা পরে মারা যান হাসপাতালে। পরের দিনের *আজাদ* পত্রিকার খবর থেকে জানা যায় যে, গুলিতে ঘটনাস্থলেই চারজন নিহত ও সতেরোজন আহত হয়েছিলেন। আহতদের মধ্যে পরে হাসপাতালে মারা যান তিনজন। আবদুল মতিন ও আহমদ রফিক বিশ-বাইশ বছর বয়স্ক আরও একজন যুবকের নিহত হওয়ার বিবরণ দিয়েছেন, যাঁর নাম জানা যায়নি। (মতিন ও রফিক, ১৯৯১)

বিভিন্ন স্মৃতিচারণ থেকে মনে হয়, মৃতের সংখ্যা আরও বেশি ছিলো। তবে সঠিক সংখ্যা এখনো জানা যায়নি। অনেকে বলেন যে, কতোগুলো লাশ নাকি পুলিশ সরিয়ে ফেলেছিলো। পরের বছর জানুয়ারি মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী এই ঘটনা নিয়ে একটি ছোটো নাটক লিখেছিলেন। তখন তিনি কারাগারে বন্দী ছিলেন। এই নাটকের নাম তিনি দিয়েছিলেন *কবর।* তাতে তিনি দেখিয়েছিলেন যে, অনেক লাশ গোপনে সমাধিস্থ করা হয়। মোট কথা, তখন সাধারণ লোকেদের মনে এই ধারণা হয়েছিলো যে, যতোজন নিহত বলে জানা গিয়েছিলো, আসলে নিহত হয়েছিলেন তার থেকে অনেক বেশি।

যাঁরা আন্দোলন করেছিলেন, তাঁরাই নিহত হয়েছিলেন কিনা, সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। এই গুলি চালানোর ঘটনাটাই ছিলো গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, ভাষার দাবিতে মানুষ রক্ত দিয়েছে—এ খবর প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষের মনে প্রচণ্ড ক্ষোভ দেখা দিয়েছিলো। হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় বেরিয়ে পড়েন। অনেকেই আসেন মেডিকেল কলেজের দিকে। ঢাকার বেতার কেন্দ্র থেকে ফররুখ আহমদ এবং আবদুল আহাদ-সহ অনেক কর্মচারী কাজ বন্ধ করে বেরিয়ে আসেন। ফলে সেদিন বেতারের তৃতীয় অধিবেশনের সমস্ত অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়। তার বদলে প্রচারিত হয় কেবল রেকর্ডের গান।

এমন কি, এ দিন আইন পরিষদের ভেতরেও উত্তেজিত তর্কবিতর্ক হয়েছিলো। বিরোধী কংগ্রেস দলের সদস্যরা তো সমালোচনা করেইছিলেন, এমন কি, সরকারী দলের সদস্যরাও ছাত্রদের ওপর গুলি করার ঘটনার প্রতিবাদ করেছিলেন। মুসলিম লীগের নেতা মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ এই ঘটনার প্রতিবাদে সবার আগে পরিষদ-কক্ষ ত্যাগ করেন এবং মেডিকেল কলেজ ব্যারাকে এসে হতাহতদের দেখেন। আলী আহমদ খান, শামসুদ্দীন আহমদ, খয়রাত হোসেন ও আনোয়ারা খাতুনও পরিষদ-কক্ষ ত্যাগ করেন। এ ছাড়া, ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও মনোরঞ্জন ধর-সহ কংগ্রেস দলেরও কয়েকজন সদস্যও পরিষদ কক্ষ ত্যাগ করেছিলেন। (মতিন ও রফিক, ১৯৯১)

পরের দিন (২২শে) সরকারী কর্মচারীরা কাজ বন্ধ করে রাস্তায় নামেন। তাঁরা কেবল সেক্রেটারিয়েট প্রাঙ্গণে বিক্ষোভ দেখাননি, বরং মিছিলে যোগদান করেন। রেল-কর্মচারীরা ধর্মঘট করায় এদিন রেল চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। বাস-ট্যাক্সি-রিক্সাও বন্ধ ছিলো। বন্ধ ছিলো দোকানপাটও। সাধারণ মানুষের এই প্রতিবাদ ছিলো স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ—ছাত্রদের আহ্বানে নয়।

গায়েবী জানাজার জন্যে ছাত্রাবাসগুলোর ছাত্রদের মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গণে হাজির হবার আহ্বান জানানো হয়। কিন্তু বেশি ছাত্র সেখানে যাননি। তারপর সেক্রেটারিয়েটের দিক থেকে হাজার হাজার সাধারণ মানুষের মিছিল এসে মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গণে জমায়েত হন। এ ছাড়া, মিছিল করে সাধারণ মানুষরা আসেন নানা পথে, নানা দিক থেকে। শেষে যখন গায়েবী জানাজা হয়, তখন সমস্ত এলাকায় দারুণ ভিড় জমে যায়। বদরুদ্দীন উমরের মতে, এখানে হাজার তিরিশেক লোক উপস্থিত হয়েছিলেন। (উমর, ১৯৮৫) কিন্তু আবদুল মতিন ও আহমদ রফিকের মতে, উপস্থিতির সংখ্যা ছিলো দশ-বারো হাজার। (মতিন ও রফিক, ১৯৯১)

গায়েবী জানাজার পরে এই বিপুল জনতা বিক্ষোভ মিছিল বের করেন। তাঁরা হাই কোর্টের সামনে দিয়ে নাজিমউদ্দীন রোড হয়ে নওয়াবপুরের দিকে যাত্রা করেন। কিন্তু নাজিমউদ্দীন রোডের মুখে পুলিশের লাঠিচার্জ এবং কাঁদানে গ্যাসের
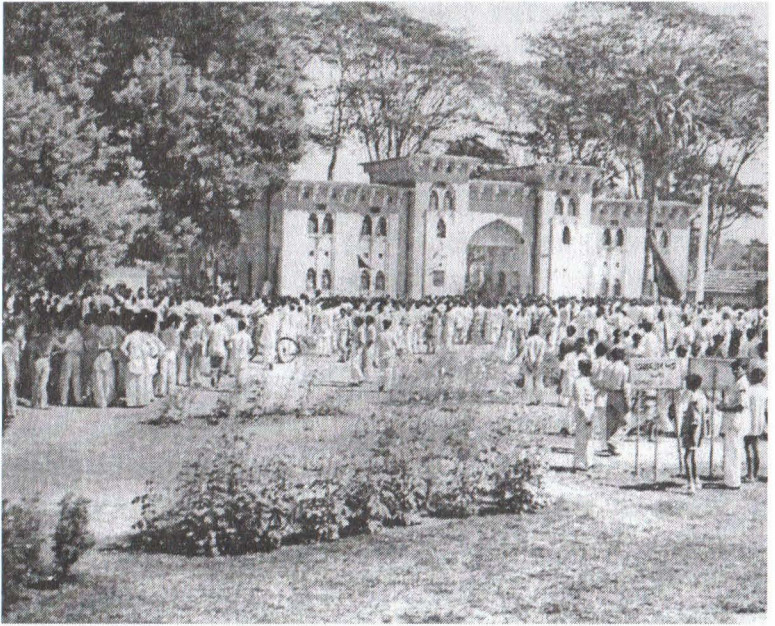
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের ১৪৪ ধারা ভঙ্গের প্রস্তুতি। ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২
ছবি : অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম
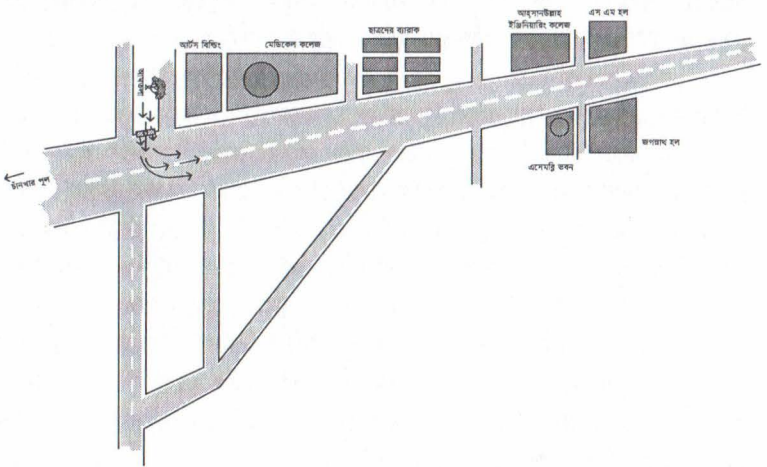
তখনকার কলাভবন থেকে আইন পরিষদে যাওয়ার পথ ও মেডিকেল কলেজের ব্যারাকের নক্সা

হামলায় বিক্ষিপ্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়েন। তারপর দুই দলে বিভক্ত হয়ে এগিয়ে যান তখনকার প্রধান রাস্তা—নওয়াবপুর হয়ে সদরঘাটের দিকে। সে মিছিলের ওপরও পুলিশ তিন/চার জায়গায় গুলি চালিয়েছিলো। সৈন্যবাহিনীর ট্রাক থেকেও এক জায়গায় গুলি চালানো হয় (উমর, ১৯৮৫)। এতে কয়েকজন নিহত হয়েছিলেন। আহত হয়েছিলেন অনেকেই। নিহতদের ছিলেন শফিউর রহমান এবং একজন কিশোর অলিউল্লাহ। (মতিন ও রফিক, ১৯৯১) *আজাদ* পত্রিকায় এদিন নিহতের সংখ্যা চার বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

একেবারে মিথ্যে খবর ছাপানোর জন্যে এদিন *মর্নিং নিউজ* পত্রিকার ছাপাখানা—জুবিলি প্রেস—জনতা পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। সরকারপন্থী দৈনিক *সংবাদের* অফিসও পোড়াতে চেষ্টা করেছিলেন। এমন কি, *আজাদ* পত্রিকায় মোটামুটি ঠিক খবর প্রকাশিত হলেও, এ অফিসের ওপরও জনতা ইট-পাটকেল ছুঁড়েছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, এ পত্রিকার সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন ছিলেন আইন পরিষদের সদস্য। ছাত্রদের ওপর হামলার প্রতিবাদে তিনি এ দিন আইন সভার সদস্য-পদ থেকে ইস্তফা দেন। এদিন সন্ধ্যা থেকে সান্ধ্য আইন জারি করা হয়। রাস্তায় সেনাবাহিনী এবং পুলিশ বাহিনী টহল বাড়ায়। এভাবে কদিনের মধ্যে মূল আন্দোলন স্তিমিত হয়ে আসে।

কিন্তু ভাষা আন্দোলনের ফল হয়েছিলো সুদূরপ্রসারী। বস্তুত, ছাত্ররা রাষ্ট্রভাষার যে-দাবি করেছিলেন, রক্তপাতের ঘটনার ফলে তা সাধারণ মানুষের দাবিতে পরিণত হলো। তা পরিণত হলো আবেগের বস্তুতে। এ আন্দোলন তখন আর ঢাকায় অথবা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলো না। তা মফস্বলেও ছড়িয়ে পড়লো। ছড়িয়ে পড়লো অশিক্ষিত সাধারণ মানুষের মধ্যেও। এক কথায় বলা যায়, এ আন্দোলন ছিলো পাকিস্তান ধ্বংস হওয়ার সূচনা।

রাজনীতিতে ভাষা আন্দোলনের প্রভাব

বাংলা তাঁদের মাতৃভাষা কিনা, একদিন মুসলমানরা তা নিয়েও নিশ্চিত ছিলেন না। কিন্তু ভাষা আন্দোলনের পর তাঁদের মনে বাংলা ভাষা নিয়ে আর কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকলো না। অতঃপর বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে তাঁরা নিজেদের বলেই গণ্য করেন। তাকে আন্তরিকভাবে ভালোবাসতে শুরু করেন। তা ছাড়া, নিজেদের চিহ্নিত করেন বাঙালি হিশেবে। বদরুদ্দীন উমর একে বলেছেন, আরব-ইরান থেকে বাঙালি মুসলমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন। (উমর, ১৯৬৯) সত্যিকার অর্থেই তাই। যে-বাঙালি মুসলমানরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বঙ্গদেশে বাস করেও, আরব-ইরানকে নিজেদের মাতৃভূমি বলে গণ্য করেছেন, তাঁরা সেই মনোভাব ত্যাগ করলেন। বঙ্গদেশকেই স্বদেশ বলে ভাবতে আরম্ভ করলেন। বাংলা ভাষাকেই ভালোবাসলেন। বাংলার হিন্দু, বাংলার বৌদ্ধ, বাংলার খৃস্টানের সঙ্গে নিজেদেরও বাঙালি বলে শনাক্ত করলেন।

কেবল তাই নয়, ভাষা আন্দোলনের ফলে পূর্ব পাকিস্তানের লোকেরা নিজেদের অধিকার সম্পর্কেও আগের চেয়ে বেশি সচেতন হয়ে ওঠেন। ভাষা আন্দোলন তাঁদের কাছে সকল সংগ্রামের প্রতীকে পরিণত হয়। মেডিকেল কলেজের ব্যারাকের বাইরে ২৩শে ফেব্রুয়ারি ছাত্ররা নিজেরাই ইট গেঁথে একটি মিনার তৈরি করেছিলেন। নাম দিয়েছিলেন 'শহীদ মিনার'। পুলিশ তিনদিন পরেই সেই খুদে মিনার ভেঙে ফেলেছিলো। কিন্তু ছাত্ররা আবার তা নির্মাণ করেছিলেন। তারপর পাকিস্তানী আমলেই সেখানে হামিদুর রহমানের নক্সা অনুযায়ী নির্মিত হয় বড়ো একটি শহীদ মিনার। সেই শহীদ মিনার পরিণত হয় ছাত্র এবং জনগণের তীর্থস্থানে। পরিণত হয় তাঁদের সকল সংগ্রাম এবং প্রতিবাদের প্রতীকে। এই মিনার প্রতিজ্ঞা নেওয়ার বেদী বলে গণ্য হয় সবার কাছে। পাকিস্তানী সৈন্যরা তাই মুক্তিযুদ্ধের একেবারে গোড়ার দিকেই শহীদ মিনার ভেঙে দিয়েছিলো। কিন্তু যুদ্ধের
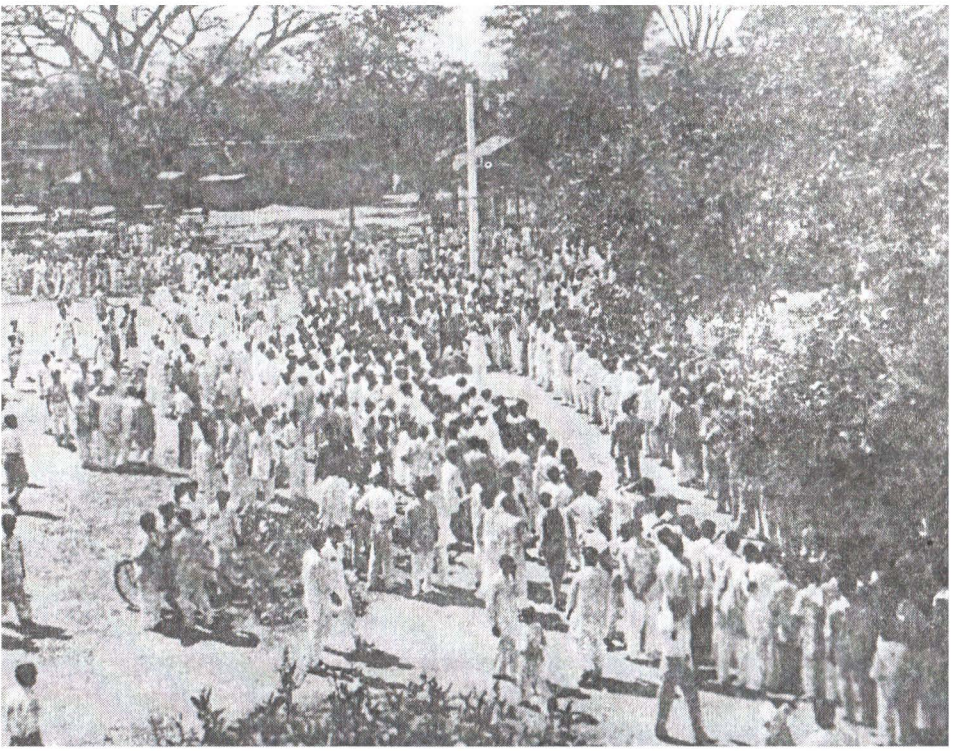
২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২

পর তা আবার নির্মিত হয়েছে বিশাল আকারে। এর আদলে সারা দেশে গড়ে উঠেছে হাজার হাজার শহীদ মিনার। কারণ, এ মিনার ভাষা আন্দোলন তথা আমাদের গণতান্ত্রিক আন্দোলনেরই প্রতীক।

শহীদ মিনারের মতো, এই আন্দোলন সম্পর্কিত কবিতা এবং গানও বাঙালিদের মনে অসাধারণ অনুপ্রেরণা এবং আবেগ জন্ম দিয়েছিলো। এই আন্দোলনের দিন সেখানে হাজির ছিলেন আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী। তখন তিনি ছিলেন ছাত্র। তিনি আমাকে বিবিসির এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন যে, আন্দোলনের দিন মাথার খুলি উড়ে যাওয়া একটি লাশ দেখে দারুণ কষ্ট পেয়েছিলেন তিনি। সেই রাতেই তিনি লিখেছিলেন, 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি?' এটি তিনি গান হিশেবে লেখেননি। লিখেছিলেন কবিতা হিশেবে। সত্যিকার অর্থে কবিতা হিশেবে এটি যে বিশেষ সার্থক হয়েছিলো, তাও বলা শক্ত। কিন্তু পরের বছর এই কবিতায় সুর দিয়ে একে গানে পরিণত করেন আবদুল লতিফ। (ভাষা আন্দোলনের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে বিবিসি বাংলা বিভাগের ধারাবাহিক অনুষ্ঠান, ২০০২) সেই সুরটি আবদুল লতিফ আমাকে বিবিসির ঐ অনুষ্ঠানের জন্যে গেয়ে শুনিয়েছিলেন। কিন্তু রণসঙ্গীতের মতো জোর তালওয়ালা সেই সুর কিছু দিন চললেও, শেষ পর্যন্ত টিকে

থাকেনি। আলতাফ মাহমুদ পরে এতে চার্চ-সঙ্গীতের মতো বর্তমানে প্রচলিত সুরটি দেন। সুরটি আবদুল লতিফও পছন্দ করেন। এই গান এখন জাতীয় সঙ্গীতের মতোই বহুল প্রচলিত এবং জনপ্রিয়। আন্দোলনের ঠিক পরে গাজীউল হকও একটি গান লিখে এবং তাতে সুর দিয়ে প্রচার করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত টিকে থাকে আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো গানটিই। এ গানও দীর্ঘদিন বাঙালিদের অনুপ্রেরণা দিয়েছে, এখনো দেয়।

সত্যিকার অর্থে ভাষা আন্দোলনের পর কেবল ভাষা এবং সাহিত্য সম্পর্কেই মানুষের মনোভাব বদলে গেলো না, মনোভাব বদলে গেলো পাকিস্তান সম্পর্কেও। পাকিস্তান হওয়ার পর বাঙালি মুসলমানরা সেই দেশে তাঁদের সব ইচ্ছে পূরণের স্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু ভাষা আন্দোলনের পর তাঁরা নিজেদের সত্যিকার অবস্থান
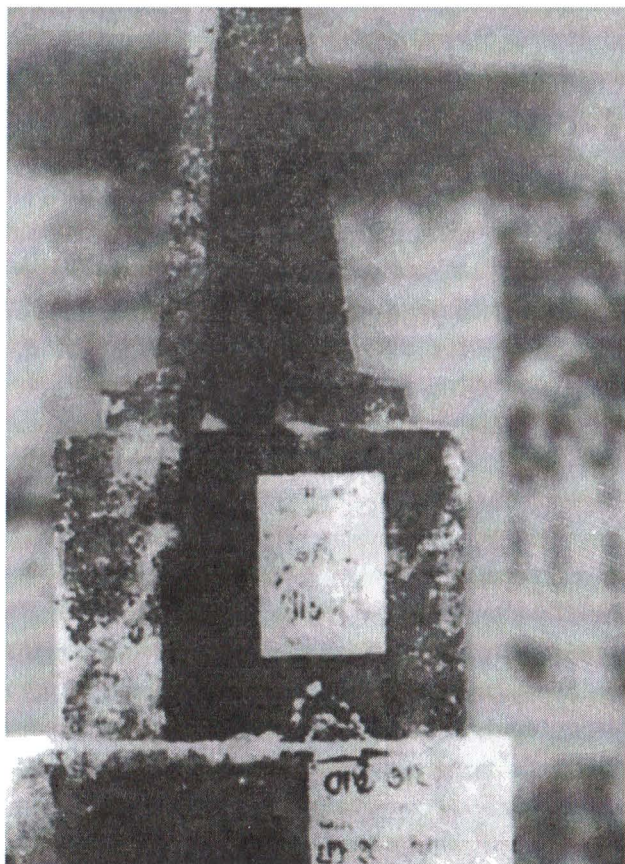
প্রথম শহীদ মিনার, তৈরি করার তিনদিন পরই যা ভেঙে ফেলেছিলো পুলিশ

বুঝতে পারলেন। বুঝতে পেরে হতাশ হলেন। তা ছাড়া, ভাষা আন্দোলন তাঁদের মনে যে-গণতান্ত্রিক চেতনার জন্ম দিয়েছিলো, তা রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক নিপীড়ন এবং শোষণ সম্পর্কেও তাঁদের সচেতন করলো।

রাষ্ট্রভাষার প্রশ্ন ছাড়াও, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের সত্যিকার অর্থে বহু অভিযোগ ছিলো। আগেই বলেছি, আয়তনের দিক দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তান অনেক বড়ো হলেও, পাকিস্তানের বেশির ভাগ লোকই বাস করতেন পূর্ব পাকিস্তানে। পশ্চিম পাকিস্তানে বাস করতেন শতকরা ৪৪ জন; পূর্ব পাকিস্তানে শতকরা ৫৬ জন। একটা গণতান্ত্রিক দেশে মানুষের সংখ্যাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ, আয়তন নয়। সে দিক দিয়ে সুযোগসুবিধার অধিকাংশ পূর্ব পাকিস্তানেরই পাওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেলো তার উল্টোটা। পাকিস্তানের বড়ো নেতারা শুধু নন, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তারাও প্রায় সবাই ছিলেন অবাঙালি। সৈন্যদেরও বলতে গেলে সবাই ছিলো অবাঙালি। রাজধানী ছিলো ঢাকার বদলে করাচিতে। দেশের টাকাপয়সার তিন ভাগের দু ভাগই ব্যয় হতো পশ্চিম পাকিস্তানে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর যতো উন্নয়নমূলক কাজকর্ম হয়েছিলো, তারও সিংহ ভাগ হয়েছিলো পশ্চিম পাকিস্তানে।

রেহমান সোবহান তাঁর গ্রন্থে এই বৈষম্যের পরিমাণ কেমন ছিলো, তা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তাতে দেখা যায়, ১৯৪৯-৫০ থেকে ১৯৬৯-৭০ সালে পূর্ব পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব ব্যয়ের পরিমাণ ছিলো শতকরা মাত্র ২৩ ভাগ। এই সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানে উন্নয়ন খাতে ব্যয় হয় ৬২ বিলিয়ন টাকা। অপর পক্ষে, পূর্ব পাকিস্তানে উন্নয়ন খাতে ব্যয়ের পরিমাণ ছিলো ৩০ বিলিয়ন টাকা। এ ছাড়া, ৪৯-৫০ সালে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে মাথাপিছু আয় ছিলো যথাক্রমে ২৮৮ ও ৩৫১ টাকা। বছরে বছরে এই বৈষম্য আরও বাড়তে থাকে। ৬৯-৭০ সালে তা দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩৩১ ও ৫৩৩ টাকা। (সোবহান, ১৯৯৪) এ থেকে সহজেই দেখা যায়, পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনীতি পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় কতো বেশি উন্নত হচ্ছিলো।

এই বৈষম্য কতো বেশি, তার আরও কয়েকটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। যেমন, ১৯৫৫ সালের শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তা ছিলেন ৭৪১ জন। তাঁদের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান থেকে ছিলেন ৩ জন জয়েন্ট সেক্রেটারি, ১০ জন ডেপুটি সেক্রেটারি আর ৩৮ জন আন্ডার সেক্রেটারি—মোট ৫১ জন। অর্থাৎ শতকরা সাতজনেরও কম। মেজর পর্যন্ত সামরিক কর্মকর্তা ছিলেন ৯০৯ জন, তাঁদের মধ্যে বাঙালি ছিলেন মাত্র ১৩ জন। বিমান বাহিনীর ৭০০ কর্মকর্তার মাত্র ৬০ জন ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের। পূর্ব পাকিস্তান নদীনালায় পূর্ণ হলেও, নৌবাহিনীতে বাঙালি ছিলেন সবচেয়ে কম—৬০০ কর্মকর্তার মধ্যে ৭ জন। ১৯৫৫ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত পাকিস্তান মোট রপ্তানি করেছিলো ১০৩৮ কোটি টাকার পণ্য, এর

মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের ভাগ ছিলো শতকরা ৬১ ভাগ। অথচ পূর্ব পাকিস্তান উন্নয়ন খাতে পাচ্ছিলো মোট ব্যয়ের শতকরা ৩৪ ভাগ। আর, বৈদেশিক সাহায্যের শতকরা ৩০ ভাগের বেশি কখনোই পায়নি পূর্ব পাকিস্তান। (কবির, ১৯৯৪)

দেশের দুই অংশের মধ্যে এই বিরাট বৈষম্য সম্পর্কে প্রথমে সাধারণ মানুষের মনে স্পষ্ট ধারণা ছিলো না। কিন্তু আস্তে আস্তে পূর্ব পাকিস্তানের লোকেরা এই বৈষম্য কতো বেশি, তা বুঝতে পারলেন। এ ব্যাপারে আওয়ামী লীগের পোস্টার 'সোনার বাংলা শ্মশান কেন?' খুব কাজ করেছিলো বলে রেহমান সোবহান মনে করেন। (সোবহান, ১৯৯৪) এই বৈষম্যের ধারণা পরিষ্কার হওয়ায়, তাঁদের মধ্যে এ নিয়ে অসন্তোষ দেখা দিলো।

পাকিস্তানের নেতারা ভাষার বিষয়টি যে-রকম বিমাতার দৃষ্টিতে দেখেছিলেন, তাতে বাঙালিরা রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সুবিচারও আশা করতে পারলেন না। ফলে ভাষা আন্দোলনের পরে সেই আন্দোলনই পরিণত হলো গণতান্ত্রিক এবং অধিকার আদায়ের আন্দোলনে। মুসলিম লীগের শাসন নিয়ে বেশির ভাগ মানুষই আর সুখী থাকতে পারলেন না। এরই মধ্যে একবার লবণের সের (এক কিলোর থেকে একটু কম) হলো ষোলো টাকা। তা নিয়ে লোকেদের অভিযোগের সীমা থাকলো না। এ ছাড়া, খাদ্যের অভাব দেশে অনেকবারই দেখা দিয়েছিলো। (কামাল, ২০০৯) যে-মুসলিম লীগকে একদিন পূর্ববাংলার জনগণ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়ে নির্বাচিত করেছিলেন, এসবের পরিপ্রেক্ষিতে তারই বিরোধিতা করতে শুরু করলেন।

দেশবিভাগের ঠিক পরে মুসলিম লীগের তিনটি উপদল ছিলো বলে আহমদ কামাল বিশ্লেষণ করেছেন। এই তিনটি উপদল হলো: নাজিমউদ্দীন-পন্থী ঢাকা উপদল, সোহরাওয়ার্দী-পন্থী আধুনিক দল আর ফজলুল হক-পন্থী গ্রামীণ দল। এ ছাড়া, ভাসানী-পন্থী আসাম মুসলিম লীগপন্থীরাও ছিলেন। এসব উপদলের নেতাদের মধ্যে নাজিমউদ্দীন এবং সোহরাওয়ার্দী বাঙালিদের নিয়ে তেমন ভাবিত ছিলেন না। তা ছাড়া, ক্ষমতায় থাকলেও পূর্ব পাকিস্তানের বেশির ভাগ জায়গাতেই তৃণমূল পর্যায়ে মুসলিম লীগ বিশেষ সক্রিয় ছিলো না।

মুসলিম লীগের উপদলীয় টানাপোড়েনকে কেন্দ্র করে ১৯৪৯ সালের ২৩শে জুন মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে গঠিত হয় আওয়ামী মুসলিম লীগ—অর্থাৎ সাধারণ মানুষদের মুসলিম লীগ। এ ছাড়া, মাহমুদ আলীকে নিয়ে তখনকার একমাত্র অসাম্প্রদায়িক দল গঠিত হয়েছিলো—যুব লীগ (১৯৫১), আগেই যার কথা উল্লেখ করেছি। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন গঠিত হয় ভাষা আন্দোলনের পরে—১৯৫২ সালে। ভাষা আন্দোলনের পর এ কে ফজলুল হকও নতুন দল গঠন করলেন কৃষক-শ্রমিক পার্টি। ওদিকে, দেশবিভাগের ঠিক পরে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানে আসেননি। গণ-পরিষদে তাঁর সদস্য পদও খারিজ হয়ে যায় ১৯৪৯ সালে। তিনি মূলধারা রাজনীতি থেকে ছিটকে পড়েছিলেন। তিনি এসে 'জিন্নাহ

মুসলিম লীগ' নামে একটি দল গঠন করতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাতে জুৎ করতে না-পারায়, আওয়ামী মুসলিম লীগে যোগদান করেন। এ ছাড়া, অসাম্প্রদায়িক 'গণতন্ত্রী দল' গঠিত হয় ১৯৫৩ সালে।

আদর্শের দিক দিয়ে এসব দল অভিন্ন ছিলো না, তৃণমূল পর্যায়ে সংগঠিতও ছিলো না। কিন্তু সবগুলোই ছিলো মুসলিম লীগ-বিরোধী। দেশবিভাগের পর থেকে মুসলিম লীগ ছ বছরে যে-শাসন কার্য চালিয়েছিলো, তাকে আহমেদ কামাল বলেছেন, খাদ্যাভাব এবং পুলিশী নির্যাতনের শাসন। (কামাল, ২০০৯) বিরোধী দলগুলো এই শাসনের অবসান চাইছিলো। চাইছিলেন সাধারণ মানুষরাও। দলমত-নির্বিশেষে ছাত্র সমাজও।

সে জন্যে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের আগে ১৯৫৩ সালের ১৪ই নভেম্বর আওয়ামী লীগের কাউন্সিলে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে নির্বাচনে নামার জন্যে যুক্তফ্রন্ট গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। একুশ দফার খসড়াও গৃহীত এখানে। তারপর চৌঠা ডিসেম্বর ফজলুল হক, মওলানা ভাসানী এবং সোহরাওয়ার্দী মিলে একুশ দফার দাবিতে জোট গঠন করলেন। এই জোটের নাম তাঁরা দিলেন ইউনাইটেড ফ্রন্ট অথবা যুক্তফ্রন্ট। তৃণমূল পর্যায়ে এই দল সংগঠিত ছিলো না। কিন্তু ফজলুল হক, সোহরাওয়ার্দী এবং ভাসানীর ক্যারিজমা অর্থাৎ অন্যদের আকৃষ্ট করার মতো ব্যক্তিগত প্রভাব ছিলো। তার থেকেও বড়ো কথা, মুসলিম লীগ-বিরোধী মনোভাবে জনগণ ছিলেন ঐক্যবদ্ধ।

একুশ দফা নামটিও লক্ষ করার মতো। একুশে ফেব্রুয়ারির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এর মধ্যে চারটি দফা ছিলো বাংলা ভাষা সংক্রান্ত। বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা, বর্ধমান হাউসে (মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন) বাংলা ভাষা-সাহিত্যের গবেষণা প্রতিষ্ঠান গঠন করা, শহীদ মিনার নির্মাণ করা এবং ২১শে ফেব্রুয়ারিকে 'শহীদ দিবস' আখ্যা দিয়ে তাকে সরকারী ছুটি ঘোষণা করা। কিন্তু এই দফাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিলো পূর্ব পাকিস্তানের জন্যে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন। এতে বলা হয়, কেন্দ্রের হাতে থাকবে কেবল প্রতিরক্ষা, মুদ্রা এবং বৈদেশিক নীতি।

৫৪ সালের ৮ মার্চ যে-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তাতে মুসলিম লীগ শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। ৩০০ আসনের মধ্যে যুক্ত ফ্রন্ট জয়ী হয়েছিলো ২২২ মতান্তরে ২২৩টি আসনে। মুসলিম লীগ পেয়েছিলো মাত্র ৯টি আসন। এমন কি, মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমীনও হেরে গিয়েছিলেন। যুক্তফ্রন্টের আসনগুলোর মধ্যে আওয়ামী মুসলিম লীগ পেয়েছিলো ১৪২টি, কৃষক-শ্রমিক পার্টি ৪৮টি, নেজাম-ই-ইসলামী ১৯টি আর গণতন্ত্রী দল ১৩টি আসন। কিন্তু মন্ত্রিসভা গঠন করতে গিয়ে জটিলতা দেখা দেয়। ফজলুল হককে মুখ্যমন্ত্রী করার সিদ্ধান্ত হলেও সবচেয়ে বড়ো দল—আওয়ামী লীগকে তিনি ন্যায্য আসন দিতে তৈরি ছিলেন না। সে জন্যে দোসরা এপ্রিল কেবল চারজনের মন্ত্রিসভা গঠন করেন

ফজলুল হক। এর প্রায় দেড় মাস পরে আওয়ামী লীগের সঙ্গে সমঝোতার ভিত্তিতে ১৫ই মে তারিখে গঠিত হয় সম্প্রসারিত মন্ত্রিসভা। এই দিনই আদমজী জুট মিলে বাঙালি ও বিহারীদের দাঙ্গা হয়। এতে সরকারী হিশেবে নিহত হন চার শো লোক, বেসরকারী হিশেবে ছ শো। যুক্তফ্রন্ট সম্পর্কে অবাঙালিদের অবিশ্বাস এই দাঙার পেছনে কাজ করে থাকতে পারে। মোট কথা, যুক্তফ্রন্ট শাসনের সূচনা শুভ হয়নি।

ওদিকে, পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয় দেখে কেন্দ্রীয় সরকার মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারলো না। ১৯শে এপ্রিল তাই করাচি থেকে ঘোষণা করা হয়েছিলো যে, গণপরিষদে উর্দুর সঙ্গে বাংলাকেও রাষ্ট্রভাষা করা হবে। তবে তা করা হবে বিশ বছর পরে। আপাতত রাষ্ট্রভাষা হিশেবে থাকবে ইংরেজিই। এই হাস্যকর ঘোষণা বাঙালিরা মেনে নিতে পারেননি। আর পশ্চিম পাকিস্তানও মেনে নিতে পারেনি যুক্তফ্রন্টের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবি। এর ওপর, ফজলুল হকের একাধিক বক্তব্যও পশ্চিম পাকিস্তানকে বিচলিত করেছিলো। যেমন, ৩রা মে কলকাতার নেতাজী ভবনে তিনি বলেছিলেন, 'বাঙালি এক অখণ্ড জাতি। ... আশা করি ভারত কথাটির ব্যবহার করায় আপনারা আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমি উহার দ্বারা পাকিস্তান ও ভারত উভয়কে বুঝাইয়াছি। এই বিভাগকে কৃত্রিম বিভাগ বলিয়া আমি মনে করিব। আমি ভারতের সেবা করিব।' পরের দিন তিনি আবার বলেন, 'দুই বাংলার মধ্যে যে ব্যবধান আছে তাহা একটি স্বপ্ন ও ধোঁকা মাত্র। করুণাময় খোদাতায়ালার দরবারে আমার একটি প্রার্থনা তিনি যেন এই ব্যবধান দূর করেন।' (হাবিবুর, ২০০৮)

এ বক্তব্য থেকে মনে হতে পারে যে, ফজলুল হক যুক্তবঙ্গের স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেছিলেন। বস্তুত, তাঁর অভিপ্রায় সম্পর্কে পাকিস্তানী নেতাদের মনে অবিশ্বাস এবং সন্দেহ দেখা দেয়। ফলে কেন্দ্রীয় সরকার ২০শে মে গভর্নরের শাসন চালু করলো। কিন্তু তাতেও সন্তুষ্ট হতে না-পারায়, যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা শপথ নেওয়ার মাত্র দু সপ্তাহ পরেই—২৯শে মে—তাকে বাতিল করলো। এর পর সবগুলো দল মিলে একযোগে আন্দোলন না-করে, বরং কৃষক-শ্রমিক দল এবং আওয়ামী লীগ একে অন্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করেছে কেন্দ্রীয় সরকারের মন জুগিয়ে ক্ষমতায় আসতে। যেমন, সেবারের স্বাধীনতা দিবসে (১৪ই অগস্ট ৫৪) অবাঙালি গভর্নর ইস্কেন্দার মীর্জা সম্পর্কে ফজলুল হক বলেন যে, তিনি হলেন খাঁটি বাঙালি। নভেম্বর মাসে গভর্নর জেনারেল ঢাকায় এলে একদিকে ফজলুল হক এবং অন্যদিকে আওয়ামী লীগের আতাউর রহমান তাঁর মন জয় করার জন্যে প্রতিযোগিতায় নামেন। তারপর কেউ গভর্নর হন, কেউ মন্ত্রী হন। কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীন না-হওয়া পর্যন্ত সত্যিকার অর্থে পূর্ববাংলায় এর পর কোনো স্থায়ী সরকার ক্ষমতায় আসেনি। বরং ১৯৫৪ থেকে ৫৮ সালের মধ্যে এতোবার মন্ত্রিসভার

পরিবর্তন হয়েছিলো যে, প্রথম এগারো বছরের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে নবম মন্ত্রিসভা শপথ নিয়েছিলো। এভাবে ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে-গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জয় দেখা দিয়েছিলো, অঙ্কুরেই তা বিনষ্ট হয়।

পাকিস্তানের সংবিধান রচনার কাজ শেষ হয় ন বছরের চেষ্টায়। ১৯৫৬ সালের এই সংবিধানে পূর্ব পাকিস্তানের অসন্তোষ খানিকটা কমানোর জন্যে একাধিক ব্যবস্থা রাখা হয়। প্রথমত, উর্দুর সঙ্গে বাংলাকেও রাষ্ট্রভাষা হিশেবে স্বীকার করে নেওয়া হয়। তা ছাড়া, 'প্যারিটি' নামে রাখা হলো একটি ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী ঠিক হলো যে, পাকিস্তানে পাঁচটি প্রদেশ থাকবে না, থাকবে মাত্র দুটি প্রদেশ—পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান। সিন্ধু, বেলুচিস্তান, পাঞ্জাব এবং উত্তর পশ্চিম পাকিস্তান মিলে হবে একটি প্রদেশ। আরও ঠিক হলো যে, দুই প্রদেশের মধ্যে রাজনৈতিক, আর্থিক এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা মোটামুটি সমান ভাগে বিভক্ত হবে।

আপাতদৃষ্টিতে এটাকে সুবিচার বলে মনে হতে পারে। কিন্তু এটা ছিলো বিধিবদ্ধ চরম অবিচার। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। পাকিস্তানের পার্লামেন্টে আসন ছিলো ৩০০। প্যারিটি অনুযায়ী ঠিক হলো যে, এই তিন শো আসনের মধ্যে ১৫০টি থাকবে পূর্ব পাকিস্তানের, বাকি ১৫০টি পশ্চিম পাকিস্তানের। এটাকে ন্যায় বিচার বলা যায় না। কারণ, পূর্ব পাকিস্তানে বাস করতেন পাকিস্তানের মোট লোকসংখ্যার শতকরা ৫৬ ভাগ। শতকরা ৫৬ জন মানুষের জন্যে যতোটি আসন, পশ্চিম পাকিস্তানের শতকরা ৪৪ জন মানুষের জন্যেও ততোটা আসন। এটাকে আদৌ গণতান্ত্রিক বলা যায় না। তেমনি, শতকরা ৫৬ জন লোক যদি ৪৪ জন লোকের সমান অর্থনৈতিক সুযোগসুবিধা পান, তাকেও ন্যায় বিচার বলে আখ্যায়িত করা সঙ্গত হয় না। তাই প্যারিটির নিয়ম চালু হলেও পূর্ব পাকিস্তানের অসন্তোষ থেকেই গেলো।

এর ওপরে ১৯৫৮ সালের শেষ দিকে জারি হলো ফৌজী শাসন। প্রথমে ইস্কেন্দার মীর্জার, তারপর আইয়ুব খানের। ফলে দেশে যেটুকু গণতন্ত্র ছিলো, তাও লোপ পেলো। প্যারিটির পথ ধরে পূর্ব পাকিস্তান যে-সুযোগসুবিধা পেতে পারতো, তা থেকেও বঞ্চিত হলো। পূর্ণ গণতন্ত্রের বদলে আইয়ুব খান ঘোষণা করলেন বুনিয়াদী অর্থাৎ মৌলিক গণতন্ত্রের কথা। আসলে মৌলিক গণতন্ত্রের নাম দিয়ে তিনি নিজের ক্ষমতাকেই পাকাপোক্ত করে নিতে চেয়েছিলেন। এর ফল দেখা গেলো ১৯৬৪ সালের নির্বাচনে। বুনিয়াদী গণতন্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী তখন যে-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তা নিতান্ত প্রহসনে পরিণত হয়। আইয়ুব তাঁর গদিতে বসলেন আরও পাকাপোক্তভাবে। কেবল তাই নয়, তিনি ফৌজী শাসনের যে-ভয়ানক দৃষ্টান্ত রেখে গেলেন, পাকিস্তান তা আর কাটিয়ে উঠতে পারেনি। একুশ শতকের শুরুতেও নয়। এমন কি, স্বাধীন বাংলাদেশেও নয়। পাকিস্তানে শিক্ষাপ্রাপ্ত দুই জেনারেল বাংলাদেশে গণতন্ত্রের নামে ফৌজী শাসন চালিয়েছিলেন পনেরো বছর।

'আমরা সবাই বাঙালি'

পাকিস্তান গঠিত হয়েছিলো ধর্মের ভিত্তিতে। ১৯৪০-এর দশকে বাঙালি মুসলমানরাও নিজেদের সবচেয়ে বড়ো পরিচয় বিবেচনা করেছে তাঁদের ধর্মীয় পরিচয়কে। কিন্তু ভাষা আন্দোলনের পর তাঁরা বাংলা ভাষাকে ভালোবাসতে শিখলেন। বাংলা সাহিত্য নিয়ে গর্ব বোধ করলেন। গর্ব বোধ করলেন বাংলার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের নিয়েও। যেমন, এক সময়ে তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে নিজেদের কবি বলে গণ্য করতেন না। কিন্তু ভাষা আন্দোলনের পর তাঁরা তাঁকে ভালোবাসলেন। (মুরশিদ, ১৯৯৩) দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'ধনধান্যপুষ্প-ভরা', অতুলপ্রসাদের 'মোদের গরব মোদের আশা আ মরি বাংলা ভাষা' ইত্যাদি গান জনপ্রিয় হয়ে উঠলো। সত্যি বলতে কি, এসব পঙ্‌ক্তি স্লোগানে পরিণত হলো। মাইকেল মধুসূদন দত্তকেও তাঁরা নিজেদের কবি বলে বিবেচনা করতে আরম্ভ করলেন। এক সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রকে তাঁরা রীতিমতো অপছন্দ করতেন। গণ্য করতেন মুসলমান-বিদ্বেষী বলে। কিন্তু ভাষা আন্দোলনের পর বঙ্কিমচন্দ্র গ্রহণযোগ্য হলেন তাঁদের কাছে। এ ছাড়া, কেবল গ্রহণযোগ্য নয়, রীতিমতো জনপ্রিয় হলেন শরৎচন্দ্র।

এক কথায়, তাঁরা সব কিছুতে বাঙালি হয়ে উঠলেন। অর্থাৎ ধর্মের পাশাপাশি তাঁদের ভাষিক পরিচয়ও গুরুত্ব লাভ করলো। আরবি-ফারসির বদলে তাঁরা সন্তানের নাম রাখলেন বাংলায়। '৬২/৬৩ সাল থেকে ইংরেজির বদলে বাংলায় গাড়ির নম্বর লিখতে এবং বাংলায় সই করতে আরম্ভ করলেন। ('৬৩ সালে ব্যাংকের হিসাব খোলার সময় বাংলায় সই করতে গিয়ে রীতিমতো ঝগড়া করতে হয়েছিলো—মনে আছে।) এমন কি, দোকানের বাংলা নাম-ফলকও দেখা দিতে লাগলো। '৬৬ সাল থেকে রমনার বটমূলে ওয়াহিদুল হক ও সনজীদা খাতুনের নেতৃত্বে ছায়ানট যেসব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করতে শুরু করলো, তাতে হাজার হাজার লোক যোগ দিলেন। সেখানে যাঁরা যেতেন, তাঁরা অনেকেই গান অথবা নাচের সমঝদার ছিলেন না। কিন্তু

সেখানে যাওয়া এবং বাঙালিয়ানা প্রকাশ করা, মুড়ি-চিঁড়ে খাওয়া, পয়লা বৈশাখের উৎসব পালন করা ইত্যাদি ফ্যাশানের অঙ্গ হয়ে গেলো।

এক কথায় বলা যেতে পারে, ভাষা আন্দোলনের পরে বাঙালিয়ানার একটা জোয়ার এলো। এই জোয়ারে ১৯৬০-এর দশকে পূর্ববাংলা ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে উঠলো। একদিন ধর্মের সূত্র ধরে তাঁরা পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে একটা দেশ গড়েছিলেন। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের দুঃশাসন আর শোষণের ফলে ধর্মের ঐক্য তাঁদের কাছে গৌণ হয়ে গেলো। বরং পশ্চিম পাকিস্তানকে তাঁরা শত্রু হিশেবে বিবেচনা করতে আরম্ভ করলেন। বেশি আপন বলে গণ্য করলেন হিন্দু-প্রধান পশ্চিমবঙ্গকে। ধর্মের চেয়ে ভাষা, সাহিত্য আর সঙ্গীতের মিল তাঁদের কাছে বড়ো হয়ে দেখা দিলো। বড়ো হয়ে দেখা দিলো সংস্কৃতির বন্ধন।

এর পেছনে বাঙালি মুসলমানদের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিবর্তনও একটা ভূমিকা রেখেছিলো। দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে মুসলমানরা লেখাপড়ায় খুব পিছিয়ে ছিলেন। তাঁদের মধ্যে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী তখনো গড়ে ওঠেনি। কিন্তু দেশবিভাগের পর বাড়তি সুযোগ-সুবিধা পাওয়ায় তাঁদের মধ্যে একটা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে ওঠে। দু-একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টা বোঝানো যেতে পারে।

১৯৪০ থেকে ৪৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গড়ে ৭,৫৯২ মুসলমান ছাত্রছাত্রী প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়েছিলো। (তখন সমগ্র বঙ্গদেশ এবং আসাম ছিলো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে।) হিন্দু ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে তাঁদের অনুপাত ছিলো ১৪ :৩। (*ক. বি. ক্যালেন্ডার,* ১৯৪১-৪৬) কিন্তু ১৯৬০-৬১ সালে একমাত্র পূর্ববঙ্গ থেকেই এই পরীক্ষা দেয় ৫৪,৬৬৭ জন। ১৯৭২-এর পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিলো পৌনে চার লাখ। এঁদের মধ্যে অন্তত চার ভাগের তিন ভাগ মুসলমান ছিলেন। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও সমান তালে পরিবর্তন এসেছিলো। লেখাপড়ার সুযোগ পেয়ে মুসলমানদের মধ্যে বিএ-এমএর সংখ্যা আগের থেকে দ্রুত বৃদ্ধি পেলো। তেমনি, দেশবিভাগের আগে বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে কজন পাশ-করা ডাক্তার ছিলেন? কজন এঞ্জিনিয়ার ছিলেন? কজন পিএইচ.ডি ছিলেন? সঠিক সংখ্যা জানা যায় না, কিন্তু সংখ্যাটা ছিলো মুষ্টিমেয়। অপর পক্ষে, দেশবিভাগের বিশ বছরের মধ্যে অবস্থাটা নাটকীয়ভাবে বদলে গেলো। তাঁদের মধ্যে শত-শত ডাক্তার হলেন, এঞ্জিনিয়ার হলেন, পিএইচ.ডি হলেন। প্রমাণিত হলো, শিক্ষা জিনিশটা ধর্মের ওপর নির্ভরশীল নয়। এটা নির্ভর করে সুযোগ ও সুবিধার ওপর।

দেশবিভাগের আগে সরকারী কর্মকর্তাদের মধ্যেও মুসলমান খুব কম ছিলেন। ১৯৪২ সালে বঙ্গদেশে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তা ছিলেন ১৮১ জন। তাঁদের মধ্যে মাত্র ২২ জন ছিলেন মুসলমানরা (দুজন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করা, অন্যরা পশ্চিমা মুসলমান)। ৩৭ জন সিভিল সার্ভেন্টের মধ্যে ২৯ জনই ছিলেন বাঙালি হিন্দু। বাকিরা মুসলমান, কিন্তু বাঙালি কিনা, তা জানা যায় না। ২৫০ জন

মওলানা ভাসানী

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের মধ্যে ৯৫ জন এবং ৪৮৫ জন সাব-ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের মধ্যে ১৮৭ জন মুসলমান ছিলেন। (*বেঙ্গল সিভিল লিস্ট*, ১৯৪৩)

অপর পক্ষে, ১৯৬২ সালে পূর্ব পাকিস্তানের সরকারী কর্মকর্তাদের তালিকা অনুযায়ী, সিভিল সার্ভেন্টের সংখ্যা ছিলেন ৭১৪ জন, বিচার বিভাগে ২০৩ জন, শিক্ষা বিভাগে ৮৪৪ জন। (*হিস্টরি অব সার্ভিসেস অব গেজেটেড অফিসার্স*, ১৯৬৫-৬৬) এঁদের মধ্যে কিছু হিন্দু এবং পশ্চিমা মুসলমান ছিলেন ঠিকই, কিন্তু বেশির ভাগ ছিলেন বাঙালি মুসলমান। তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ কথা, চাকরির বাজারে হিন্দুদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা কমে গেলো। বলতে গেলে থাকলোই না।

ব্যবসা-বাণিজ্যে বাঙালি মুসলমানরা চিরদিন পিছিয়ে ছিলেন। কিন্তু দেশবিভাগের পর হিন্দুরা চলে যাওয়ায়, ব্যবসা ক্ষেত্রেও এগিয়ে এলেন অনভিজ্ঞ মুসলমানরা। ফলে কিছু কালের মধ্যে মুসলমান সম্প্রদায়ে কিছু ব্যবসায়ী তৈরি হলেন। যদিও বড়ো বড়ো ব্যবসার মালিক হলেন অবাঙালিরা, যাঁদের ঢালাওভাবে বলা হতো 'বিহারী'। মোট কথা, বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে একটা মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে ওঠায়, হিন্দুদের প্রতি তাঁদের বিদ্বেষ কমে গেলো। এমন কি, আগে হিন্দুদের তুলনায় নিজেদের ছোটো ভাবার যে-মনোভাব ছিলো, তাও চলে গেলো। জাতিভেদ প্রথার কারণে হিন্দুরা মুসলমানদের প্রতি ছোঁওয়া-ছুঁয়ির যে-সম্পর্ক রাখতেন, উচ্চবর্ণের হিন্দুরা দেশ ত্যাগ করায়, তাও হ্রাস পেলো।

এক কথায়, হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক আগের থেকে অনেক বন্ধুত্বপূর্ণ হলো। ফলে সাম্প্রদায়িকতা কমে গেলো। এমন কি, রাজনীতিতেও এই মনোভাবের প্রতিফলন ঘটলো। যেমন, ১৯৫৫ সালের অক্টোবরে 'আওয়ামী মুসলিম লীগে'র নাম থেকে 'মুসলিম' কথাটা বাদ দিলো। অসাম্প্রদায়িক দল 'গণতন্ত্রী দল' আগেই গঠিত হয়েছিলো। ওদিকে, পূর্ব পাকিস্তান কংগ্রেস দল যখন আস্তে আস্তে লোপ

সে সময়কার ছায়ানটের অনুষ্ঠান

পেতে আরম্ভ করলো, তখন হিন্দুরা আওয়ামী লীগের মতো অসাম্প্রদায়িক দলে যোগদান করলেন। কমিউনিস্ট দলেও যোগদান করলেন কেউ কেউ—যদিও এ দল তখন নিষিদ্ধ ছিলো। 'মুসলিম' কথাটা বাদ দেওয়ার ষোলো মাস পরে আওয়ামী লীগের সভাপতি ভাসানী কাগমারী সম্মেলন করেছিলেন। সে সম্মেলন রীতিমতো অসাম্প্রদায়িক চেহারা নিয়েছিলো। এতোই অসাম্প্রদায়িক ছিলো যে, সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের অনেকে ভারতের দালাল বলেও আখ্যা দিয়েছিলেন।

পঞ্চাশ-ষাটের রাজনীতি

কাগমারী সম্মেলনের কিছু দিন পরে আওয়ামী লীগ ত্যাগ করে ভাসানী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) গঠন করায়, পূর্ব পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক আন্দোলন খানিকটা দুর্বল হয়। তার ওপর, কেন্দ্রীয় সরকার থেকে সোহরাওয়ার্দী প্রধানমন্ত্রিত্ব হারিয়ে হতাশ হন। '৫৪ সালের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ফজলুল হক রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে উঠলেও, তিনিও এ সময়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে যান। মোট কথা, পূর্ব পাকিস্তানে এ সময়ে চলছিলো নেতৃত্বের সংকট। তার ওপর, ১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর পাকিস্তানে জারি হলো ফৌজী শাসন। গায়ের জোরে প্রেসিডেন্ট হলেন প্রথমে ইস্কেন্দার মীর্জা, তারপর আইয়ুব খান। সংবিধানও বাতিল হলো। আইয়ুব খান স্থায়ীভাবে ক্ষমতায় থাকার কৌশল ভাবতে থাকলেন।

পাকিস্তানের ঐক্যের প্রশ্নে ভাষা যে দারুণ গুরুত্বপূর্ণ এটা আইয়ুব অনুভব করলেন। সে জন্যে, ৩১শে ডিসেম্বর (১৯৫৮) তিনি পাকিস্তানের সব ভাষা রোম্যান হরফে লেখার প্রস্তাব দিলেন। প্রস্তাব দিলেন পাকিস্তানের জন্যে একটা অভিন্ন ভাষা 'গঠনে'র। বলাই বাহুল্য, এই হাস্যকর প্রস্তাব সরকারী মোশায়েব ছাড়া, কেউই গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেননি।

দেশে ফৌজী শাসন থাকলে তার ওপর সাধারণত একটা আন্তর্জাতিক চাপ থাকে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় চায় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। ওদিকে, গণতান্ত্রিক নির্বাচনে ফৌজী নেতার পক্ষে ক্ষমতায় আসা মুশকিল। সে জন্যে ১৯৬০ সালের জুন মাসে আইয়ুব এক অভিনব গণতন্ত্রের কথা বললেন। এর নাম 'বুনিয়াদী অথবা মৌলিক গণতন্ত্র'। আসলে, এক ধরনের নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র। তাঁর লক্ষ্য ছিলো : দেশে যাতে কোনো কালে সত্যিকারের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না-হয়। এর জন্যে তিনি ইসলামেরও দোহাই দেন। তিনি বলেন যে, মৌলিক গণতন্ত্রই সত্যিকারের ইসলামী গণতন্ত্র। এই মৌলিক গণতন্ত্রের ভিত্তিতে তিনি '৬২ সালের পয়লা মার্চ দেশকে এক নতুন

সংবিধান 'উপহার' দিলেন। এমন এক সংবিধান দিলেন যা দেশে ফৌজী একনায়কের শাসনকে স্থায়ী করবে। এই সংবিধান ঘোষণা করার আগেই তিনি সোহরাওয়ার্দী, শেখ মুজিবুর রহমান, আবুল মনসুর আহমেদ, *ইত্তেফাক* পত্রিকার সম্পাদক তফাজ্জল হোসেনকে গ্রেফতার করেছিলেন। এভাবে আওয়ামী লীগের মুখ বন্ধ করা হয়েছিলো। বস্তুত, আওয়ামী লীগ দীর্ঘদিনের জন্যে অকার্যকর হয়ে পড়ে এর পর। অন্যদিকে ফজলুল হকও তখন মুমূর্ষু। এপ্রিল মাসে তিনি মারা যান। আর, পরের বছর ডিসেম্বর মাসে বৈরুতে মারা যান সোহরাওয়ার্দী।

এই নেতৃত্ব সংকটের সময়ে বাকি ছিলেন কেবল তরুণ নেতারা। সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পরে এঁদের মধ্য থেকে শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগের প্রধান নেতা নির্বাচিত হন। তাঁর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের পুনর্জাগরণ ঘটে '৬৪ সালের গোড়া থেকেই। তিনি এবং তাঁর মতো তরুণরা চল্লিশের দশকে পাকিস্তান আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতার পরে তাঁদের রাজনৈতিক চিন্তাধারায় পরিবর্তন এসেছিলো। ধর্মের ভিত্তিতে অখণ্ড পাকিস্তানে তাঁরা আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলেন। পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবি করেন তাঁরা। এমন কি, স্বায়ত্তশাসন না-পেলে স্বাধীন বাংলাদেশ গঠন করা যায় কিনা, তাও তাঁরা চিন্তা করতে শুরু করেন। অন্তত শেখ মুজিব যে তার আগে থেকেই স্বাধীন বাংলা গঠন করার সম্ভাবনা নিয়ে ভাবতে আরম্ভ করেছিলেন—সোহরাওয়ার্দীর অসম্পূর্ণ আত্মজীবনী থেকে তা জানা যায়। সোহরাওয়ার্দী মারা যান '৬৩ সালের ডিসেম্বরে। তার অর্থ মুজিব তার বেশ আগে থেকেই এটা ভাবছিলেন।

নেতৃত্বের সংকট সৃষ্টি হলেও, সাধারণ মানুষের মধ্যে বাঙালি চেতনা ফৌজী শাসনের সময়ে প্রবল হচ্ছিলো। এমন কি, স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কেও তাঁরা আরও সচেতন হচ্ছিলেন। এর মধ্যে এমন একাধিক ঘটনা ঘটে, যা বাঙালি জাতীয়তাবাদী ধারণাকে জোরালো করে। যেমন, ১৯৬১ সালে রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী। বাঙালিরা এ উৎসব করতে চেয়েছিলেন বাংলা ভাষার প্রতি তাঁদের ভালোবাসার কারণে। কিন্তু সরকার এতে আপত্তি করে। নানাভাবে বাধা দেয়। যেমনটা করেছিলো ভাষা আন্দোলনের সময়ে। সরকারী পত্রিকায়, বিশেষ করে *আজাদে*—এ সময়ে নিয়মিত রবীন্দ্রবিরোধী প্রচার চালানো হয়েছে। (মুরশিদ, ১৯৯৩)

তা সত্ত্বেও সরকারী বাধা-নিষেধের মুখে বাঙালিরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ উৎসব পালন করেন। পালন করেন দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে। কেবল ঢাকা অথবা বড়ো শহরে নয়, মফস্বলেও বহু জায়গায় এ উৎসব পালিত হয়েছিলো। রবীন্দ্রনাথ ততোদিনে 'হিন্দু কবি' নন, তাঁদের নিজেদের—'বাঙালি কবি'তে পরিণত হয়েছিলেন। বস্তুত, দুই বাংলার মধ্যে ভাষাভিত্তিক ভ্রাতৃত্ব বোধ সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালিয়ানা এবং অসাম্প্রদায়িকতার জোয়ার এসেছিলো।

রবীন্দ্রনাথ। যিনি বাঙালিয়ানার প্রতীকে পরিণত হয়েছিলেন। এবং কাজ করেছিলেন হিন্দু ও মুসলমানের সেতু হিশেবে

এর দু বছর পরে 'ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ' পালন করেছিলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ। এ উপলক্ষেও সাধারণ মানুষের মধ্যে অভূতপূর্ব উৎসাহ লক্ষ করা যায়। এ থেকে বোঝা যায়, বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে দিন-দিন তাঁদের ভালোবাসা কতো বৃদ্ধি পাচ্ছিলো।

সাধারণ মানুষ কতোটা অসাম্প্রদায়িক 'বাঙালি' হয়ে উঠছিলেন, '৬৪ সালেও জানুয়ারিতেও তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এর ঠিক আগে কাশ্মীরের একটি মসজিদ থেকে হজরত মোহাম্মদের চুল চুরি গিয়েছিলো বলে গুজব ওঠে। তাই নিয়ে উত্তর ভারতের কোনো কোনো জায়গায় হিন্দু-মুসলমান দাঙা শুরু হয়। এই দাঙার প্রতিফলন পশ্চিম পাকিস্তানে দেখা যায়নি। কিন্তু সরকারের উস্কানি এবং আশ্রয়ে পূর্ব পাকিস্তানে দাঙা শুরু হয়েছিলো। ১৯৫০ সালের পর এ রকমের ভয়ানক দাঙা আর হয়নি। সত্যিকার অর্থে এ দাঙা ছিলো তার চেয়েও ব্যাপক। কিন্তু ইতিবাচক যা দেখা গেলো, সে হলো : মুসলমানরাই এর প্রবল প্রতিবাদ করেন। শেখ মুজিব এবং ভাসানী এর বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন জানান। ছাত্রনেতারা এর নিন্দা করেন। ঢাকার প্রধান পত্রিকাগুলো এর বিরুদ্ধে প্রচার চালায়। সাতজন সম্পাদক সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পক্ষে যুক্ত বিবৃতি দেন। দাঙা-বিরোধী একটি সর্বদলীয় কমিটিও গঠিত হয়। এর পক্ষ থেকে ১৬ই জানুয়ারি প্রচার করা হয় "পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও" নামে একটি ইশতেহার। দাঙার সময় বুদ্ধিজীবী এবং ছাত্ররা মিলে ঢাকায় এক বিশাল শান্তি মিছিল বের করেন। আমীর হোসেন চৌধুরী

হিন্দুদের রক্ষা করতে গিয়ে দিয়েছিলেন নিজের প্রাণ। কয়েকজন রাজনৈতিক নেতাও এর প্রতিবাদ করতে গিয়ে গ্রেফতার বরণ করেন। (কবির, ১৯৯৪)

আইয়ুব খান শক্ত হাতে ক্ষমতা আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করলেও, বছরের পর বছর ফৌজী শাসনের অধীনে থাকতে থাকতে পাকিস্তানের দুই অংশের জনগণই হাঁপিয়ে উঠেছিলেন। পাঁচটি বিরোধী দল মিলে তাই '৬৪ সালের জুলাই মাসে একটি জোট গঠন করলো। তবে এদের কার্যকলাপ খুব একটা কার্যকর হয়নি। তাই বছরের শেষে যখন আইয়ুব খান মৌলিক গণতন্ত্রের ভিত্তিতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন দিলেন, তার ফলাফল আইয়ুবের পক্ষেই যায়। মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ্র বোন ফাতেমা জিন্নাহ বিরোধী দলের পক্ষে নির্বাচন করে হেরে যান—যদিও তাঁর পক্ষে বিপুল সাড়া দিয়েছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ। নিজের নড়বড়ে অবস্থান পাকাপোক্ত করার জন্যে ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে যে-যুদ্ধ লাগিয়েছিলেন আইয়ুব, তার ফলে হিতে বিপরীত হয়েছিলো। বস্তুত তা সরাসরি তাঁরই বিরুদ্ধে গিয়েছিলো। তিনি দেখিয়েছিলেন যে, কাশ্মীরের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আদায়ের জন্যেই তিনি যুদ্ধ করছেন। কিন্তু এ যুদ্ধে যেমন পাকিস্তান সুবিধে করতে পারেনি, তেমনি জনগণও এই যুদ্ধের সমালোচনা করেছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন যে, তাঁর নিজের দেশেই যখন গণতন্ত্র নেই, তখন কাশ্মীরের গণতান্ত্রিক অধিকার নিয়ে তাঁর যুদ্ধ করা তাঁর পক্ষে ভণ্ডামি ছাড়া আর কিছু নয়।

ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের লোকেরা বিশেষ করে হতাশ হয়েছিলেন। কারণ, ভারতের সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে রক্ষা করার মতো কিছুই ছিলো না পূর্ব পাকিস্তানের। ভারত অবশ্য পূর্ব পাকিস্তানের ওপর কোনো আক্রমণই চালায়নি। পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারাও অনেকে এই যুদ্ধ এবং তারপর তাশখন্দ চুক্তির সমালোচনা করেছিলেন। এ সময়ে পাঞ্জাবের বিরোধী দলীয় নেতারা বাঙালিদের নিয়ে একটা জোট গঠন করার কথা ভাবছিলেন। ওদিকে, এই যুদ্ধের পরে পূর্ববাংলা এবং পশ্চিম বাংলার মধ্যে যোগাযোগ পাকিস্তান সরকার আরও কমিয়ে দেয়। এমন কি, বইপত্র আনানোও নিষিদ্ধ হয়। এর দরুন পরবর্তী কয়েক বছরে বঙ্গদেশের দুই অংশের মধ্যে আকর্ষণ আগের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছিলো। হ্রাস পেয়েছিলো হিন্দুদের প্রতি মুসলমানদের অবিশ্বাস এবং বিদ্বেষও। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের কাছে হিন্দুদের থেকে বরং শত্রু হয়ে দাঁড়ালো পশ্চিম পাকিস্তান।

এই পরিবেশে '৬৬ সালের জানুয়ারিতে আইয়ুব আসেন ঢাকায়। তিনি বিরোধী নেতাদের সঙ্গে আলাপ করতে চান। এ আলোচনায় পেশ করার জন্যে শেখ মুজিব একটি দাবিনামা রচনা করান। এটি লিখেছিলেন তাজউদ্দীন আহমদ। এসব দাবির মধ্যে সবচেয়ে প্রধান ছিলো পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবি। বলা যেতে পারে, এই

শেখ মুজিব : স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে যিনি স্বাধীনতার দাবিতে পরিণত করেন

দাবিনামা ছিলো ছ দফার খসড়া। কিন্তু আইয়ুবের সঙ্গে বৈঠকে কোনো লাভ হয়নি। শেখ মুজিব কোনো আপোশের জন্যে তৈরি ছিলেন না। আর পূর্ব পাকিস্তানের অন্য নেতারাও তাঁর প্রস্তাবের সঙ্গে একমত হতে পারেননি।

পরের মাসের ৫ তারিখে পাঞ্জাবী নেতাদের আহ্বানে শেখ মুজিব লাহোরে একটি সম্মেলনে যোগদান করেন। কিন্তু সেখানে তিনি চাইলেও তাঁর ছয় দফা দাবি পেশ করতে পারেননি। কারণ, সম্মেলনের সভাপতি চৌধুরী মোহাম্মদ আলী তা পেশই করতে দেননি। ফলে মুজিব সম্মেলন ত্যাগ করেন। এবং তাঁর দাবিনামা বিবৃতি আকারে দেন সংবাদ মাধ্যমকে। ১৮ই মার্চ এই দাবিনামা আওয়ামী লীগের কাউন্সিলে পেশ করা হয়। অনুমোদিত হওয়ার পর ২৩শে মার্চ *আমাদের বাঁচার দাবি—ছয় দফা কর্মসূচি* নামে এই দাবিনামা পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করা হয়। এতে কেবল আইয়ুব নন, বিরোধী নেতারাও ক্ষুব্ধ হন। আইয়ুব হুমকি দিয়ে বলেন যে, ছয় দফা নিয়ে চাপাচাপি করলে, অস্ত্রের ভাষায় তার উত্তর দেওয়া হবে। তবে পশ্চিম পাকিস্তানী নেতারা এটা অনুভব করেন যে, এ ছিলো বাঙালিদের প্রাণের দাবি। (কামাল হোসেন, ২০০৬)

এই ছয়টি দফা রচনা করতে গিয়ে মুজিব বাঙালি অর্থনীতিবিদ এবং রাজনীতিকদের পরামর্শ নিয়েছিলেন। তাঁর ছয়টি দাবির প্রথম দফা ছিলো : লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে একটি পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা। সংসদীয় পদ্ধতিতে। দ্বিতীয় দফা হলো : কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকবে কেবল প্রতিরক্ষা এবং পররাষ্ট্র। তৃতীয় দফা : প্রদেশগুলোর নিজস্ব মুদ্রা থাকবে। চতুর্থ দফা : কর আরোপ এবং রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা থাকবে প্রদেশগুলোর। পঞ্চম দফা : দেশের দুই

অংশের বৈদেশিক আয়ের দুটি আলাদা হিসাব থাকবে। ষষ্ঠ দফা : পূর্ব পাকিস্তানের নিজস্ব আধাসামরিক বা আঞ্চলিক সামরিক বাহিনী থাকবে।

এ কথায় বলা যায় : পূর্ব পাকিস্তানের থাকবে পুরো স্বায়ত্তশাসন। তা ছাড়া, পার্লামেন্টে লোকসংখ্যা অনুযায়ী পূর্ব পাকিস্তানের জন্যে বেশি আসন থাকার দাবিও ছিলো এর মধ্যে। পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারা এই দাবি মেনে নিতে পারেননি। কারণ, মেনে নিলে তাঁরা আর পূর্ব পাকিস্তানকে নিজেদের কলোনি অথবা উপনিবেশ হিশেবে ব্যবহার করতে পারবেন না। তবে ছয় দফার দাবি আসলে একেবারে নতুন ছিলো না। একুশ দফার মধ্যেও এ দাবির অনেকখানি ছিলো।

এই দাবির মুখে আইয়ুব খুবই বিচলিত হন। এবং ৮ই মে মুজিব ও তাজউদ্দীন-সহ আওয়ামী নেতাদের গ্রেফতার করেন। তবে তাঁদের গ্রেফতার করে স্বায়ত্তশাসনের জনপ্রিয় দাবিকে ধামা চাপা দেওয়া গেলো না। ধীরে ধীরে ছ দফা আন্দোলন জোরদার হতে থাকে। ৭ই জুন নেতাদের মুক্তির দাবিতে সাধারণ ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়। এতে অন্তত ১০ জন নিহত এবং বহু লোক আহত হন। তা সত্ত্বেও নেতাদের মুক্তি দেওয়া হয়নি। বরং ১২ই জুন গ্রেফতার করা হয় তফাজ্জল হোসেনকে। আর এসব গ্রেফতারকে অগস্ট মাসে হাই কোর্ট বৈধ বলে ঘোষণা করে। কেবল তাই নয়, একের পর এক মামলা দিয়ে শেখ মুজিবকে হয়রানি করা হতে থাকে। যেমন, '৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে তাঁকে ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মুক্তি দিয়ে আবার সেখানেই আটক করে সেনানিবাসে নিয়ে যাওয়া হয়। এবারে তাঁর বিরুদ্ধে আনা হয় 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' নামে দেশদ্রোহিতার মামলা। মামলার অন্য আসামীরা ছিলেন উর্ধ্বতন কয়েকজন বাঙালি সিভিল সার্ভেন্ট এবং সামরিক সদস্য। জুন মাসে শুরু হয় এর শুনানি।

মোট কথা, '৬৮ সাল নাগাদ এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ছাড়া বাঙালিরা সন্তুষ্ট হবেন না। এমন কি, অনেকে যে স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নও দেখছিলেন, তা বোঝা যায় মওলানা ভাসানীর হুঁশিয়ারি থেকে। তিনি ২৪শে ফেব্রুয়ারি 'স্বাধীন বাংলার আন্দোলনে'র বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন। (হাবিবুর, ২০০৮)

ওদিকে, ১৯৬৮ সালের প্রথম দিকে আইয়ুব খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তা সত্ত্বেও তিনি ঘটা করে পালন করলেন উন্নয়নের এক দশক। ওদিকে, তাঁর বিরুদ্ধে কেবল পূর্ব পাকিস্তানে নয়, পশ্চিম পাকিস্তানেও অসন্তোষ দানা বাঁধছিলো। এ সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান নেতারা কারারুদ্ধ থাকলেও তাঁদের জায়গা নেন ছাত্র সমাজ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা তোফায়েল আহমেদের নেতৃত্বে 'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করেন। (কামাল হোসেন, ২০০৬)

আন্দোলনের এ পর্যায়ে '৬৯-এর জানুয়ারি মাসে নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে নিহত হন ছাত্রনেতা আসাদ। এই ঘটনার প্রতিবাদে ছাত্র বিক্ষোভ প্রবল হয়ে

ঊনসত্তরের গণ-আন্দোলন

ওঠে। ২৩শে জানুয়ারি রাতের বেলায় ছাত্রদের মশাল মিছিলে জনতাও যোগ দেয়। তারপরের দিনের ধর্মঘটে যোগ দেন ডেমরা, তেজগাঁও, টঙ্গী এবং অন্যান্য শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকরা। এদিন পুলিশের গুলিতে কম পক্ষে চারজন নিহত হন। ময়মনসিংহ এবং চট্টগ্রামেও কয়েকজন হতাহত হন। এর পরও ধর্মঘট চলে, কার্ফিউ জারি হয়। এমনি করে আন্দোলনে জোয়ার আসে। ১৫ই ফেব্রুয়ারি আটক অবস্থায় নিহত হন আগরতলা মামলার আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হক। তিন দিন পরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. শামসুজ্জোহা নিহত হন সৈন্যদের গুলিতে। সব মিলে এই আন্দোলন গণ-অভ্যুত্থানে পরিণত হয়। (উমর, ২০০৬)

ফেব্রুয়ারি মাসে পশ্চিম পাকিস্তানেও ধর্মঘট হয়। কারণ, ভুট্টো এবং পাঞ্জাবী নেতারা ক্ষমতা লাভের জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। এমন কি, পাকিস্তানের সেনাপতিরাও আইয়ুবের পেছন থেকে সরে গিয়ে নিজেরাই চান ক্ষমতা গ্রহণ করতে। এই অবস্থায় বিরোধী দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করার জন্যে ১৭ই ফেব্রুয়ারি আইয়ুব একটি গোল টেবিল বৈঠক ডাকেন। কিন্তু মুজিবের অনুপস্থিতিতে এই বৈঠক অর্থহীন হবে—এ কথা বিবেচনা করে তিনি আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করেন। ফলে ২১শে ফেব্রুয়ারি রাতের বেলায় মুজিব মুক্তি পেলেন। (কামাল হোসেন, ২০০৬)

আগে থেকেই তিনি বাঙালিদের একচ্ছত্র নেতায় পরিণত হয়েছিলেন। আগরতলা মামলা তাঁকে আরও জনপ্রিয়তা দিয়েছিলো। তাঁর মুক্তির পর ছাত্র লীগের তরফ থেকে তাঁকে গণ-সংবর্ধনা দেওয়া হয় রেসকোর্স ময়দানে। এতে যোগ দিয়েছিলেন, অনেকের মতে, লাখ লাখ লোক। সভা শেষে তোফায়েল আহমেদ তাঁকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করেন। (উমর, ২০০৬) সেই থেকে তিনি 'বঙ্গবন্ধু' নামেই পরিচিত হন।

মার্চের প্রথম দিকে বিরোধী দলীয় নেতারা আবার বৈঠকে মিলিত হওয়ার আহ্বান জানালেন। এতে অংশ গ্রহণের জন্যে মুজিব লাহোরে যান ৬ই মার্চ। কিন্তু সেখানে লক্ষ করেন যে, বিরোধী দলীয় জোট—ডাক—ছ দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্ত-শাসন নিয়ে আলোচনা করতে রাজি নয়। তাই তিনি আলোচনায় যোগ দিলেন না। নেতাদের মধ্যে নানা রকমের গোপন সমঝোতার পর ৯ই মার্চ তিনি রাওয়ালপিণ্ডি যান। সেখানে পৌঁছেও কোনো আপোশ করতে তিনি তৈরি ছিলেন না। ১২ই মার্চ সেনাবাহিনীর প্রধান ইয়াহিয়া খানের সঙ্গেও তাঁর বৈঠক হয়। পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের কঠোর মনোভাবের কারণে 'ডাকে'র বৈঠক ব্যর্থ হয় ১৩ই মার্চ। শেখ মুজিব তখন আইয়ুবের প্রস্তাব এবং বিরোধী দলীয় মোর্চা উভয়ই প্রত্যাখ্যান করে ফিরে আসেন ঢাকায়। (কামাল হোসেন, ২০০৬)

ওদিকে, ফৌজী বাহিনী চাইছিলো নিজেরাই ক্ষমতা দখল করতে। রাজনৈতিক এবং ফৌজী বাহিনীর চাপে ২৫শে মার্চ আইয়ুব ক্ষমতা ছেড়ে দিলেন। পাকিস্তানের নতুন এবং চতুর্থ ফৌজী-প্রেসিডেন্ট হলেন ইয়াহিয়া খান। তাঁর ফৌজী বাহিনীর দীর্ঘকাল ক্ষমতা ধরে রাখার বাসনা ছিলো কিনা, জানা যায় না। কিন্তু বাস্তবে সেটা সম্ভব হয়নি। কারণ গণ-প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা ছেড়ে দেবার দাবি উঠেছিলো পূর্ব এবং পশ্চিম—উভয়ের কাছ থেকে। এই নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে তিনি নভেম্বর মাসে গণপরিষদ গঠনের রূপরেখা প্রকাশ করলেন। এতে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট ভেঙে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। আর, মেনে নেন পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান দাবি—'এক ব্যক্তি, এক ভোট'। অর্থাৎ তিনি লোকসংখ্যার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানকে অর্ধেকের বেশি আসন ছেড়ে দিলেন। কিন্তু শর্ত দিলেন
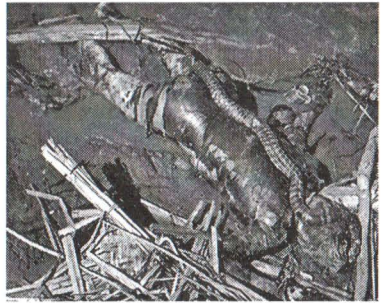
১৯৭০-এর সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস। যাতে কমপক্ষে ৫০ হাজার লোক নিহত হয়েছিলেন। এই দুর্যোগের প্রতি পাকিস্তান সরকারের অনীহা ডিসেম্বরের নির্বাচনকে প্রভাবিত করেছিলো

যে, গণপরিষদ যে-সংবিধান পাশ করবে, তার ওপর তিনি ভিটো দিতে পারবেন। তিনি আরও জানালেন যে, নির্বাচন-বিধি এবং ভোটার তালিকা তৈরির পর '৭০ সালের অক্টোবর মাসে নির্বাচন হবে। কিন্তু ভিটো দেওয়ার শর্ত শেখ মুজিব সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেন। যা-ই হোক, শেষ পর্যন্ত 'এক ব্যক্তি, এক ভোট'—এই ভিত্তিতে নির্বাচন হলো ৭ই ডিসেম্বর। (কামাল হোসেন, ২০০৬)

ইয়াহিয়া খান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারা আশা করেছিলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানকে বেশি আসন দিলেও, আসনগুলো বিভিন্ন দল ভাগাভাগি করে পাবে। এই সদস্যদের একটা অংশ হয়তো পশ্চিম পাকিস্তানকে সমর্থনও জানাবেন। তা ছাড়া, ক্ষমতার লোভ দেখিয়ে তাঁদের 'কিনে নেওয়া'ও সম্ভব হবে। ফলে বহাল থাকবে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসন। কিন্তু ইয়াহিয়া অথবা ভুট্টোর হিশেব ঠিক ছিলো না। নভেম্বর মাসে যে-প্রলয়ঙ্করী ঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস হয়, তাও এতে একটা বড়ো ভূমিকা পালন করলো। এই দুর্যোগের ফলে কম পক্ষে ৫০,০০০ লোক নিহত হন। নিহত হয় অসংখ্য গবাদি পশু। ধ্বংস হয় প্রায়-পাকা ধান। লাখ লাখ পরিবার নিঃস্ব হয়ে যায়। সমস্ত পৃথিবীর দৃষ্টি এবং সহানুভূতি আকর্ষণ করেছিলো এই দুর্যোগ। কিন্তু ইয়াহিয়া অথবা পশ্চিম পাকিস্তানের নেতাদের নয়। ক্ষতিগ্রস্তদের সামান্যই সাহায্য দেয় কেন্দ্রীয় সরকার। এতে আরও একবার পূর্ব পাকিস্তানের লোকেরা অনুভব করেন, তাঁদের প্রতি কেন্দ্রের মনোভাব কেমন।

স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা

শেখ মুজিবের জনপ্রিয়তা বাড়ছিলো ১৯৬৬ সাল থেকেই। বাঙালিদের কাছে তিনি সবচেয়ে বড়ো নেতা বলে গৃহীত হয়েছিলেন। কারণ, তাঁরা জানতেন যে, তিনিই পারবেন তাঁদের স্বপ্ন পূরণ করতে। তাঁর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ বাঙালিদের স্বার্থ-রক্ষাকারী দল বলে পরিচিত হয়। ইসলামের নাম ভাঙিয়ে মুসলিম লীগ-সহ কয়েকটি দল 'ইসলাম-পছন্দ' জোট গঠন করেছিলো। কিন্তু তাতে বিশেষ কোনো ফল হয়নি। আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টিতে (৭টি মহিলা আসন-সহ) জয়ী হলো। পাকিস্তানের গণ-পরিষদে মোট আসন ছিলো ৩১৩টি। ফলে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্থাৎ মেজরিটি পেলো। অতঃপর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কথা শেখ মুজিবেরই।

ভুট্টোর দল পশ্চিম পাকিস্তানে জয়ী হয়েছিলো ৮৮টি আসনে (৫টি মহিলা আসন-সহ)। ভুট্টো ছিলেন অসম্ভব ক্ষমতালোভী। সেই ক্ষমতা হারাচ্ছেন দেখে তিনি সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করলেন যে, সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়েই সংবিধান রচনা করা যাবে না। তার পেছনে দেশের দুই অংশেরই সমর্থন থাকতে হবে। আর, সেনাবাহিনীও চাইছিলো না যে, ক্ষমতা চলে যাক পূর্ব পাকিস্তানের কোনো নেতার হাতে। এমন কি, ইয়াহিয়া নিজেও প্রেসিডেন্ট থাকার স্বপ্ন দেখছিলেন। তাই ভুট্টো ও পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য নেতা এবং সেনাপতিদের কথায় তিনি ঠিক করলেন যে, সঙ্গে সঙ্গে পার্লামেন্ট ডাকবেন না। হাতে খানিকটা সময় নিয়ে আওয়ামী লীগের সঙ্গে তিনি সমঝোতায় আসতে চেষ্টা করলেন। ভুট্টো এবং সেনাপতিদের সঙ্গেও।

ইতিমধ্যে ৩রা জানুয়ারি রেসকোর্সে এক বিরাট সমাবেশে আওয়ামী লীগের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা শপথ নেন। শপথ নেন ছয় দফা বাস্তবায়নের জন্যে। পরের দিন শেখ মুজিব ঘোষণা করেন যে, ছ দফা জনগণের রায়। ইচ্ছে করলেও

নির্বাচিত প্রতিনিধিরা এ রায় বদল করতে পারেন না। ইয়াহিয়া এর পর সমঝোতার জন্যে ঢাকায় আসেন। ১২ই জানুয়ারি মিলিত হন মুজিবের সঙ্গে। আবার নতুন করে ছ দফার ব্যাখ্যা চান তিনি। এমন কি, শেখ মুজিব ভাবী প্রধানমন্ত্রী—তিনি প্রকাশ্যে তাও বলেন। ওদিকে, পরের দিন ভুট্টো ঘোষণা করেন যে, বোঝাপড়ার ভিত্তিতে সংবিধান রচনা করতে হবে, সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়ে নয়।

মুজিবের সঙ্গে সমঝোতা না-করেই ঢাকা থেকে ফিরে যান ইয়াহিয়া। প্রধান সেনাপতিকে নিয়ে অতঃপর তিনি 'শিকার' করার নাম করে যান ভুট্টোর বাড়ি লারকানায়। আসলে, এখানেই ভুট্টো এবং সেনাপতির সঙ্গে তিনি প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের প্রাধান্য তাঁরা মেনে নেবেন না। পূর্ব পাকিস্তানে ফৌজী বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধির সিদ্ধান্তও নেওয়া হয় এখানে। 'বীর উত্তম' রফিকুল ইসলাম হিশেব করে দেখিয়েছেন এর সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হয়। তা না-হলে মার্চের শুরুতেই ঢাকায় পাকিস্তানী সৈন্যরা আসতে পারতো না। (রফিকুল ইসলাম, ১৯৮৬) পাকিস্তানী ফৌজী কর্মকর্তা সিদ্দিক সালিক লিখেছেন পূর্ব পাকিস্তানে সৈন্য আসতে শুরু করে ২৭শে ফেব্রুয়ারি। (সালিক, ১৯৭৮) সে যাই হোক, ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও ২৭শে জানুয়ারি ভুট্টো এলেন মুজিবের সঙ্গে দেখা করতে। তিনি এসেছিলেন আপাতদৃষ্টিতে আপোশের মনোভাব দেখানোর জন্যে। তবে আপোশ করার মনোভাব প্রকৃত পক্ষে তাঁর ছিলো না। তাই আলোচনায় তাঁদের দারুণ ভিন্নমত প্রকাশ পেলো।

ভুট্টো ফিরে যান ৩০শে জানুয়ারি। সেদিনই দুই পাকিস্তানী যুবক ভারতের একটি যাত্রীবাহী বিমান ছিনতাই করে লাহোরে নিয়ে যায়। বিমানটি তারা পুড়িয়ে দেয় সেখানে। এই যুবকদের মালা দিয়ে বরণ করেন ভুট্টো। রাজপথে মিছিলও করেন তাদের নিয়ে। কিন্তু শেখ মুজিব এর তীব্র নিন্দা জানান। পশ্চিম পাকিস্তানীরা এটাকে আওয়ামী লীগের ভারত-প্রীতি বলে মনে করেন। ওদিকে, এর পর ভারত তার এলাকার ওপর দিয়ে পাকিস্তানী বিমান চলাচল বন্ধ করে দেয়। স্বাধীনতাযুদ্ধের পরে পাকিস্তানী জেনারেলরা যেসব বই লিখেছেন, তাতে একে ভারতের ষড়যন্ত্র বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। তাঁরা লেখেন যে, পাকিস্তান যাতে পূর্ব পাকিস্তান সৈন্য পাঠাতে না-পারে, ভারত তার জন্যেই নিজের নাগরিকদের দিয়ে বিমান ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটায়। (নিয়াজী, ২০০৮; সালিক, ১৯৮৮)

এর পর ইয়াহিয়া-সহ পশ্চিম পাকিস্তানী নেতারা ছুতো খুঁজতে থাকেন পূর্ব পাকিস্তানের দাবি না-মানার। আসল ইচ্ছা গোপন রেখে ১৩ই ফেব্রুয়ারি ইয়াহিয়া ঘোষণা করেন যে, ৩রা মার্চ ঢাকায় গণপরিষদের বৈঠক বসবে। আবার একই দিনে ভুট্টো ঘোষণা করেন যে, তাঁর দলকে আওয়ামী লীগ খানিকটা ছাড় না-দিলে তিনি গণপরিষদে যোগ দেবেন না। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা দেওয়ার তাঁর যে সত্যি সত্যি ইচ্ছে নেই, এর প্রমাণ দিয়ে ২১শে ফেব্রুয়ারি ইয়াহিয়া তাঁর

বেসামরিক মন্ত্রিসভা ভেঙে দেন। পরের দিন ২২শে ফেব্রুয়ারি ইয়াকুব খান-সহ গভর্নরদের বৈঠকে ইয়াহিয়া সিদ্ধান্ত নেন যে, 'অস্ত্রের ভাষায়' পূর্ব পাকিস্তানকে তিনি বশে আনবেন। (নিয়াজি, ২০০৮) অন্যদিকে, মুজিব অব্যাহত রাখেন তাঁর আপোশহীন মনোভাব। এমন কি, দরকার হলে স্বাধীনতা ঘোষণার কথাও ভাবেন। বস্তুত, ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি তিনি তাজউদ্দীন এবং কামাল হোসেনকে দিয়ে স্বাধীনতা-ঘোষণার একটি খসড়া লিখিয়ে নেন। (কামাল হোসেনের সাক্ষাৎকার, ১৮. ৯. ২০০৯) সাধারণ মানুষের মধ্যেও ঢাকায়ও এ সময়ে ছ দফার বদলে স্বাধীন বাংলা গড়ে তোলার দাবি জোরদার হতে থাকে।

এই পরিবেশে, পয়লা মার্চ ভুট্টো ঘোষণা করেন যে, তাঁর দলের উপস্থিতি ছাড়া গণপরিষদের অধিবেশন হলে, তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে প্রবল গণ-আন্দোলন গড়ে তুলবেন। আর, ইয়াহিয়া ঘোষণা করেন যে, রাজনৈতিক সংকটের দরুন তেসরা মার্চ পার্লামেন্টের অধিবেশন বসবে না। কিন্তু তিনি তেসরা মার্চের বদলে কোনো নতুন তারিখও ঘোষণা করলেন না। ইয়াহিয়ার ঘোষণার কথা এক দিন আগেই মুজিবকে জানিয়েছিলেন গভর্নর আহসান। তাতে মুজিব বলেছিলেন যে, অধিবেশনের একটা তারিখ না-দিলে জনগণকে তিনি ঠেকাতে পারবেন না। সত্যি সত্যি ইয়াহিয়া ঘোষণা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ দিনই (পয়লা মার্চ) জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিক্ষোভ মিছিল করলেন। কেবল ঢাকায় নয়, দেশের বিভিন্ন জায়গায়। কেবল ছাত্ররাও নন, বিক্ষোভ দেখান সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষ। বিভিন্ন পেশার লোকেরা। এমন কি, সরকারী কর্মকর্তারাও। জনতার মুখে স্লোগান : 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো'; 'জাগো জাগো, বাঙালি জাগো'; 'তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা মেঘনা যমুনা' ইত্যাদি। এদিন 'স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ'ও গঠিত হয়। পরে এই সংগ্রাম পরিষদ আন্দোলনে বড়ো একটা ভূমিকা রেখেছিলো।

শেখ মুজিব এদিন নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি বৈঠক করেন। তারপর ঘোষণা করেন যে, ২রা মার্চ ঢাকায় এবং ৩রা মার্চ সারা বাংলাদেশে হরতাল হবে। তারপর ৭ই মার্চ জনসভা হবে রেসকোর্সের মাঠে। এর পর থেকে পূর্ব পাকিস্তান চলতে শুরু করে মুজিবের আদেশে। কেবল আওয়ামী লীগের নয়, তিনি সবার নেতায় পরিণত হন ততোদিনে। তাঁর নেতৃত্বে দেশের জনগণ আন্দোলনে ফেটে পড়লেন। ২রা মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের সামনে ছাত্ররা স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা ওড়ালেন। এই পতাকার নকশা করেছিলেন শিবনারায়ণ দাশ। সবুজ পতাকা। মাঝখানে লাল সূর্যের ওপর সোনালি রঙে বাংলাদেশের মানচিত্র।

সরকার কার্ফিউ দিয়ে এদিনের বিক্ষোভ এবং আন্দোলন দমন করতে চেয়েছিলো। কিন্তু তাতে কোনো ফল হয়নি। কেবল বহু লোক সৈন্যদের গুলিতে

বাংলাদেশের প্রথম পতাকা

হতাহত হয়েছিলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে মুজিব পরের দিনকে জাতীয় শোক দিবস হিশেবে ঘোষণা করেন। সেদিন তিনি ঘোষণা করেন যে, যতোদিন সৈন্যদের গুলি চালানোর ঘটনার তদন্ত না-হয়, ততোদিন সকাল ছটা থেকে দুটো পর্যন্ত দেশের সর্বত্র হরতাল পালিত হবে। তিনি আরও ঘোষণা করেন যে, পরবর্তী কর্মসূচী তিনি ঘোষণা করবেন রেসকোর্সের ময়দানে, ৭ই মার্চের জনসভায়।

৩রা মার্চ এই বিক্ষোভ দানা বাঁধার কারণ, এ দিনই পার্লামেন্টের অধিবেশন আরম্ভ হওয়ার কথা ছিলো। সেদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা পাকিস্তানের পতাকা পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। আর, পল্টন ময়দানে ছাত্র লীগের সভায় নূরে আলম সিদ্দিকী উড়িয়েছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা। সেই সঙ্গে গাওয়া হয় জাতীয় সঙ্গীত—'আমার সোনার বাংলা ...।' এভাবে জনতাই বাংলাদেশের পতাকা এবং জাতীয় সঙ্গীত ঠিক করে দিয়েছিলেন। জাতীয় সংসদের জন্যে অপেক্ষা করেননি। এ সময়ে শেখ মুজিবের আদেশে 'জনতার সরকার' কাজ করতে আরম্ভ করে। এতে সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা পালন করেন ছাত্ররা।

অপর দিকে, ইয়াহিয়াও এদিন অলস বসে ছিলেন না। বরং তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার জন্যে আরও একটি পদক্ষেপ নেন। নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করার কথা বলেন তিনি। কিন্তু আসলে আলোচনা ছিলো অছিলা। পূর্ব পাকিস্তানে সৈন্য এবং অস্ত্রশস্ত্র আনার জন্যে তিনি সময় নিচ্ছিলেন মাত্র। ইয়াহিয়ার সৈন্যবাহিনীও এদিন ঢাকা এবং চট্টগ্রাম-সহ দেশের অনেক জায়গায় গুলি চালায়।

বহু লোক হতাহত হন এর ফলে। পাকিস্তানী ফৌজী কর্মকর্তার মতে, তেসরা মার্চ ঢাকা মেডিকেল কলেজেই ১৫৫ জনকে ভর্তি করা হয় এবং পরের দিন মারা যান আটজন। আর, ৭ই মার্চ সরকারী প্রেস নোটে ১৭২ জন নিহত এবং ৩৫৮ জন আহত হওয়ার কথা স্বীকার করা হয়েছে। (সালিক, ১৯৭৬)

ওদিকে, দেশ যে দু ভাগ হয়ে যাচ্ছে, ভুট্টো এবং ফৌজী জান্তা ছাড়া এটা সবাই অনুভব করছিলেন। চৌঠা মার্চ তাই পশ্চিম পাকিস্তানের একাধিক নেতা ভুট্টোর অযৌক্তিক দাবির সমালোচনা করেন। এদিনের আর-একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো : আন্দোলনে ঢাকা রেডিওর কর্মচারীদের যোগদান। 'রেডিও পাকিস্তান ঢাকা' এদিন থেকে 'ঢাকা বেতার কেন্দ্রে' পরিণত হলো। মোট কথা, সারা দেশে আন্দোলন এবং বিক্ষোভ দানা বাঁধতে থাকে। এর পরিপ্রেক্ষিতে, ৬ই মার্চ ইয়াহিয়া ঘোষণা করেন যে, ২৫শে মার্চ গণপরিষদের অধিবেশন বসবে। আওয়ামী লীগের ঊর্ধ্বতন নেতারা এদিন শেখ মুজিবের বাড়িতে মিলিত হন। পরের দিন সর্বোচ্চ নেতা মুজিব কী ঘোষণা দেবেন, তা নিয়ে তাঁরা আলোচনা করেন।

এতে যোগ দিয়েছিলেন তাজউদ্দীন, নজরুল ইসলাম, কামরুজ্জামান, কামাল হোসেন প্রমুখ। তাঁরা স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়ার সম্ভাব্য ফলাফল বিবেচনা করেন। তাঁরা ঠিক করেন যে, সরাসরি স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়া ঠিক হবে না। কারণ, তা হলে ইয়াহিয়াকে সেনাবাহিনী ব্যবহার করার একটা শস্তা সুযোগ দেওয়া হবে। আন্তর্জাতিক সমাজকেও ইয়াহিয়া বলতে পারবেন যে, পূর্ব পাকিস্তান একতরফা স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলো। প্রাজ্ঞ রাজনীতিক শেখ মুজিব এই সুযোগ দিতে রাজি ছিলেন না। অথচ একই সঙ্গে তিনি ছিলেন আপোশহীন নেতা। এমনভাবে তিনি বক্তব্য রাখার কথা বলেন, যাতে আপোশের পথ খোলা রাখা যায়, আবার স্বাধীনতার কথাও পরোক্ষভাবে বলা যায়। ভাষণের পর সংবাদ মাধ্যমকে দেওয়ার জন্যে একটি বিবৃতিও তিনি তৈরি করতে বলেন কামাল হোসেনকে। (কামাল হোসেন, ২০০৬)

তখন পূর্ণ স্বাধীনতার চেয়ে কম—এমন কিছুতেই রাজি ছিলো না ছাত্র- এবং যুব-সমাজ। তাঁরা আশা করলেন যে, পরের দিন তাঁদের প্রিয় নেতা সরাসরি স্বাধীনতার ঘোষণাই দেবেন। ইয়াহিয়া এবং পশ্চিম পাকিস্তানী নেতারাও সম্ভবত সেটাই আশঙ্কা করছিলেন। রাতের বেলা ইয়াহিয়া বেতার ভাষণে ফৌজী শক্তি ব্যবহারের হুমকি দিলেন। এমন কি, পাকিস্তানের মুরুব্বী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও এটাই অনুমান করেছিলো। সে জন্যে ৭ই মার্চ সকালে শেখ মুজিবের সঙ্গে দেখা করেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত, ফারল্যান্ড। তিনি তাঁকে হুঁশিয়ার করে বলেন যে, স্বাধীন বাংলাদেশের ঘোষণা দিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তা মেনে নেবে না।

অপরাহ্নে রেসকোর্স ময়দানে (এখনকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে) অনুষ্ঠিত হলো

ঐতিহাসিক সমাবেশ। সেখানে দূর-দূরান্ত থেকে বন্যার ধারার মতো লোক এলেন। এলেন লাখ লাখ মানুষ। এতো বড়ো সমাবেশ ঢাকায় এর আগে কখনো হয়নি। অনেকেই এলেন হাতে লাঠি অথবা বৈঠা নিয়ে। জনতার ছিলো রীতিমতো যুদ্ধংদেহী মনোভাব। তাঁরা স্বাধীনতার ঘোষণাই শুনতে এসেছিলেন। ওদিকে, ধারে-কাছের ভবনের ওপর মেশিনগান নিয়ে অবস্থান নিয়েছিলো সেনাবাহিনী। কামাল হোসেনের ভাষায়, স্বাধীনতার ঘোষণা দিলে, সেখানে জালিয়ানওয়ালাবাগের মতো কাণ্ড হতো। (কামাল হোসেনের সাক্ষাৎকার) ১৯১৯ সালে পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে সৈন্যরা বদ্ধ জায়গায় জনতার ওপর গুলি করেছিলো। তাতে ৩৭৯ জন নিহত এবং ১২০৮ জন আহত হয়েছিলেন। ৭ই মার্চ এ রকম গুলি চালালে নিহত হতেন হাজার হাজার বাঙালি।

শেখ মুজিব মাত্র উনিশ মিনিট বক্তৃতা দিয়েছিলেন। কিন্তু তারই মধ্যে তাঁর মূল বক্তব্য পেশ করেন। তিনি একই সঙ্গে আপোশের কথা বলেন, দাবিদাওয়া পেশ করেন এবং স্বাধীনতার ঘোষণাও দেন। তিনি চারটি দাবি জানান : এগুলো হলো :

১। সামরিক আইন প্রত্যাহার করতে হবে
২। জনগণের প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা দিতে হবে
৩। গোলাগুলি বন্ধ করে সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে
৪। বাঙালিদের হত্যা করার কারণ খুঁজে বের করার জন্যে বিচার বিভাগীয় তদন্ত করতে হবে

সেই সঙ্গে তিনি জনগণকে আহ্বান জানান ঘরে ঘরে দুর্গ তৈরি করতে। দরকার হলে যার যা কিছু আছে, তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে। তিনি গ্রেফতার হতে পারেন, নিহত হতে পারেন—এও তিনি আশঙ্কা করেছিলেন। তাই তিনি বলেন যে, তিনি আর নির্দেশ দিতে না-পারলে, এটাকেই জনগণ যেন তাঁর চূড়ান্ত নির্দেশ হিশেবে গণ্য করেন।

বক্তৃতা শেষ করেন, আসল কথাটি দিয়ে: 'সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি, তখন কেউই আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবে না। ... রক্ত যখন দিয়েছি, তখন আরও দেবো। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করবো ইনশা-আল্লাহ। **এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।** জয় বাংলা।'

এতো সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় দেশের সমস্ত মানুষের হৃদয় কোনো বাঙালি নেতা কোনোদিন কেড়ে নিতে পারেননি। অথবা এতো উদ্বুদ্ধ করতে পারেননি। এমন কি, বিশ্বের অন্য কোনো নেতাও পেরেছিলেন কিনা, জানিনে। এই বক্তৃতার জন্যে তিনি আসলে দেশবাসীকে তৈরি করেছিলেন পাঁচ বছর ধরে।

অনেকে বলেছেন যে, স্বাধীনতার কথা বললেও তখনো তাঁর মনে অখণ্ড পাকিস্তানের স্বপ্ন থেকে গিয়েছিলো। কেউ কেউ বলেন, তিনি বক্তৃতা শেষ করেন 'জিয়ে পাকিস্তান' বলেন। (হাবিবুর, ২০০৮) কিন্তু টেলিভিশন কেন্দ্রে তাঁর

শেখ মুজিবের ৭ই মার্চের ভাষণ। এই ভাষণেই তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন এবং দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন প্রতিরোধ এবং সংগ্রামের

৭ই মার্চে রেসকোর্স ময়দানে উপস্থিত জনতা

জুলফিকার আলী ভুট্টো

বক্তৃতার যে-ভিডিও রেকর্ড ছিলো, তার চুলচেরা বিশ্লেষণ করেও এই অপবাদের কোনো সমর্থন পাওয়া যায়নি। কেউ বলেছেন যে, তিনি তখনো আশা করেছেন যে, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হলে তিনি পূর্ববাংলার জনগণের জন্যে সুবিচার নিশ্চিত করতে পারবেন। কিন্তু গভীরভাবে বিবেচনা করলে, মনে হয়, পাকিস্তানের প্রতি তাঁর আর কোনো মোহ ছিলো না। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে থেকে বাঙালিরা সুবিচার পাবেন না।

তাঁর পাকিস্তানী সমালোচকরা অনেকেই বলেছেন যে, তাঁর আপোশহীন মনোভাবই পাকিস্তানের ধ্বংস ডেকে এনেছিলো। তিনি নিজেকে বাঙালির নেতা হিশেবেই গণ্য করেছেন। দেশের অর্থাৎ গোটা পাকিস্তানের নেতা হিশেবে ভাবতে পারেননি। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, নির্বাচনের প্রচারের জন্যে তিনি একবারও পশ্চিম পাকিস্তানে যাননি। (সালিক, ১৯৭৬) এই মন্তব্যের মধ্যে খানিকটা সত্য যে ছিলো না, তা নয়। তিনি অখণ্ড পাকিস্তান বহাল রাখার স্বপ্ন ত্যাগ করে স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের স্বপ্নই দেখেছিলেন।

সে যাই হোক, এর পর থেকে সরকারী অফিস-আদালত, ব্যাংক, সমুদ্রবন্দরের কাজ—সবই চলতে থাকে তাঁর হুকুম মতো। তিনি সরকারকে রাজস্ব দিতে নিষেধ করেছিলেন। চট্টগ্রাম বন্দরে জাহাজ থেকে সামরিক সরঞ্জাম খালাস না-করার আদেশ দিয়েছিলেন। তাঁর আদেশসমূহ বাঙালিরা কেমন নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন, তার একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়।

ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহ থেকে দশই মার্চের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর তিনবার বদল করা হয়। অ্যাডমিরাল আহসান ছিলেন ভদ্রলোক। তিনি ইয়াহিয়ার নির্দেশ বাস্তবায়নে অপারগতা জানান। এমন কি, জেনারেল ইয়াকুব খানও ইয়াহিয়ার আদেশ মেনে নিতে রাজি হননি। ফৌজী বাহিনীর লোক হলেও দুজনেরই বিবেক-বিবেচনা ছিলো। তাই পরিস্থিতি দেখে তাঁরা পদত্যাগ করেন। ইয়াকুব তাঁর পদত্যাগ পত্রে বলেন যে, তিনি বিবেকের তাড়নায় পদত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছেন। কারণ তাঁর পক্ষে 'পাকিস্তানী ভাইদের' (পূর্ব পাকিস্তানীদের) হত্যা করা সম্ভব ছিলো না। পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে যাওয়ার পর এ জন্যে তাঁর শাস্তি হয়েছিলো। (সালিক, ১৯৭৬) তারপর গভর্নর হন টিক্কা খান। নিষ্ঠুরতার জন্যে যাঁর পরিচয় ছিলো 'বেলুচিস্তানের কশাই' বলে। কিন্তু হাইকোর্টের প্রধান

বিচারপতি তাঁকে শপথ পড়াতে অস্বীকার করেন। শেখ মুজিব অসহযোগ করার আহ্বান দিয়েছিলেন। সর্বত্র সেই অসহযোগিতাই দেখা গেলো। অন্যদিকে, দেশের সব জায়গাতে সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে।

মওলানা ভাসানী এক বছর আগেও স্বাধীন বাংলাদেশের বিরোধিতা করেছেন। কিন্তু জনতার জোয়ার কোন দিকে বইছে, তিনি তা বুঝতে পারতেন। তাই ৯ই মার্চ পল্টন ময়দানে একটি বিরাট জনসভায় তিনি পাকিস্তানকে ভাগ করে দুটো স্বাধীন দেশ গঠন করার জন্যে ইয়াহিয়ার প্রতি আহ্বান জানান। আর, শেখ মুজিবকে তিনি আখ্যা দেন নিজের পুত্র হিশেবে। কিন্তু লক্ষ করার বিষয় হলো : এ দিনও তিনি 'বাংলাদেশ' কথাটি ব্যবহার করেননি।

ওদিকে, ১৪ই মার্চ করাচিতেও প্রায় একই কথা বলেন ভুট্টো। তিনিও কার্যত দেশ বিভক্ত করার প্রস্তাব দেন। জনসভায় তিনি বলেন যে, ইয়াহিয়া চাইলে দেশের দুই অংশে আলাদা করে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে ক্ষমতা দিতে পারেন। অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগকে, পশ্চিম পাকিস্তানে ভুট্টোর পিপলস পার্টিকে। কিন্তু পরের দিন পশ্চিম পাকিস্তানের অন্য নেতারা এর প্রতিবাদ করেন। তাঁরা বলেন যে, এক দেশে দুটি সংখ্যাগরিষ্ঠ দল থাকতে পারে না। পরের দিন ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আসেন শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনা করতে। একই সঙ্গে চলতে থাকে দুটি কাজ। একদিকে আলোচনা, অন্যদিকে ফৌজী বাহিনীর প্রস্তুতি। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে দুই ডিভিশন সৈন্য এবং অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আসার যে-কাজ আগের মাসেই শুরু হয়েছিলো, তা তখনও শেষ হয়নি। তার জন্যে আরও কিছু সময়ের প্রয়োজন ছিলো।

তবে, মনে হয় না যে, কেবল সময় কেনাটাই ইয়াহিয়ার উদ্দেশ্য ছিলো। আলোচনায় ফল হবে না জেনেও তিনি বোধ হয় শেষ চেষ্টা করতে এসেছিলেন। বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী হলে মুজিব তাঁকে প্রেসিডেন্ট হিশেবে রাখবেন কিনা, তা বোঝার জন্যে। পরের দিন (১৬ই মার্চ) ইয়াহিয়ার সঙ্গে শেখ মুজিব কোনো সহকারী ছাড়াই আলাপ করেন। তারপরের দিন তিনি ইয়াহিয়ার সঙ্গে আলোচনা করেন নিজের সহকারীদের নিয়ে। কিন্তু পাশাপাশি ফৌজী নেতারাও ঢাকায় মিলিত হয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন। ১৮ মার্চ তৈরি হয় বাঙালি দমন এবং নিধনের নীল নকশা—'অপারেশন সার্চ লাইট'। রাও ফরমান আলি তাঁর নিজের জবানিতে এমনভাবে লিখেছেন যে, সামরিক বাহিনী তখনও কোনো প্রস্তুতি নেয়নি। বরং এ প্রস্তুতি নেওয়া হয় ২০ তারিখের পরে। (ফরমান আলি, ১৯৯২) সে যাই হোক, ইয়াহিয়ার সঙ্গে ১৯ এবং ২০শে মার্চও মুজিব এবং তাঁর সহকারীদের আলোচনা চলে। তবে ততোদিনে শেখ মুজিব অনুভব করেছিলেন যে, আলোচনায় কোনো ফল হবে না। হতাশার সুরে সাংবাদিকদের তিনি বলেন যে, তাঁর তরফ থেকে আলোচনার দরজা সব সময়ে খোলা থাকবে, যদিও অনির্দিষ্ট কালের জন্যে

আলোচনা চলতে পারে না। (কামাল হোসেন, ২০০৬)

আলোচনায় একটা বিষয়ে অবশ্য সমঝোতা হয়েছিলো। সেটা কেন্দ্রের ক্ষমতা নিয়ে নয়, প্রদেশের ক্ষমতা নিয়ে। ইয়াহিয়ার সঙ্গে শেখ মুজিব মোটামুটি একমত হয়েছিলেন যে, আপাতত সংখ্যাগরিষ্ঠ দলগুলোর হাতে প্রদেশের ক্ষমতা দেওয়া হোক। মুজিব ভেবেছিলেন যে, প্রদেশের ক্ষমতা পেলে পূর্ব পাকিস্তানকে আগের তুলনায় শক্তিশালী করা যাবে। শেষ পর্যন্ত সশস্ত্র সংগ্রাম হলে তার জন্যেও পাওয়া যাবে প্রস্তুতি নেওয়ার সময়। ভুট্টোর সম্মতি-সাপেক্ষে ইয়াহিয়া এতে রাজি হয়েছিলেন। (কামাল হোসেন, ২০০৬)

২১শে মার্চ ভুট্টোও ঢাকায় আসেন তাঁর দলের অন্য নেতাদের নিয়ে। কিন্তু সরাসরি মুজিবের সঙ্গে আলোচনা করতে আসেননি তিনি। পরের দিন তিনি যখন ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে আলোচনা করতে যান, তখন সেখানে মুজিবের সঙ্গে দেখা হয় তাঁর। ইয়াহিয়ার কক্ষ থেকে বের হয়ে আসার পর ভুট্টোর সঙ্গে একান্তে আলোচনা করেন মুজিব। এই আলোচনায় ভুট্টোকে সহযোগিতা করার জন্যে অনুরোধ জানান তিনি। তিনি বলেন যে, বেসামরিক সরকারের হাতে ক্ষমতা দেওয়ার বিষয়টি তাঁর (ভুট্টোর) ওপর অনেকটাই নির্ভর করছে। (ভুট্টোর উদ্ধৃতি, কামাল হোসেন, ২০০৬) কিন্তু ভুট্টো আপোশ করতে রাজি ছিলেন না। তিনি তাঁর অবস্থানে অনড়ই থেকে যান। এই বৈঠকের পর ডিসেম্বর মাসের আগে শেখ মুজিবের সঙ্গে তাঁর আর দেখা হয়নি। ইয়াহিয়া এবং শেখ মুজিবের সহকারীদের মধ্যে পরের দুদিনও আলোচনা অব্যাহত থাকে। কিন্তু আলোচনায় তেমন অগ্রগতি হয়নি। আসলে এই পর্যায়ে সামরিক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্যেই সম্ভবত ইয়াহিয়া আরও সময় নিচ্ছিলেন।

ওদিকে, বাঙালিদের মনোভাব ততোদিনে আরও আপোশহীন হচ্ছিলো। ২৩শে মার্চ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে পালিত হয় 'প্রতিরোধ দিবস'। এই উপলক্ষে প্রতিটি পত্রিকায় বাংলাদেশের পতাকার ছবি ছাপা হয়। বাড়িতে বাড়িতে টানানো হয় বাংলাদেশের পতাকা। কেবল গভর্মেন্ট হাউস এবং সামরিক আইন প্রশাসকের দপ্তর—এই দুই জায়গায় পাকিস্তানের পতাকা ওড়ানো হয়। পাকিস্তানের পতাকা পোড়ানোও হয় অনেক জায়গায়। (সালিক, ১৯৭৬) সন্ধ্যায় জনতার মিছিল এসে শেখ মুজিবের বাসভবনে পতাকা উড়িয়ে দেয়। এমন কি, মুজিবের সহকারীরা এদিন আলোচনার জন্যে প্রেসিডেন্ট-ভবনে যান বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে। বেতার ও টেলিভিশনেও 'আমার সোনার বাংলা' গান বাজিয়ে শোনানো হয়। এক কথায়, বাঙালিরা আর আপোশের কথা ভাবছিলেন না। এই অবস্থায় শেখ মুজিব যদি ঘোষণাও করতেন যে, তিনি আপোশে পৌঁছেছেন, তা হলে জনগণ তা মেনে নিতেন কিনা, সন্দেহ আছে।

২৫শে মার্চ ইয়াহিয়ার সঙ্গে আলোচনা করার পর ভুট্টো ঘোষণা করেন যে,

তিনি আওয়ামী লীগের স্বায়ত্তশাসনের দাবির সঙ্গে একমত নন। কারণ, আওয়ামী লীগ যে-ধরনের স্বায়ত্তশাসন চাইছিলো, তা স্বাধীনতার কাছাকাছি। অপর পক্ষে, শেখ মুজিব বলেন যে, সাড়ে সাত কোটি বাঙালির দাবি অস্বীকার করা যাবে না। এমন কি, ফৌজী শক্তি দিয়ে দাবিয়ে রাখা যাবে না। পরিস্থিতি কোন দিকে যাচ্ছে এটা সবার কাছেই স্পষ্ট হয়ে দেখা দিচ্ছিলো। আসন্ন সামরিক অভিযানের আশঙ্কা করে মার্কিন রাষ্ট্রদূত এ দিনই ঢাকা ত্যাগ করেন। এমন কি, পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারাও এদিন ঢাকা ছাড়তে আরম্ভ করেন। কিন্তু বাঙালি নিধন না-দেখে ভুট্টো ফিরে যেতে চাননি। এ বিষয়ে নিয়াজী লিখেছেন,

> টিক্কার নিষ্ঠুরতা দেখার জন্য ভুট্টো ঢাকায় থেকে গেলেন। অচিরেই ভুট্টো দেখতে পেলেন ঢাকা জ্বলছে। তিনি জনগণের আর্ত চিৎকার, ট্যাংকের ঘড় ঘড় শব্দ, রকেট ও গোলাগুলির বিস্ফোরণ এবং মেশিনগানের ঠা-ঠা-ঠা আওয়াজ নিজের কানেই শুনতে পেলেন। সকালবেলায় টিক্কা, ফরমান এবং আরবারকে পিঠ চাপড়িয়ে ভুট্টো তাঁদের অভিনন্দন জানান। তিনি তাঁদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশ্বাস দেন। ভুট্টো তাঁর কথা রেখেছিলেন। (নিয়াজী, ২০০৮)

সন্তুষ্ট মনে পরের দিন সকালে ভুট্টো ফিরে যান করাচিতে। এ সম্পর্কে সালিক লিখেছেন যে, বিমানে ওঠার আগে ভুট্টো সেনাবাহিনীর কাজের প্রশংসা করেন। ব্রিগেডিয়ার আরবারকে বলেন, 'আল্লাহকে অশেষ ধন্যবাদ, পাকিস্তানকে রক্ষা করা গেছে।' (সালিক, ১৯৮৮)

ওদিকে, কাউকে কিছু না-জানিয়ে গোপনে ইয়াহিয়াও ঢাকা ছাড়েন ২৫শে মার্চ সন্ধ্যার পর। এই গোপনীয়তা রক্ষা করার জন্যে রীতিমতো নাটক সাজানো হয়েছিলো। ইয়াহিয়ার খালি গাড়ি পতাকা উড়িয়ে বিমানবন্দর থেকে ফিরে এসেছিলো অন্য এক ফৌজী কর্মকর্তাকে প্রেসিডেন্টের আসনে বসিয়ে। (সালিক, ১৯৭৬) সন্দেহ হয়, ইয়াহিয়ার পলায়নের খবর শেখ মুজিবও জানতেন কিনা।

তবে নানাজনের কাছ থেকেই তিনি শুনেছিলেন যে, ফৌজী হামলা হতে পারে। সন্ধ্যে ছটার দিকে পশ্চিম পাকিস্তানের নাম-করা সাংবাদিক মাজহার আলীকে (তারিক আলীর পিতা) নিয়ে রেহমান সোবহান তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। মাজহার আলী তাঁকে জানান যে, সেনাবাহিনী কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। (সোবহান, ১৯৯৪) রাত আটটায় ক্যান্টনমেন্ট থেকে একটি রিক্সা একটি চিরকুট নিয়ে এসেছিলো তাঁর বাসভবনে। তাতে লেখা ছিলো : 'আজ রাতে আপনার বাড়িতে হামলা হবে।' সুতরাং ফৌজী হামলার আশঙ্কা মুজিব মোটেই করেননি, তা নয়। কিন্তু ঠিক কবে, কখন এ হামলা হবে, সে বিষয়ে ধারণা করতে পারেননি। তাই আওয়ামী লীগের নেতাদের নিয়ে রাতের বেলায়ও তিনি আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। সম্ভবত তাঁর ভরসা ছিলো, তাঁর সহকারী এবং ইয়াহিয়ার সহকারীদের মধ্যে প্রদেশে ক্ষমতা দেওয়ার যে-সমঝোতা হয়েছে,

ইয়াহিয়া তা মেনে নেবেন। কিন্তু তাঁর এ ভরসা ঠিক ছিলো না। কারণ তাঁর কাছ থেকে কামাল হোসেন যখন রাত সাড়ে দশটায় বিদায় নেন, ততোক্ষণে ক্যান্টনমেন্টে ট্যাঙ্ক বেরিয়ে পড়েছে। 'বীর উত্তম' রফিকুল ইসলামের মতে, পুরোনো বিমানবন্দর এলাকায় সৈন্যরা গোলাগুলি ছুঁড়তে আরম্ভ করে সাড়ে নটার দিকে। (রফিক, ১৯৮৬) রেহমান সোবহান সাড়ে নটা-দশটার দিকেই গোলাগুলির শব্দ শুনতে পান। (সোবহান, ১৯৯৪) সিদ্দিক সালিকের মতে, সৈন্যরা ছাউনি ছাড়ে সাড়ে এগারোটায়।

ঝটিকা আক্রমণ ও গণহত্যা

২৫ তারিখ রাত একটার অল্প পরেই শেখ মুজিবকে সৈন্যরা গ্রেফতার করে তাঁর বাড়ি থেকে। গ্রেফতারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিলো লে. ক. জহির আলম খানকে। তিনি তাঁর অধীনস্থ মেজর বিল্লালকে নিয়ে যান ৩২ নম্বরে। জহির আলম খান তাঁর গ্রন্থ *দ্য ওয়ে ইট ওয়াজ* (১৯৯৮) গ্রন্থে লিখেছেন যে, গ্রেফতারের আগে তাঁর সৈন্যদের ওপর পিস্তলের একটা গুলি ছোঁড়া হয়েছিলো। তার জবাবে তার সৈন্যরা মেশিনগানের এক ঝাঁক গুলি ছোঁড়ে এবং একটা গ্রেনেড ফাটায়। শেখ মুজিব তাঁর কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলে হাবিলদার-মেজর খান ওয়াজির তাঁকে প্রচণ্ড একটা থাপ্পড় দেয়। তারপর তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় ক্যান্টনমেন্টে। সেখান থেকে আদমজী স্কুলে। তিনদিন পরে পশ্চিম পাকিস্তানে। (গ্রেফতারের আগে পিস্তল থেকে একটা গুলি ছুঁড়ে সৈন্যদের প্ররোচিত করা হয়েছিলো—ধারণা করি, এ কথা একেবারে বানোয়াট। পিস্তল দিয়ে এক প্লাটুন সৈন্যকে আটকে রাখা যায় না—এটা মুজিবের মতো বিচক্ষণ নেতা কেন, একটি অপরিণত বালকও বুঝতে পারে।) সিদ্দিক সালিকের লেখাতেও কোনো পিস্তল থেকে গুলি করার কথা নেই। প্রবেশ-পথে পাহারাদারদের খতম করে দেয়াল টপকে বাড়ির চত্বরে ঢুকেছিলো মেজর বিল্লালের পঞ্চাশ জন সৈন্য। তারপরই তারা গুলি করেছিলো স্টেনগান দিয়ে—নানা দিক থেকে। দোতলায় উঠে মুজিবের শোবার ঘরের দরজায় গুলি করে দরজা খুলে সেই কক্ষে ঢুকেছিলো তারা। মুজিব তৈরি ছিলেন আত্মসমর্পণের জন্যে। (সালিক, ১৯৭৮)

আহমদ সালিমও লিখেছেন যে, গ্রেফতারের আগে মুজিবের বাসভবনের ওপর নানা দিক থেকে অসংখ্য গুলি ছোঁড়া হয়েছিলো। (সালিম, ১৯৯৭) তাঁকে মেগাফোনে নিজে নেমে আসার কথা বলা হয়েছিলো। তিনি তখন কাপড়-চোপড়ের ছোট্টো একটি ব্যাগ সঙ্গে নিয়ে আর মুখে পাইপ দিয়ে নেমে

এসেছিলেন। তিনি জীপে ওঠার পর পাকিস্তানী সৈন্যরা তাঁর ওপর যে শারীরিক নির্যাতন শুরু করে, তার কথাও তিনি নিজেই বলেছিলেন, ডেভিড ফ্রস্টকে। তিনি বলেন,

> তারা আমাকে ধরে নিয়ে টানা-হ্যাঁচড়া করে। আমার মাথার পেছন দিকে বৃষ্টির মতো ঘুসি মারতে আরম্ভ করে। আমাকে আঘাত করে রাইফেলের বাঁট দিয়ে। তা ছাড়া, তারা আমাকে এদিকে-ওদিকে ধাক্কা দিতে থাকে। (উদ্ধৃত, সালিম, ১৯৯৭)

নিজে ধরা দিলেও মুজিব আগে থেকে অন্য নেতাদের গা ঢাকা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। বিশেষ করে তাজউদ্দীনকে সে রাতেই তিনি শহরতলীতে পালিয়ে থাকার কথা বলেছিলেন। (আমীর-উল ইসলাম, ১৯৯১) শেখ ফজলুল হক মণি, তোফায়েল আহমেদ, আবদুর রাজ্জাক এবং সিরাজুল আলম খানকেও তিনি পালিয়ে গিয়ে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। অন্যদেরও সম্ভবত বলে থাকবেন। কিন্তু অন্যরা পালালেও, তাঁর নিজের পালানোর কোনো উপায় ছিলো না। তাঁর মতো একজন নেতাকে কোথাও লুকিয়ে রাখা যায় না। তার চেয়েও বড়ো কথা, পালানোর মতো মনোবৃত্তিই তাঁর ছিলো না। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র লেখা এবং পালানোর ব্যাপারে তাজউদ্দীন তাঁকে বিশেষ করে অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি রাজি না-হওয়ায়, শেষপর্যন্ত তাজউদ্দীন রাগ করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। (মুক্তিযুদ্ধের পূর্বাপর, ২০০৯)

বদরুদ্দীন উমরের মতো কোনো কোনো সমালোচক বলেছেন যে, এভাবে ধরা দেওয়া তাঁর ঠিক হয়নি। এর ফলে তিনি বিপ্লবের নেতৃত্বে দিতে ব্যর্থ হন। (উমর, ২০০৬) কিন্তু এ সমালোচনাকে যথার্থ বলে মানা যায় না। কারণ, মুজিব বিপ্লবী রাজনীতি করেননি, বরং চিরদিন সাংবিধানিক রাজনীতি করেছেন। তা ছাড়া, তিনি সম্ভবত কল্পনাও করতে পারেননি যে, পাকিস্তানীরা অমন বর্বরোচিত হামলা করে লাখ-লাখ লোককে হত্যা করতে পারে। আর, ব্যক্তিগতভাবে তিনি ছিলেন সত্যিকার নির্ভীক এবং আপোশহীন। এর আগে বহুবার গ্রেফতার বরণ করেছেন তিনি। কারাবাস করেছেন বহু বছর। কিন্তু গ্রেফতারের ভয়ে কোনোদিন তিনি আত্মগোপন করেননি। অথবা তাঁর দল নিয়ে তিনি কোনোদিন কমিউনিস্টদের মতো গোপন আন্দোলনও করেননি।

নিয়াজী এবং রাও ফরমান আলী লিখেছেন যে, তাঁরা মনে করেছিলেন রাজনীতিকদের গ্রেফতার করেই স্বাধীনতা-আন্দোলন বন্ধ করা যাবে। কিন্তু ইয়াহিয়া এবং ভুট্টো তা মনে করেননি। তাই তাঁরা চেয়েছিলেন এর ফৌজী সমাধান। ইয়াহিয়া আগে থেকে তার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। দু-একবার প্রকাশ্যে হুমকিও দিয়েছিলেন। যেমন, ২২শে ফেব্রুয়ারি জেনারেলদের সভায় তিনি নাকি বলেছিলেন যে, দরকার হলে তিরিশ লাখ লোককে খতম করে দেওয়া হবে। বাকিরা তখন অনুগত ভৃত্যের মতো আচরণ করবে। (রুডলফ রামেল, ১৯৯৬)

এ জন্যেই তিনি পূর্ব পাকিস্তানে নিয়ে আসেন টিক্কা খানকে। এর আগে টিক্কা খান কঠোর হাতে বেলুচিস্তানের জনগণকে দমন করেছিলেন। সে 'খ্যাতি'র কারণেই তাঁকে পূর্ব পাকিস্তানে পাঠানো হয়েছিলো বাঙালিদের দমন এবং নিধন করতে। অন্য জেনারেলদের নিয়ে টিক্কা খান ১৮ই মার্চ পরিকল্পনা করেছিলেন যে, মাত্র ৭২ ঘণ্টার মধ্যে দেশকে তিনি 'বিদ্রোহী'-মুক্ত করবেন। বিশে মার্চ এই পরিকল্পনা অনুমোদিত হয়। (সালিক, ১৯৮৮) ব্যাপক গণহত্যার মধ্য দিয়ে জনতাকে হতভম্ব এবং চুপ করিয়ে দেওয়াই ছিলো এই ঝটিকা আক্রমণের উদ্দেশ্য।

তার জন্যে অবশ্য সাধারণ মানুষদের নির্বিচারে হত্যা করাই যথেষ্ট ছিলো না। সেনাবাহিনীর বাঙালি সদস্য, ইপিআর (বিডিআর) ও পুলিশদেরও দমন করারও দরকার ছিলো। মার্চ মাসের গোড়া থেকেই তাই ঈস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি কর্মকর্তাদের জায়গায় বসানো হয়েছিলো পশ্চিমাদের। বেশির ভাগ বাঙালি কম্যান্ডিং অফিসারদের অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিলো দায়িত্ব থেকে। যেমন,
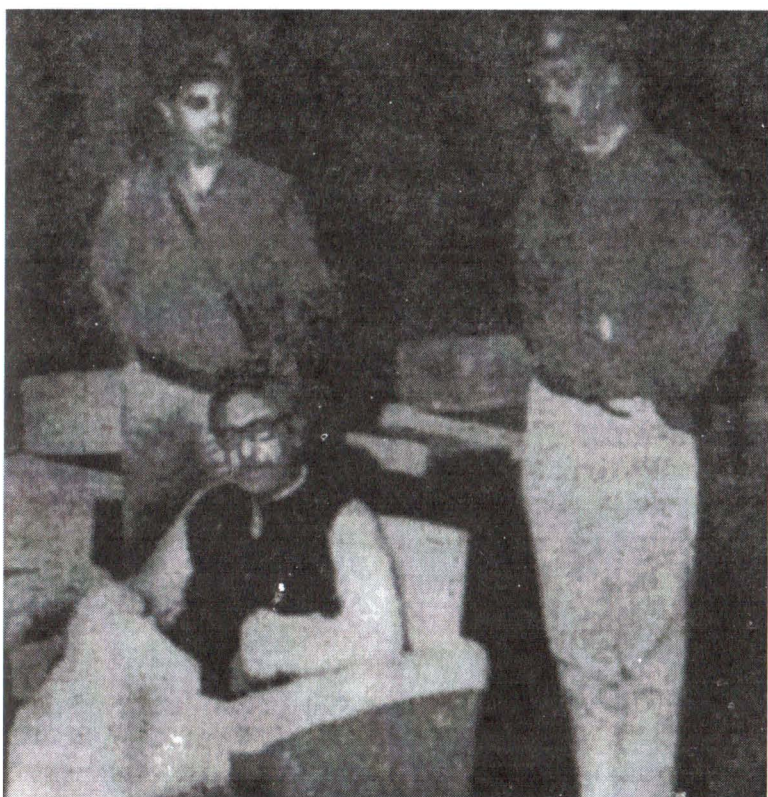
বন্দী শেখ মুজিব

চট্টগ্রামের সবচেয়ে সিনিয়র বাঙালি অফিসার ব্রিগেডিয়ার মজুমদারকে ২৪ তারিখে মিথ্যে অজুহাত দিয়ে আনা হয় ঢাকায়। যেমন, খালেদ মোশাররফকে ২২শে মার্চ ঢাকার ব্রিগেড মেজরের পদ থেকে সরিয়ে কুমিল্লায় বদলি করা হয়। যেমন, জয়দেবপুরে সফিউল্লাহর বাহিনীর কম্যান্ডিং অফিসার করে এক পশ্চিমা ব্যাটালিয়ন কম্যান্ডারকে পাঠানো হয় পঁচিশে মার্চের দুতিন দিন আগে। যেমন, শাফায়েত জামিলকে কল্পিত ভারতীয় শত্রু দমন করার জন্যে কুমিল্লা থেকে পাঠানো হয় সিলেটের পথে। (জামিল, ২০০৯) তা ছাড়া, বাঙালি সৈন্য ও সেনাপতিদের রাখা হয়েছিলো চোখে চোখে। দেশের বিভিন্ন জায়গায় নিরস্ত্র করা হয় বহু বাঙালি সেনা-কর্মকর্তাকে। এমন কি, অনেককে গ্রেফতার করা হয়। নিহতও হন অনেকে।

২৫শে মার্চ রাতে সৈন্য বাহিনী ঢাকায় যে-হামলা চালায়, তার নাম দেওয়া হয়েছিলো 'অপারেশন সার্চ লাইট'। এই হামলা যেমন অতর্কিত ছিলো, তেমনি ছিলো বিদ্যুৎ গতির। রাস্তায় বেরিয়ে সৈন্যরা মধ্যরাতের পর থেকেই নির্বিচারে হাজার হাজার লোককে মারতে আরম্ভ করেছিলো।

স্বাধীনতা আন্দোলনে ছাত্ররা বিরাট ভূমিকা পালন করেছিলেন। সে জন্যে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোর ওপর হামলা চালায় সৈন্যরা। তখনকার ইকবাল হল (সার্জেন্ট জহুরুল হক হল) ছিলো ছাত্র লীগের ঘাঁটি—সেখানে সে রাতে অন্তত দু শো ছাত্র নিহত হন। ব্রিটিশ সাংবাদিক সায়মন ড্রিং দু দিন পরে এই হলে গিয়ে তখনো পোড়া কক্ষগুলোয় আধা-পচা লাশ দেখতে পান। দেখতে পান এখানে সেখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা মৃতদেহ। (ড্রিং, *ডেইলি টেলিগ্রাফ*, ৩০. ৩. ১৯৭১) হিন্দু ছাত্রদের ওপর সৈন্যদের আক্রোশ ছিলো আরও বেশি। তাদের ধারণা ছিলো, জগন্নাথ হল কার্যত অস্ত্রাগারে পরিণত হয়েছে। (সালিক, ১৯৭৬) রাও ফরমান আলী লিখেছেন যে, সামরিক অভিযান শুরু হলে এই হল থেকেই সবচেয়ে বেশি প্রতিরোধ সৃষ্টি করা হয়েছিলো। (ফরমান আলী তাঁর গ্রন্থে সত্য কথা কমই লিখেছেন। সুতরাং তাঁর কথাকে সাক্ষ্য হিশেবে নেওয়ার কারণ নেই। তিনি এও লিখেছেন যে, ২৫শে মার্চ রাতে কোনো ট্যাংক ব্যবহার করা হয়নি।) কিন্তু সে যা-ই হোক, এই হলে সৈন্যরা যাকে পায়, তাকেই হত্যা করে। কালীরঞ্জন শীলের মতো সেখান থেকে দু-চারজন ছাত্রই অলৌকিকভাবে রক্ষা পেয়েছিলেন। (কালীরঞ্জন শীল, [রশীদ হায়দার, ১৯৯৬]) ছাত্র এবং কর্মচারীদের মৃতদেহগুলো হলের সামনের মাঠে গণকবরে মাটি-চাপা দেওয়া হয়েছিলো। সেই গণকরব খোঁড়ায় কালীরঞ্জনও অংশ নিয়েছিলেন। ক্লান্ত হয়ে সে শুয়ে পড়ায় সৈন্যরা তাঁকে মৃত বলে মনে করেছিলো। এই হলে যে-আগুন জ্বালানো হয় তা দুদিন পরেও নিভে যায়নি বলে লিখেছেন বাসন্তী গুহঠাকুরতা। (বাসন্তী, ১৯৯১)
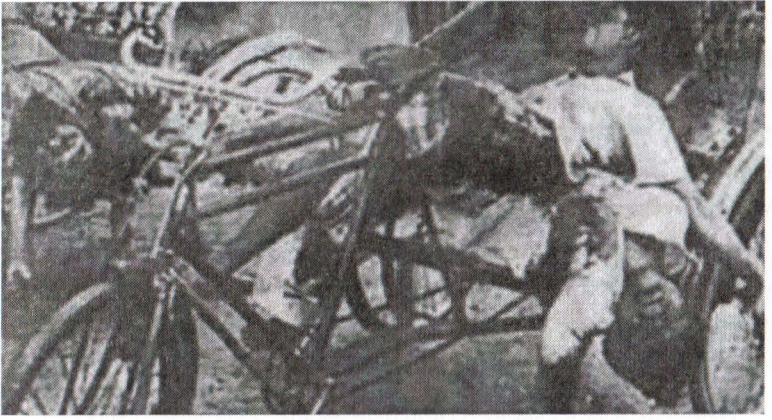
পাকিস্তানীদের
গণহত্যা

জগন্নাথ হলের প্রভোস্ট ছিলেন জি সি দেব (গোবিন্দচন্দ্র দেব)। চিরকুমার, আপন-ভোলা মানুষ। দর্শনের অধ্যাপক। সৈন্যরা তাঁকেও হত্যা করে। জগন্নাথ হলের কাছেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৪ নম্বর বাড়িতে থাকতেন অধ্যাপক মুনিরুজ্জামান আর জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা। মুনিরুজ্জামানের বাড়িতে ঢুকে সৈন্যরা তাঁকে এবং অন্য তিনজনকে টেনে এনে সিঁড়ির ওপর গুলি করে হত্যা করে। নিচ তলায় বাড়ি থেকে বের করে ঘাড়ের ওপর দুটি গুলি করে জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার। তিনি হাসপাতালে মারা যান ৩০শে মার্চ। গুলি করার আগে তাঁর কাছে নাম এবং ধর্ম কী—তা জিজ্ঞেস করেছিলো সৈন্যরা। এমনিতে তাঁকে দেখে, তাঁর সঙ্গে কথা বলে দয়া হয়েছিলো কিনা, জানা যায় না। কিন্তু হিন্দু শুনে আর দয়া করতে পারেননি। (বাসন্তী, ১৯৯১) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আট-নজন অধ্যাপক নিহত হন এই রাতে। এই অধ্যাপকদের মধ্যে তিনজন ছিলেন হিন্দু।

আসলে, হিন্দুরা পাকিস্তানের শত্রু এবং ভারতের দালাল বলে চিহ্নিত হয়েছিলেন। ফলে কেবল এই রাতে নয়, মুক্তিযুদ্ধের ন মাসই হিন্দুদের ওপর নির্মমভাবে অত্যাচার চালানো হয়েছিলো। (ম্যাসকারেনহ্যাস, ১৯৭১) নির্মম
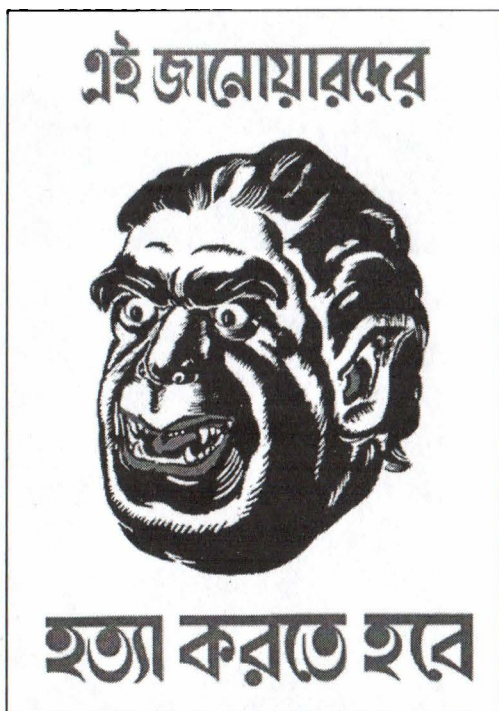
কামরুল হাসানের আঁকা ইয়াহিয়ার ব্যঙ্গচিত্র

নির্যাতন করতে পাকসেনারা অকুণ্ঠ ছিলো। কিন্তু হিন্দু নারীদের ধর্ষণ করে হত্যা করা, শিশু-বৃদ্ধসহ হিন্দু পুরুষদের নির্বিচারে হত্যা করা এবং তাঁদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারে পাকসেনা এবং তাদের দোসর রাজাকারেরা একটু বেশি বিশেষ উৎসাহী ছিলো। (সরকার, ২০০৬) বিদেশী সাংবাদিকদের বিবরণ থেকে জানা যায়, হিন্দু-নিধনের কাজ চালানো হয়েছিলো পদ্ধতিগতভাবে এবং নীতি হিশেবে। (*ডেইলি টেলিগ্রাফে* লোশাকের রিপোর্ট, *সেন্ট পিটার্সবার্গ টাইমস, ভার্জিন আয়ল্যান্ডস ডেইলি নিউজ, সানডে টাইমস* [১৩ জুন], *টাইমস* [৫ জুন], *সানডে টাইমস* [১৩ জুন] এবং *নিউ ইয়র্ক টাইমসের* বিভিন্ন সংখ্যা, অ্যান্টনি ম্যাসকারেনহ্যাসের *দ্য রেইপ অব বাংলাদেশ* [১৯৭১] গ্রন্থ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য) আসলে, পাকিস্তান-কর্তৃপক্ষ চেয়েছিলো হিন্দুদের ভয় দেখিয়ে দেশছাড়া করতে। যাতে পূর্ব পাকিস্তান পুরোপুরি মুসলমানদের দেশে পরিণত হয়।

পঁচিশে মার্চ রাতে, কেবল সাধারণ মানুষদের ওপর নয়, প্রচণ্ড আক্রমণ চালানো হয় বাঙালি নিরাপত্তা কর্মীদের ওপরও। সৈন্য বাহিনীর বাঙালি সদস্য, ইপিআর এবং পুলিশদের খতম করা ছিলো পশ্চিমাদের একটা বড়ো লক্ষ্য। তাই তারা একযোগে আক্রমণ করে পিলখানার ইপিআর ছাউনি এবং রাজারবাগের পুলিশ লাইনের ওপর। রাত বারোটায় এই দু জায়গায়ই সৈন্যরা পৌঁছে যায়।

হিন্দু কিনা, তা পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে

পিলখানায় বাঙালি জওয়ানরা প্রতিরোধ সৃষ্টি করেন, কিন্তু বেশি ক্ষণ ঠেকিয়ে রাখতে পারেননি। আগে থেকেই পশ্চিমা কর্মকর্তা এবং জওয়ানদের নিয়ে এসে সেখানে বাঙালিদের দুর্বল করে দেওয়া হয়েছিলো। জওয়ানরা অনেকেই বুড়িগঙ্গার ওপারে গিয়ে নিজেদের সংগঠিত করতে চেষ্টা করেন। নিহত হয়েছিলেন অনেকেই। রাজারবাগের পুলিশরা অতি তুচ্ছ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে প্রবল যুদ্ধ করেন, কিন্তু

সত্যিকার অর্থে বাধা দিতে পারেননি। এখানে এগারো শো পুলিশ ছিলেন। তার মধ্যে খুব কমই রক্ষা পেয়েছিলেন। বাকি সবাই নিহত হন। পুলিশ লাইনের একজন মহিলা সুইপার পরে সাক্ষী দিয়েছেন যে, পরের দিন থেকেই রাজারবাগ পরিণত হয় ধর্ষণকেন্দ্রে। বিভিন্ন বয়সের বাঙালি নারীদের—এমন কি বালিকাদের এনে—এখানে ধর্ষণ করে তারপর খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারা হয়। এই মহিলাকেও উপর্যুপরি ধর্ষণের শিকার হতে হয়েছিলো। (তালুকদার, ১৯৯১)

প্রসঙ্গত বলা দরকার যে, ধর্ষণের ব্যাপারে পাকিস্তানী সৈন্যরা বিশেষ উৎসাহী ছিলো। তাদের বোঝানো হয়েছিলো যে, এ হচ্ছে কাফের নিধনের জন্যে ধর্মযুদ্ধ অর্থাৎ জেহাদ। ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী জেহাদের মালামাল এবং নারীরা তাদের জন্যে 'হালাল'। কাজেই ন মাস ধরে লাখ লাখ বাঙালি বালিকা, কিশোরী, যুবতী এবং মধ্যবয়সী নারীদের উপর্যুপরি ধর্ষণ করতে তারা বিবেকের কোনো দংশন অনুভব করেনি। জেনারেলরাও বাদ যাননি। নিয়াজী যেমন, সালিকের ভাষ্য অনুযায়ী, দায়িত্ব নেওয়ার সময়ে জেনারেল খাদিমকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কখন তুমি তোমার রক্ষিতাদের আমার হাতে দিচ্ছ?' সালিক এ-ও স্বীকার করেছেন যে, ধর্ষণের বহু ঘটনা ঘটেছিলো এবং এ জন্যে নজন জওয়ানের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিলো। (সালিক, ১৯৮৮)

ঢাকায় কী ভয়ানক হামলা হয়েছিলো তার বর্ণনা দেশী-বিদেশী অনেকেই দিয়েছেন। এই হামলার ফলে কী ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছিলো, তারও। সরকারী হিশেবে বলা হয়েছিলো ৪০ জন নিহত হয়েছেন। সেনাবাহিনীর অফিসারদের মতে, এক শো। (সালিক, ১৯৭৬) সায়মন ড্রিং ব্যাংকক থেকে পাঠানো প্রতিবেদনে বলেন, ঢাকায় সাত হাজার, দেশের অন্যান্য জায়গায় পনেরো হাজার। (*ডেইলি টেলিগ্রাফ, ৩০ মার্চ*) ২৭শে মার্চের *ইভনিং স্ট্যান্ডার্ড*-এর মতে ১০ হাজার। ২৮শে মার্চের *নিউ ইয়র্ক টাইমসের* মতে দশ হাজার; এ দিনের *ডেইলি এক্সপ্রেসের* মতে ৪০ হাজার। ২৯ তারিখের *সিডনি হেরাল্ডে* লেখা হয়, দশ হাজার থেকে এক লাখ। *নিউ ইয়র্ক টাইমসের* পয়লা এপ্রিলের সংখ্যা প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয় 'অপারেশন সার্চ লাইটে'র সময়ে নিহতদের সংখ্যা পঁয়ত্রিশ হাজার। বাঙালিরা লিখেছেন, হাজার হাজার। কিন্তু সত্যিকারভাবে কোনো সুনির্দিষ্ট সংখ্যা জানা যায় না। তবে সব মিলে ঢাকায় যে-পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিলো, তার সবচেয়ে ভালো বর্ণনা দিয়েছেন লেফটেনেন্ট জেনারেল নিয়াজী। তিনি লিখেছেন :

> ২৫ মার্চের সেই সামরিক অভিযানের নৃশংসতা বুখারায় চেঙ্গিস খান, বাগদাদে হালাকু খান এবং জালিয়ানওয়ালাবাগে ব্রিটিশ জেনারেল ডায়ারের নিষ্ঠুরতাকেও ছাড়িয়ে যায়। ... মেজর জেনারেল রাও ফরমান তার টেবিল ডায়েরিতে লিখেছেন, 'পূর্ব পাকিস্তানের শ্যামল মাটি লাল করে দেওয়া হবে।' বাঙালির রক্ত দিয়ে মাটি লাল করে দেওয়া হয়েছিলো। (নিয়াজী, ২০০৮)

সৈন্যদের এই ঝটিকা আক্রমণ ঢাকাতেই সীমাবদ্ধ ছিলো না। সারা দেশের বড়ো শহরগুলোতে একই সঙ্গে তারা আক্রমণ শুরু করে। বিশেষ করে প্রবল যুদ্ধ শুরু হয় চট্টগ্রামে। কারণ, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে রসদ আসার এটাই ছিলো একমাত্র পথ। সে পথ খোলা রাখাটা ছিলো তাদের অগ্রাধিকার। অন্যান্য শহরে সৈন্যদের বিশেষ লক্ষ্য ছিলেন ছাত্র-শিক্ষক এবং হিন্দুরা।

বাঙালিরা পঁচিশের রাতে অতর্কিত হামলার কোনো জবাব দিতে না-পারলেও, পরের দিন থেকে পাকিস্তানী সৈন্যরা কিছু বাধার মুখোমুখি হয়। বাঙালি পুলিশ এবং নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা বিভিন্ন জায়গায় এই হত্যাযজ্ঞে বাধা দেন। তাঁদের বেশি অস্ত্রশস্ত্র ছিলো না; লড়াই করার জন্যে তাঁদের কেউ আদেশও দেননি; কিন্তু স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁরা যুদ্ধ শুরু করেন, বিশেষ করে ঢাকার বাইরে যাঁরা ছিলেন—জেলা শহরগুলোতে এবং সীমান্তে। "যার যা কিছু ছিলো" তা নিয়ে ইপিআর-এর জওয়ান, পুলিশ, ছাত্র এবং সাধারণ মানুষরা বাধা দিতে থাকেন পাকিস্তানী বাহিনীকে।

মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা

আগেই লক্ষ করেছি, ২৫শে মার্চের রাতেও শেখ মুজিব তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তা থেকে মনে হয়, হামলার আশঙ্কা করলেও, অথবা একাধিক সূত্র থেকে খবর পেলেও, সেই রাতেই সেনা-হামলা হবে—এ বিষয়ে তিনি নিশ্চিত হতে পারেননি। তাই তিনি স্বাধীনতার কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেননি। অথবা কোনো ঘোষণা রেকর্ড করেও রাখেননি। সেদিন সন্ধ্যের পরেও বেতার-টেলিভিশনের ওপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ ছিলো। ইচ্ছে করলে, তিনি তা ব্যবহার করতে পারতেন। আগেই উল্লেখ করেছি, এ নিয়ে তাজউদ্দীনের সঙ্গে তাঁর রীতিমতো মতানৈক্য হয়। অনেকে বলেন যে, তিনি যুদ্ধের ঘোষণা পুলিশের বেতার মারফত দিয়েছিলেন। এ ছাড়া, পাকিস্তানী লেখক আহমদ সালিম লিখেছেন যে, তিনি কেন্দ্রীয় টেলিগ্রাফ অফিসে ফোন করে একটি বার্তা দিয়েছিলেন, সবাইকে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে। এতে তিনি বলেছিলেন,

> পাকসেনারা মধ্যরাতে রাজারবাগের পুলিশের দপ্তর আর পিলখানায় ইপিআর-এর ওপর হামলা চালিয়েছে। প্রতিরোধের শক্তি সংগ্রহ করো এবং স্বাধীনতার যুদ্ধের জন্যে তৈরি হও। (সালিম, ১৯৯৭)

শেখ মুজিব নিজেও দাবি করেছেন যে, ঝটিকা আক্রমণ আরম্ভ হওয়ার পরে তিনি প্রতিরোধ তৈরির ঘোষণা দিয়েছিলেন। (মুজিব, 'শোষিতের গণতন্ত্র চাই', ২৬শে মার্চ, ১৯৭৫ তারিখের বক্তৃতা) তাঁর নিজের স্বীকৃতি এবং আহমদ সালিমের কথায় মিল থেকে মনে হয়, সত্যি সত্যি তিনি এই বার্তা পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি বার্তা পাঠানোর পরই টেলিগ্রাফ যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায়। সে জন্যে বার্তাটি কোথাও পাঠানো যায়নি। এ ছাড়া, সিদ্দিক সালিকের মতে, রাত বারোটার দিকে একটা অজ্ঞাত-পরিচয় বেতার কেন্দ্র থেকে ক্ষীণকণ্ঠে তাঁর ঘোষণা শোনা গিয়েছিলো। (সালিক, ১৯৮৮) কিন্তু এই ঘোষণা তিনি নিজে শোনেননি, অথবা অন্য কেউ শুনেছেন বলেও উল্লেখ করেননি। তবে মুজিব ৭ই মার্চ যে-ঘোষণা

দিয়েছিলেন, স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়ার জন্যে তা-ই ছিলো যথেষ্ট। পাকিস্তানী সৈন্যরা আক্রমণ করে স্বাধীনতা আন্দোলন দমন করতে পারে, তিনি তখনই তারও আশঙ্কা করেছিলেন। তাই সেদিন তিনি বলেছিলেন, যার যা কিছু আছে, তাই নিয়ে ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলতে। বস্তুত, এর মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা এবং প্রতিরোধ—উভয় ঘোষণাই দেওয়া হয়েছিলো—আগে থেকেই দেওয়া হয়েছিলো।

তার থেকেও বড়ো কথা, মুজিব সমগ্র বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতার জন্যে পুরোপুরি মানসিকভাবে তৈরি করেছিলেন। স্বাধীনতার ঘোষণা ছাড়া, অন্যকিছুতেই তাঁরা সন্তুষ্ট হতেন না। শেষ দিকে তিনি যে-রকমের স্বায়ত্ত শাসনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন—পাকিস্তানের সঙ্গে কনফেডারেশন করার (কামাল হোসেন, ২০০৬)—তা পেলে জনগণ সে পর্যায়ে আদৌ সন্তুষ্ট হতেন বলে মনে হয় না। সে জন্যেই, ২৬শে মার্চ থেকে বাঙালিরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে দেশের সর্বত্র প্রতিরোধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণার জন্যে তাঁরা অপেক্ষা করেননি। অথবা অন্য কারো ঘোষণার পরে প্রতিরোধ আরম্ভ করেননি। স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন তিনিই দেখিয়েছিলেন। এবং তিনিই বহু দলে বিভক্ত বাঙালিদের ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন স্বাধীনতার নামে। সেই ঐক্যবদ্ধ জনগণ তাঁদের প্রিয় নেতার ৭ই মার্চের ভাষণ অনুযায়ী সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন—এ কথা বললে বাড়িয়ে বলা হবে না।

অনেকে দাবি করেন যে, ২৬শে মার্চ দুপুর বেলায় চট্টগ্রাম বেতার থেকে তাঁর একটি ঘোষণা প্রচারিত হয়। 'বীর উত্তম' রফিকুল ইসলামের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, সেদিন সকালে বেতারে এই ঘোষণা দেওয়ার জন্যে তিনি আওয়ামী লীগের নেতাদের অনুরোধ করেন। তারপর আওয়ামী লীগের কয়েকজন নেতা মিলে এই ঘোষণাটি লেখেন এবং এটি শুদ্ধ করেন ড. জাফর। (রফিক, ১৯৮৬) চট্টগ্রামের 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সংগঠক বেলাল মোহাম্মদ লিখেছেন যে, সেদিন দুপুরের পরে পাঁচ মিনিটের জন্যে প্রচারিত একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে শেখ মুজিবের নামে এই ঘোষণাপত্র পাঠ করেন এম এ হান্নান। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এ আর মল্লিক এ ঘোষণা শুনেছিলেন বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। মীর্জা নাসিরউদ্দীন ছিলেন চট্টগ্রাম বেতারের আঞ্চলিক প্রকৌশলী। তিনিও জানান যে, এম এ হান্নান তাঁকে এই বিশেষ অধিবেশন প্রচারে বাধ্য করেন।

কাজেই সেদিন শেখ মুজিবের পক্ষ থেকে এ ঘোষণা পাঠ করেছিলো, এতে সন্দেহ নেই। কিন্তু অনির্ধারিত এবং সংক্ষিপ্ত অধিবেশনের কারণেই হোক, অথবা অন্য কোনো কারণেই হোক, এই ঘোষণা বেশি লোকে শুনেছিলেন বলে জানা যায় না। বেলাল মোহাম্মদও বেতারের কর্মচারীদের কাছে এই ঘোষণার কথা শুনেছিলেন, কিন্তু নিজের কানে ঘোষণাটি শোনেননি। ২৬শে মার্চ আগরতলা থেকেও এ ঘোষণাটি শোনা গিয়েছিলো বলে ২৭শে মার্চের লন্ডনের *গার্ডিয়ান* পত্রিকায় খবর বেরিয়েছিলো। তা ছাড়া, আগেই বলেছি, শেখ মুজিব ৭ই মার্চই

স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন। বলেছিলেন যে, তিনি আবার ঘোষণা না-দিলেও জনগণ যেন সংগ্রাম চালিয়ে যান। সুতরাং হান্নানকে তিনি ঘোষণা পাঠিয়েছিলেন কিনা, তা বেশি প্রাসঙ্গিক নয়। জিয়াউর রহমানও লিখেছেন যে, মুজিব ৭ই মার্চই গ্রীন সিগন্যাল দিয়েছিলেন :

> '৭ই মার্চ রেসকোর্সের ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ঘোষণা আমাদের কাছে এক গ্রীন সিগন্যাল বলে মনে হলো। আমরা আমাদের পরিকল্পনাকে চূড়ান্ত রূপ দিলাম। কিন্তু কোনো তৃতীয় ব্যক্তিকে জানালাম না।' (জিয়াউর রহমান, *বিচিত্রা*, স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা, ১৯৭৪)

শেখ মুজিবের পক্ষ থেকে হান্নানের ঘোষণা প্রচারিত হওয়ার পর বেতারকর্মীরা নিরাপত্তার অভাব বোধ করেন। পাহারা দেওয়ার জন্যে রফিকুল ইসলাম আগের দিন যে-জওয়ানদের বেতার ভবনে পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তাঁরাও আসেননি। তাই ২৭শে মার্চ বেলাল মোহাম্মদ পটিয়ায় যান সেখানে যে-বাঙালি সৈন্যরা ছিলেন, বেতার ভবন পাহারা দেওয়ার জন্যে তাঁদের সাহায্য চাইতে। সেখানে গিয়ে শোনেন, সেখানকার সৈন্যদের মধ্যে মেজর জিয়াউর রহমান সবচেয়ে সিনিয়র। তিনি তাঁকে অনুরোধ করেন, বেতার ভবন এবং কালুরঘাটে ট্র্যান্সমিটার ভবন পাহারার জন্যে কিছু সৈন্য দিতে। তিনটি লরিতে সৈন্য নিয়ে জিয়াউর রহমান তখন নিজেই আসেন কালুরঘাটে।

সম্প্রচার ভবনে বসে বেলাল মোহাম্মদ জিয়াকে স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়ার একটা প্রস্তাব দেন। ঘোষণা দেওয়ার এই সুযোগটি জিয়া সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। বেলাল মোহাম্মদের দেওয়া এক খণ্ড কাগজে তিনি ইংরেজিতে ঘোষণাটি লিখে তারপর বেতারে পড়েছিলেন সন্ধ্যে সাড়ে সাতটার দিকে। এটির অনুবাদ করেন বেলাল মোহাম্মদ নিজে আর এর ভাষা ঠিক করে দেন নাট্যকার মমতাজউদদীন। জিয়া প্রথমে নিজেকে স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হিশেবে লিখলেও, পরে অন্যদের পরামর্শে 'জাতির সর্বোচ্চ নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান'-এর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা দিচ্ছেন বলে সংশোধন করেন। তিনি নিজে ঘোষণা দেওয়ার পর তাঁর ঘোষণার বাংলা অনুবাদ বারবার পড়ে শোনানো হয়। (বেলাল, ২০০৬) ক্যাপ্টেন অলি আহমদ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু কোনো ভূমিকা পালন করেছিলেন বলে বেলাল মোহাম্মদ লেখেননি, যদিও অলি আহমদের লেখা থেকে মনে হয়, এই ঘোষণা দেওয়ার ব্যাপারে তিনিই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। (অলি আহমদ, ২০০৪)

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, জিয়া *বিচিত্রা* পত্রিকায় তাঁর স্মৃতিচারণে লিখেছিলেন যে, ১৯৬৫ সালের শেষ দিকেই '...উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবেই ক্যাডেটদের শেখানো হতো—আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হচ্ছেন ওদের [পশ্চিম পাকিস্তানীদের] সবচেয়ে বড়ো শত্রু।' (জিয়াউর রহমান, *বিচিত্রা*, ১৯৭৪)

যখনকার কথা এখানে জিয়া লিখেছেন, আসলে তখনো শেখ মুজিব জাতির পিতা অথবা বঙ্গবন্ধুতে পরিণত হননি। বোঝা যায়, এটা ছিলো তাঁর অতিভক্তির কথা।

'৭১-এর মার্চ মাসে মেজর জিয়ার নাম দেশে সাধারণ মানুষদের কারও জানা ছিলো না। বাঙালি সৈন্যদের মধ্যে তিনি সবচেয়ে সিনিয়রও ছিলেন না। তার থেকেও বড়ো কথা: তিনি ঘোষণা দেওয়ার অন্তত ৪০ ঘণ্টা আগে থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় বাঙালি নিরাপত্তা কর্মী এবং ছাত্র-জনতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সশস্ত্র প্রতিরোধ শুরু করেছিলেন। তাঁর ঘোষণা শুনে কেউ সংগ্রাম আরম্ভ করেননি। কিন্তু এ কথা স্বীকার না-করে উপায় নেই যে, তাঁর ঘোষণা বাংলাদেশের যেসব জায়গায় শোনা গিয়েছিলো, সেসব জায়গার লোকেরা দারুণ উৎসাহিত হয়েছিলেন। আমীর-উল ইসলাম লিখেছেন যে, তাজউদ্দীন এবং তিনি ফরিদপুর অথবা কুষ্টিয়ার কাছে একটা জায়গায় বসে এই ঘোষণা শুনতে পান। তাঁরাও উৎসাহিত বোধ করেন। (আমীর-উল ইসলাম, ১৯৯১) এইচ টি ইমাম লিখেছেন যে, তিনি এই পথে থাকার সময়ে এই ঘোষণা শুনতে পেয়ে খুব উৎসাহিত হয়েছিলেন। (ইমাম, ২০০৪) যাঁরা বিভিন্ন জায়গায় যুদ্ধ শুরু করেছিলেন, এ ঘোষণা শুনে তাঁরাও অনুভব করেন যে, তাঁরা একা নন, দেশের অন্যত্রও যুদ্ধ হচ্ছে। সেদিক থেকে বিচার করলে, জিয়াউর রহমানের এই ঘোষণা ছিলো ঐতিহাসিক এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তাই বলে, 'স্বাধীনতার ঘোষক' বলে তাঁর নাম ভাঙিয়ে এক দল লোক যে-রাজনৈতিক ফায়দা নেওয়ার চেষ্টা করছেন, তাকে অসাধু চেষ্টা এবং সুবিধাবাদ ছাড়া কিছুই বলা যায় না।

মুক্তিযুদ্ধের সূচনা

যোগাযোগ ও সমন্বয়ের অভাব

পাকসেনারা ২৫শে মার্চ রাতের বেলায় সারা দেশে আকস্মিক সামরিক অভিযান শুরু করায়, বাঙালিরা বেশির ভাগ জায়গাতেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন। তারপর ২৬ তারিখ থেকে বাঙালি নিরাপত্তা কর্মী এবং সাধারণ মানুষ মিলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে পাকিস্তানীদের আক্রমণের বিরুদ্ধে যা করেন, তাকে যুদ্ধ না-বলে বলা উচিত প্রতিরোধ। এই প্রতিরোধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটা জিনিশ পরিষ্কার হয়ে ওঠে। তার মধ্যে সবচেয়ে প্রধান হলো: ১. বিভিন্ন জায়গার প্রতিরোধের মধ্যে কোনো সমন্বয় ছিলো না। প্রতিরোধে যাঁরা নেতৃত্ব দেন, তাঁদের মধ্যেও না। কারণ এর জন্যে কোনো পূর্ব-পরিকল্পনা অথবা পূর্ব-প্রস্তুতি ছিলো না। সশস্ত্র লড়াইয়ের সময়ে ইউনিটগুলোর মধ্যে যে-বেতার যোগাযোগ অত্যন্ত জরুরী, তাও ছিলো না তাঁদের। (রফিক, ১৯৮৬) ২. পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের তুলনায় প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত বাঙালি সৈন্য ছিলেন খুবই কম। ৩. অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত পশ্চিমা সৈন্যদের সঙ্গে বাঙালিরা যুদ্ধ করছিলেন ৩০৩ রাইফেল আর কিছু এলএমজি দিয়ে। তাঁদের কাছে তিন ইঞ্চির থেকে বড়ো কোনো মর্টার লঞ্চারও ছিলো না। এ কথায়, তাঁদের কাছে ভারী অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলাগুলি বলতে গেলে ছিলোই না।

যোগাযোগের অভাব কিভাবে এই যুদ্ধে বাঙালিদের বেকায়দায় ফেলেছিলো, চট্টগ্রামের দৃষ্টান্ত দিয়ে তা বোঝানো যায়। ক্যাপ্টেন রফিকুল ইসলাম ২৫শে মার্চ রাত পৌনে নটার মধ্যে ইপিআরের জওয়ানদের নিয়ে যুদ্ধ শুরু করেন। তখনো পাকিস্তানীরা 'অপারেশন সার্চ লাইট' আরম্ভ করেনি। তাই বলা যেতে পারে, অন্য কেউ যুদ্ধ শুরু করেননি রফিকের আগে। তিনি আগে আক্রমণ করে শত্রুদের বেকায়দায় ফেলতে চেয়েছিলেন। চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টের সর্বোচ্চ বাঙালি

সেনাপতি লেফটেনেন্ট কর্নেল এম এ চৌধুরী এবং ৮ম ঈস্ট বেঙ্গল-এর মেজর জিয়াকে তিনি খবর পাঠান ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণ করতে। ক্যান্টনমেন্টে ছিলো মাত্র পাঁচ-ছ শো পশ্চিমা সৈন্য। বাঙালিদের সংখ্যা ছিলো প্রায় দু হাজার। রফিক খবর পাঠিয়েছিলেন আওয়ামী লীগের দুজন নেতার মাধ্যমে। তাঁর মতে, এই দুজন রাত নটার মধ্যে খবর পৌঁছেও দিয়েছিলেন। কিন্তু লে. ক. চৌধুরী অথবা মেজর জিয়া কেউই আগে থেকে আক্রমণ করার কথা ভাবেননি। ওদিকে, ২০তম বেলুচ রেজিমেন্টের সৈন্যরা বসে ছিলো না। তারা অতর্কিতে ক্যান্টনমেন্টের বাঙালি সৈন্যদের ওপর হামলা করে, রাত সাড়ে এগারোটায়। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তারা হাজার খানেক বাঙালি সৈন্য এবং তাঁদের পরিবারের বহু সদস্যকে হত্যা করে। এমন কি, লে. ক. চৌধুরীও নিহত হন। সেনা-ছাউনি থেকে পালিয়ে-আসা কয়েকজন বাঙালি সৈন্য ৮ম রেজিমেন্টে খবর দেন এবং সাহায্য করতে অনুরোধ করেন। তখন ৮ম রেজিমেন্ট যদি উত্তরে ক্যান্টনমেন্টের দিকে এগিয়ে যেতো, তা হলেও ঈস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারের বাঙালি সৈন্যরা হয়তো অনেকে রক্ষা পেতেন। (রফিক, ১৯৮৬)

এদিকে, চট্টগ্রাম শহরে ক্যাপ্টেন রফিক অতর্কিতে আক্রমণ করে তাঁর বাহিনীর অবাঙালি কম্যান্ডিং অফিসার এবং অবাঙালি সৈন্যদের নিরস্ত্র করেন এবং তাঁর জওয়ানদের নিয়ে অবস্থান নেন রেলওয়ে হিলের ওপর। অন্যদিকে, বাঙালিদের ওপর আক্রমণ শুরু হয়ে গেছে—ষোলোশহরে ৮ম বেঙ্গলের দপ্তরে এই খবর পৌঁছার আগেই মেজর জিয়া তাঁর কম্যান্ডারের আদেশে গাড়ি নিয়ে সমুদ্রবন্দরের দিকে যাত্রা করেন। গাড়িতে তাঁকে পাহারা দেওয়ার জন্যে নিযুক্ত ছিলো বেশ কয়েকজন অবাঙালি জওয়ান এবং একজন অফিসার। জিয়ার নিজের লেখা অনুযায়ী তিনি নিজের ঘাঁটি থেকে যাত্রা করেন এগারোটায়। (জিয়া, *বিচিত্রা*, ১৯৭৪) তাঁর দায়িত্ব ছিলো সোয়াত জাহাজ থেকে অস্ত্রশস্ত্র খালাস করার জন্যে নৌবাহিনীর সদর দপ্তরে গিয়ে সেখানকার কম্যান্ডিং অফিসারের কাছে রিপোর্ট করা। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, তিনি যাত্রা করার পর ক্যাপ্টেন রফিক এবং ঈস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট সেন্টার থেকে ৮ম ঈস্ট বেঙ্গলের কাছে বেলুচ রেজিমেন্টের হামলার খবর আসে। এ খবর মেজর শওকত আলির কাছেও পৌঁছে ছিলো। (মীর শওকত আলি [কবির, ২০০৫]) তারপরই ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান আর-একটি গাড়ি নিয়ে মেজর জিয়ার পেছনে ছুটতে আরম্ভ করেন, তাঁকে জানানোর জন্যে।

ওদিকে, জিয়ার গাড়ি দেখে রেলওয়ে হিলের ওপর থেকে মর্টার ছোঁড়ার জন্যে রফিকের বাহিনী তৈরি হয়। এই বাহিনীর পেছনে খালেকুজ্জামানের গাড়িও দেখতে পান তাঁরা। রফিক তাঁর জওয়ানদের গোলা না-ছুঁড়ে অপেক্ষা করতে বলেন। তিনি ভেবেছিলেন যে, যখন আরও বেশি সৈন্য বেরিয়ে আসবে—তখন তাঁরা আক্রমণ করবেন।

একটা ব্যারিকেডের কাছে জিয়ার গাড়ি থামালে খালেকুজ্জামান এসে তাঁকে ধরে ফেলেন এবং বাঙালিদের ওপর আক্রমণের খবর পৌঁছে দেন। জিয়াউর রহমান তখনই বিদ্রোহের সিদ্ধান্ত নেন। বন্দরে না-গিয়ে তিনি ফিরে আসেন নিজের বাহিনীর দপ্তরে। অলি আহমদের মতে, রাত পৌনে বারোটায়। (অলি আহমদ, ২০০৪) অলি আহমদের এই উক্তি কতোটা সঠিক, বোঝা যায় না। কারণ, পাকিস্তানী বাহিনী ঈস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারের ওপর হামলা শুরু করেছিলো, সাড়ে এগারোটায়। সেই হামলার খবর ৮ম বেঙ্গলে পৌঁছানোর পরে জিয়ার কাছে খবর পাঠানো হয়। সেই খবর পেয়ে জিয়া তাঁর বাহিনীর দপ্তরে ফিরে আসেন। সে যাই হোক, বন্দরে গেলে জিয়া হয় নিহত হতেন, নয়তো গ্রেফতার হতেন। কিন্তু বন্দরে রিপোর্ট করতে যাওয়ার পথে খবর পেয়ে তিনি সেই মুহূর্তে বিদ্রোহ ঘোষণার সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর এই সিদ্ধান্ত তাঁর জীবনকেই রাতারাতি পাল্টে দিয়েছিলো। তাঁকে একটা কৃতিত্ব দিতেই হবে যে, বাঙালি সেনাবাহিনীর কর্মকর্তাদের মধ্যে তিনিই সবার আগে বিদ্রোহ করেন।

একবার বিদ্রোহের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর, জিয়া আর পেছনে ফিরে তাকাননি। ষোলোশহরের ঘাঁটিতে পৌঁছে তিনি তাঁর সঙ্গী পশ্চিমা সৈন্যদের নিরস্ত্র করেন। কম্যান্ডিং অফিসারকে গ্রেফতার করেন তার কক্ষ থেকে এবং তারপর তাকে মেরে ফেলেন ব্যাটম্যানকে দিয়ে। কিন্তু তিনি যা করেননি, তা হলো: উত্তর দিকে এগিয়ে গিয়ে ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণ। তাঁর শ তিনেক সৈন্যের সামনে বক্তৃতা করে তাদের উদ্বুদ্ধ করে রাত সওয়া দুটোয় তিনি যাত্রা করেন পুবে কালুরঘাটের দিকে। কেন তিনি ক্যান্টনমেন্টের দিকে অথবা শহরের দিকে গেলেন না, সে কারণ তিনি ব্যাখ্যা করেননি। সে যাই হোক, যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্বল থাকা সত্ত্বেও ভাগ্যিস রফিক তাঁর জওয়ানদের গাড়ির ওপর আক্রমণ করতে নিষেধ করেছিলেন। নয়তো জিয়া এবং খালেকুজ্জামান উভয়ই সেখানে নিহত হতে পারতেন। যোগাযোগ এবং সমন্বয়ের অভাবে কতো বিপদ হতে পারে, রফিক তাঁর লড়াইয়ের বিস্তৃত বিবরণে তার আরও দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। (রফিক, ১৯৮৬)

আগে থেকে আক্রমণ করায় ক্যাপ্টেন রফিক গোড়াতেই যথেষ্ট সাফল্য লাভ করেছিলেন। কিন্তু বেতার যোগাযোগ, জওয়ান এবং অস্ত্রশস্ত্রের অভাবে চট্টগ্রামকে মুক্ত করতে অথবা চট্টগ্রামের মুক্ত এলাকাকে ধরে রাখতে পারেননি। ২৫শে মার্চের আগেই তিনি সীমান্তে অবস্থিত ইপিআর-এর জওয়ানদের সাংকেতিক ভাষায় জানিয়েছিলেন যে, দরকার হলে তাঁদের চট্টগ্রাম শহরে আসতে হবে। সেই আদেশ অনুযায়ী চট্টগ্রামের দক্ষিণ এবং পুব দিক থেকে ইপিআর-এর শত শত জওয়ান যাত্রাও করেন চট্টগ্রামের দিকে। কিন্তু মেজর জিয়া কালুরঘাটে তাঁদের থামিয়ে দেন। ফলে কালুরঘাটে কদিনের মধ্যে

ইপিআর-এর হাজার খানেক জওয়ান সমবেত হন। ওদিকে, চট্টগ্রাম শহরে জওয়ানের অভাবে রফিককে পিছু হটতে হয়। রফিক লিখেছেন যে, জিয়ার এই কৌশল ছিলো নিতান্ত আত্মঘাতী। (রফিক, ১৯৮৬)
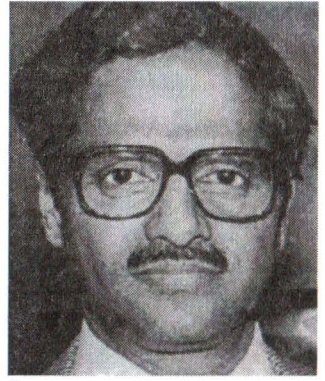
যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে ঢাকার অতো কাছে জয়দেবপুর-গাজীপুর অঞ্চলে থেকেও মেজর সফিউল্লাহ ২৮শে মার্চের সকালবেলার আগে পর্যন্ত সত্যিকারের কী ঘটছে, তার খবর পাননি। অথবা পশ্চিমা কম্যান্ডিং অফিসারকে ফাঁকি দিয়ে নিজের বাঙালি সৈন্য নিয়ে ময়মনসিংহের দিকে যাত্রাও করতে পারেননি। ফলে প্রতিরোধে যোগ দিতে তিনি অনেক দেরি করেন। এমন কি, মেজর জিয়ার ঘোষণাও তিনি শুনতে পাননি। কারণ তিনি লিখেছেন এই ঘোষণা প্রচারিত হয়েছিলো অপরাহ্নে / বিকালে। (সফিউল্লাহ, ১৯৮৯) কিন্তু প্রকৃত পক্ষে, প্রচারিত হয়েছিলো সন্ধ্যের পরে। খালেদ মোশাররফও এ ঘোষণা শোনেননি। তিনি লিখেছেন, এ ঘোষণা প্রচারিত হয়েছিলো ২৬শে মার্চ। (খালেদ [কবির, ২০০৫]) কুষ্টিয়ায় ছিলেন মেজর ওসমান। তিনি ২৬ অথবা ২৭ তারিখের কোনো ঘোষণাই শোনেননি। তবে কুষ্টিয়া শহরে বসে 'অপারেশন সার্চ লাইটে'র খবর তিনি পান ২৬শে সকাল বেলাতেই। তারপর বেলা এগারোটায় তাঁর বাহিনীর সদর দপ্তর চুয়াডাঙ্গায় পৌঁছেই বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। (ওসমান [কবির, ২০০৫])

বীর উত্তম রফিকুল ইসলাম, যিনি সবার আগে বিদ্রোহ করেন

যোগাযোগ, জনবল এবং অস্ত্রশস্ত্রের তীব্র অভাব সত্ত্বেও, আগেই বলেছি, ২৬শে মার্চই বাংলাদেশের বেশির ভাগ শহরে প্রতিরোধ শুরু হয়েছিলো। কেউ কারো আদেশের জন্যে অপেক্ষা করেননি। যেসব জায়গাতে পাকিস্তানী সৈন্য ছিলো, সেসব জায়গাতেই তাদের ওপর আক্রমণ চালানো হয়। তবে প্রথম দু-এক দিন প্রতিরোধ সৃষ্টি করেন প্রধানত ইপিআর এবং পুলিশ বাহিনীর জওয়ানরা। সেই সঙ্গে যোগ দেন কিছু ছাত্র ও সাধারণ মানুষ। ইপিআর-এর হাবিলদার-মেজর মুজিবুর রহমান তাঁর চুয়াডাঙ্গার ঘাঁটিতে ক্যাপ্টেন রফিকের মতো বিদ্রোহ করেন ২৫শে মার্চ রাতে। বিদ্রোহ করার পরই তিনি সেখানকার সমস্ত পাকিস্তানী জওয়ানকে গ্রেফতার অথবা হত্যা করেন। (ওসমান [শাহরিয়ার কবির, ২০০৫]) সে জন্যেই, পরের দিন ওসমান চৌধুরী যখন চুয়াডাঙ্গায় গিয়ে বিদ্রোহ করেন, তখন তাঁকে কোনো বিরোধিতার মুখোমুখি হতে হয়নি। যেখানেই আগে থেকে বাঙালি যোদ্ধারা বিদ্রোহ করেছেন, সেখানেই পাকিস্তানীদের ক্ষতির পরিমাণ ছিলো বেশি, আর বাঙালিদের ক্ষতির পরিমাণ ছিলো অনেক কম।

সুদূর দিনাজপুরের একটি সীমান্ত আউট পোস্টেও ২৫শে মার্চ রাতেই ইপিআর-এর আর-একটি দল বিদ্রোহ করেন। এখানকার কম্যান্ডার ছিলেন ভুলু মিয়া। সঙ্গীদের নিয়ে সেই রাতেই তিনি অবাঙালি সৈন্যদের নিরস্ত্র করেন। তারপর সেখানে উড়িয়ে সেখানে দেন বাংলাদেশের পতাকা। তিনি নিজে ছিলেন ইপিআর-এর একজন জেসিও। (জামিল, ২০০৯)

ইপিআর-এর জওয়ানরাই মুক্তিযুদ্ধে সবার আগে অংশ নিয়েছিলেন—এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। অপর পক্ষে, বেশির ভাগ জায়গাতেই বাঙালি সৈন্যরা বিদ্রোহে যোগ দেন একটু দেরি করে। এই দেরি করার জন্যে বহু ক্ষেত্রে তাঁদের অনেক মূল্যও দিতে হয়েছিলো। যেমন, যশোর ক্যান্টনমেন্টে। সেখানে বাঙালি সিনিয়র অফিসার ছিলেন—একজন লেফটেনেন্ট কর্নেল—কিন্তু তিনি বিদ্রোহ করেননি। তাঁর বাহিনীকেও তিনি বিদ্রোহ করার জন্যে প্রস্তুত করেননি। ফলে ব্রিগেডিয়ার দুররানি এসে তাঁদের নিরস্ত্র করেন। এর পর এই বাহিনীর সদস্যরা মেজর হাফিজের অধীনে বিদ্রোহ করেন। কিন্তু বিদ্রোহ করতে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিলো। তাই তাঁদের অনেকেই হতাহত হন। পালিয়ে গিয়ে নতুন করে প্রস্তুতি নিতেও তাঁদের সময় লেগেছিলো। যেসব বাঙালি সৈন্য অথবা সেনাকর্মকর্তা পাকিস্তানের কাছে আনুগত্য দেখিয়েছিলেন, তাঁদেরও ভাগ্য প্রসন্ন ছিলো না। কারণ, পাকিস্তানীরা তাঁদের দু-একজন ছাড়া অন্যদের বিশ্বাস করতে পারেনি। বহু জায়গাতে এই বিশ্বস্তরাও নির্যাতিত হন। এমন কি, নিহত হন অনেকে।

নিরাপত্তা বাহিনী এবং স্বেচ্ছাসেবক হিশেবে যাঁরা সরাসরি যুদ্ধ করেননি, তাঁরাও নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকেননি। তাঁরা এই যোদ্ধাদের খাবার-দাবার এগিয়ে দেন। পথ দেখান। খবর পৌঁছে দেন। পরিখা খননে সাহায্য করেন। মোট কথা, যে যা দিয়ে পেরেছেন, সাধারণ মানুষ তা দিয়েই সাহায্য করেছেন। যুদ্ধের অভিজ্ঞতা না-থাকায় তাঁরা অনেকেই মনে করেছিলেন যে, অচিরেই তাঁরা জয়ী হবেন।

যেসব জায়গাতে সত্যিকারের যুদ্ধ শুরু হয়, তাদের কোথাও কোথাও বাঙালিরা গোড়াতে খানিকটা সফলতা লাভ করেন। মুক্তিযোদ্ধারা অনেকেই এই কৃতিত্বের কথা বলেছেন। কিন্তু তাঁদের প্রয়াস কোথায় কতোটা সফল হয়েছিলো, তা জানা যায় শত্রুপক্ষের লেখা থেকে। সালিক যেমন কয়েকটি জায়গায় বাঙালিদের প্রবল বাধার কথা লিখেছেন। তাঁর মতে, প্রথম সবচেয়ে প্রবল বাধা আসে চট্টগ্রামে। তিনি লিখেছেন যে, পাকিস্তানী সৈন্যরা কুমিল্লা থেকে চট্টগ্রামে যাওয়ার পথে কুমিরায় প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। ফলে, কম্যান্ডিং অফিসার-সহ এগারোজন নিহত হয়। চট্টগ্রামের পথে নিহত হয় আরও তেরোজন। (সালিক, ১৯৮৮; ফরমান আলী, ১৯৯২) সালিক এবং রাও ফরমান আলী নিজেরাই যদি এই ক্ষয়ক্ষতির কথা স্বীকার করেন, তা হলে আসল ক্ষতির পরিমাণ ছিলো হয়তো অনেক বেশি। চট্টগ্রামের ইপিআর-এর সদর দপ্তরেও তিন ঘণ্টার প্রচণ্ড যুদ্ধের কথা স্বীকার করেন তিনি।

জিয়াউর রহমান। যিনি মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁর ২৭শে মার্চের ঘোষণাও ছিলো ঐতিহাসিক

সালিকের মতে, পাকিস্তানী বাহিনীর সবচেয়ে ক্ষতি হয় কুষ্টিয়া আর পাবনায়। বিশেষ করে কুষ্টিয়ায় শেষ পর্যন্ত পাকিবাহিনীর কেউই রক্ষা পায়নি। ৩০শে মার্চ আক্রান্ত হওয়ার পর ঐ দিনই, তাঁর মতে, ৪১ জন নিহত হয়। মেজর শোয়েবের ১৫০ জন সৈন্যের মধ্যে জীবিত ছিলো মাত্র ৬৫ জন। যশোরে পালানোর সময় শোয়েব-সহ তারাও নিহত হয়। যারা যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে একাধিকবার সাহায্য করতে আসে, তারাও বেশির ভাগ পথে নিহত হয়। এই প্রতিরোধের মুখে কুষ্টিয়া জয় করা সহজ হয়নি। শেষ পর্যন্ত ১৬ই এপ্রিল এ শহর পাকিস্তানীদের দখলে আসে।

সালিকের বর্ণনা অনুযায়ী, পাবনায়ও একই রকম ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিলো। এখানে রাজশাহী থেকে পাকিস্তানী সৈন্যদের একটি দল এসেছিলো গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলো রক্ষা করতে। কিন্তু ২৭শে মার্চ ইপিআর, পুলিশ এবং স্বেচ্ছাসেবকদের আক্রমণে তাদের পরাজিত হতে হয়। জীবিতদের গ্রামের পথ ধরে পালিয়ে যেতে হয় রাজশাহীতে। সালিকের হিশেবে পাবনায় দুজন অফিসার, তিনজন জেসিও এবং অন্য আশিজন নিহত হয়। রাজশাহীতে ফিরতে পেরেছিলো মাত্র আঠারোজন। ফেরার পথে তাদের কম্যান্ডিং অফিসার—একজন মেজরও—নিহত হয়। শেষ পর্যন্ত ১০ই এপ্রিল পাকিস্তানের কব্জায় আসে পাবনা শহর।

যে-চট্টগ্রামে সবার আগে বিদ্রোহ হয়েছিলো, তাও পাকিস্তানীদের দখলে আসে এপ্রিলের দশ-এগারো তারিখের দিকে। শুরু হয় বাঙালিদের পিছু হটার পালা এবং সেই সঙ্গে দীর্ঘ মেয়াদি প্রতিরোধ। কালুরঘাটে প্রচণ্ড হামলার মুখে জিয়ার সৈন্যরা

পিছু হটতে বাধ্য হন এগারো তারিখে। তবে এই অঞ্চলে বাঙালিরা এর পরেও হামলা চালাতে থাকে। ১৯ তারিখ এ রকম একটি হামলা করলে পাকিস্তানীরা পাল্টা-হামলা চালায়। তাতে বাঙালি সৈন্যদের পিছু হটার সুযোগ করে দিতে গিয়ে মেশিনগান থেকে বৃষ্টির মতো গুলি করতে থাকেন মুন্সি আবদুর রউফ। শেষ পর্যন্ত তিনি সেখানেই নিহত হন। যুদ্ধের পর তাঁকে 'বীর শ্রেষ্ঠ' উপাধি দেওয়া হয়। (শওকত [কবির, ২০০৬])

২৪শে এপ্রিল বেনাপোলের কাছে পাকিস্তানীদের সঙ্গে প্রবল যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে আবু ওসমানের বাহিনী। এক পর্যায়ে তাঁর সৈন্যরা খুব বেকায়দায় পড়েন এবং তাঁদের গোলাবারুদ ফুরিয়ে আসে। তখন তা দেবার জন্যে এগিয়ে যান সুবেদার মুজিবুর রহমান, যিনি ২৫শে মার্চ রাতেই চুয়াডাঙ্গায় বিদ্রোহ করেছিলেন। শেষে অন্যদের রক্ষা করার জন্যে নিজেই মেশিনগান চালাতে আরম্ভ করেন। এক সময়ে তাঁরও গুলি ফুরিয়ে যায়। তারপর পিস্তল দিয়ে গুলি ছুঁড়তে থাকেন। তাও যখন ফুরিয়ে যায়, তখন গুলির আঘাতে নিহত হন তিনি। মেজর ওসমান এঁকে 'বীর শ্রেষ্ঠ' উপাধি দেওয়ার জন্যে সুপারিশ করেছিলেন; কিন্তু ওসমানী তা রাখেননি। (ওসমান [কবির, ২০০৬]) আবু ওসমানকে অপছন্দ করতেন জেনারেল ওসমানী। তাই মুক্তিযুদ্ধের একেবারে প্রথম দিকে অগ্রণীর ভূমিকা পালন করা এবং একজন সেক্টর কম্যান্ডার হওয়া সত্ত্বেও ওসমানী তাঁকে কোনো উপাধিই দেননি। তিনিই একমাত্র সেক্টর কম্যান্ডার যাঁকে ওসমানী এ উপাধি দেননি।

এর পরও এখানে-সেখানে মুক্তিযোদ্ধারা অতর্কিত আক্রমণ করতে থাকেন। যেমন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-সিলেট সড়কে লে. মোরশেদ ১৪, ১৬ এবং ১৯শে এপ্রিল চোরাগোপ্তা হামলা করে খুবই সফল হয়েছিলেন। এতে হতাহত হয়েছিলো বহু শত্রু সৈন্য। ২২, ২৩ ও ২৪শে এপ্রিল বাংলাদেশ-আগরতলা সীমান্তে খালেদ মোশাররফের অধীনে শাফায়াত জামিল তাঁর সৈনিকদের নিয়ে তীব্র যুদ্ধ চালান। এখানেই ২৪শে এপ্রিল ভোর রাতে ল্যান্স নায়েক মোস্তফা কামাল নিহত হন। পরে তিনি 'বীর শ্রেষ্ঠ' উপাধি পেয়েছিলেন। তিনি এলএমজি দিয়ে ৩০/৪০ জন পাক সেনাকে হত্যা করেছিলেন। আর সুযোগ করে দিয়েছিলেন, তাঁর সহকর্মীদের পিছু হটতে। (জামিল, ২০০৯) এ রকমের খণ্ড খণ্ড যুদ্ধ এপ্রিলের শেষেও চলতে থাকে। কিন্তু এক কথায় বললে, তখন মুক্তিযুদ্ধ থিতিয়ে যায়। মুক্তিযোদ্ধারা আশ্রয় নেন সীমান্ত অঞ্চলে, বেশির ভাগই ভারতীয় এলাকায়। এটা তাঁদের মনোবলের জন্যে অনুকূল ছিলো না। (রফিক, ১৯৮৬) কিন্তু অবস্থাক্রমে এটাই ছিলো তাঁদের একমাত্র বিকল্প।

ওদিকে, পাকিস্তানের সৈন্যরা ধীর গতিতে কিন্তু নিশ্চিতভাবে মফস্বলের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। একের পর একটি বড়ো শহর তাদের দখলে আসে। এবং কয়েক সপ্তাহের মধ্যে মফস্বল অঞ্চলও। সালিকের কথা থেকে পরিষ্কার দেখা যায়

কর্নেল এম এ জি ওসমানী : মেজর জলিল ও ক্যাপ্টেন নুরুল হুদার সঙ্গে আক্রমণের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করছেন

যে, দশই এপ্রিলের আগে কোনো মফস্বল শহরই পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণে আসেনি। কিন্তু, তাঁর মতে, পাকশী, পাবনা, সিলেট নিয়ন্ত্রণে আসে ১০ই এপ্রিল; ঈশ্বরদী ১১ই, নরসিংদী ১২ই; চন্দ্রঘোনা ১৩ই; রাজশাহী, ঠাকুরগাঁও ১৫ই; কুষ্টিয়া ১৬ই; চুয়াডাঙ্গা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া ১৭ই; দর্শনা ১৯শে; হিলি, সাতক্ষীরা ও গোয়ালন্দ ২১শে; দোহাজারী ২২শে; বগুড়া ২৩শে; রংপুর ২৬শে; নোয়াখালী, শান্তাহার, সিরাজগঞ্জ ও মৌলভীবাজার ২৭শে এপ্রিল; কক্সবাজার ১০ই মে এবং হাতিয়া ১১ই। (সালিক, ১৯৮৮)

সীমান্তে যেসব জায়গায় যুদ্ধ হয়, এপ্রিলের গোড়ার দিকে সেসব জায়গার কম্যান্ডাররা ভারতের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) কাছে সাহায্য চান। এর আগে ভারতের পার্লামেন্টে বাংলাদেশের অবস্থা নিয়ে আলোচনা হয় ৩১শে মার্চ। তবে তখনো পর্যন্ত ভারত এ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি। তাই বিএসএফ-এর স্থানীয় কর্মকর্তারা বেশি সহায়তা দিতে পারেননি। কোথাও কোথাও ছিটেফোঁটা দিলেও যে-ধরনের ব্যাপক সাহায্য প্রয়োজন ছিলো, আদৌ সে রকমের

নয়। নিয়াজী, রাও ফরমান আলী এবং সিদ্দিক সালিক যেভাবে লিখেছেন, তাতে মনে হয়, হাজার হাজার ভারতীয় সৈন্য ভারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তখনই বাংলাদেশে ঢুকে যুদ্ধ শুরু করেছিলেন। (নিয়াজী, ২০০৮; সালিক, ১৯৮৮; ফরমান আলী, ১৯৯২) এ ছিলো মার্কা-মারা পাকিস্তানী মনোভাব। অর্থাৎ তাঁরা ভারতীয় জুজুর ভয় দেখতে পেতেন সব জায়গাতে। সবকিছুকেই তাঁরা গণ্য করতেন 'হিন্দুস্তানের' ষড়যন্ত্র বলে। তাঁদের মতে, ডিসেম্বর মাস থেকেই ভারতীয়রা অনুপ্রবেশ করতে থাকে। এমন কি, ভারতীয়রা ডিসেম্বরের নির্বাচনে ভোটও দিয়ে যান।

এরই মধ্যে চৌঠা এপ্রিল পূর্ব রণাঙ্গনের বাঙালি কম্যান্ডাররা সিলেটের একটি চা-বাগানে মিলিত হন। এঁদের মধ্যে ছিলেন আবদুর রব, জিয়াউর রহমান, খালেদ মোশাররফ, সফিউল্লাহ, নুরুজ্জামান, নুরুল ইসলাম, মোমিন চৌধুরী এবং অন্য কেউ কেউ। এঁরা সবাই একজন নেতা খুঁজছিলেন। শেখ মুজিবের সামরিক উপদেষ্টা থাকলেও, ওসমানী তখনো মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেননি। তিনি গোঁফ কামিয়ে ঢাকা থেকে কুমিল্লায় এসে খালেদ-শাফায়াতের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন এর কদিন আগে। তিনি ছিলেন আওয়ামী লীগের নির্বাচিত সদস্য এবং সাবেক কর্নেল। শাফায়াত জামিল লিখেছেন, ঢাকা থেকে পালিয়ে এসে সেখানকার হতাহতদের কথা তিনি কিছু বলেননি। কিন্তু তাঁর পোষা কুকুর গুলিতে মারা যাওয়ায়, তা নিয়ে বারবার দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। সবচেয়ে প্রবীণ হওয়ায়, মেজররা ওসমানীকেই যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব নিতে অনুরোধ করেন। যুদ্ধের বাকি সময়টা তিনিই প্রধান সেনাপতি হিশেবে দায়িত্ব পালন করেন।

ভারতের আশ্রয়ে মুক্তিযুদ্ধ

২৬শে মার্চ না-হলেও, ২৭শে মার্চ থেকে সীমান্তবর্তী সাধারণ লোকেরা অনেকেই ভারতের মধ্যে ঢুকে পড়েন।—পশ্চিম বাংলা, আসাম এবং ত্রিপুরায়। বিশেষ করে, যে-হিন্দুদের ভারতে আত্মীয় এবং পরিচিতরা ছিলেন, তাঁরা। এপ্রিলের গোড়া থেকে অবশ্য পালাতে আরম্ভ করেন হিন্দু-মুসলমান সবাই। যাঁরা পালিয়ে যান, তাঁদের মধ্যে নারী-শিশু, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-গরিব সব ধরনের লোকই ছিলেন। প্রথমে হাজার হাজার, পরে লাখ লাখ লোক ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিতে থাকেন। এঁদের বলা হতো শরণার্থী, অর্থাৎ আশ্রয়প্রার্থী। ন মাস ধরে শরণার্থীদের যাওয়া কখনো বন্ধ হয়নি। শিশু-বৃদ্ধসহ কতো যে নরনারী পালিয়ে গিয়েছিলেন, তার কোনো ইয়ত্তা নেই। কতো লোক যে পথে মারা যান, নিহত হন, লুণ্ঠিত হন, ধর্ষিতা হন—তারও কোনো ইয়ত্তা নেই।

বিদেশের পত্রপত্রিকায় এপ্রিলের মাঝামাঝি পর্যন্ত গুরুত্ব পেয়েছিলো বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের অবস্থা কেমন, সেই খবর। কিন্তু এপ্রিলের পনেরো তারিখের পর যুদ্ধের খবর সামান্যই ছাপা হতো। বরং বাঙালিরা যে আর কোনো প্রতিরোধ সৃষ্টি করতে পারছেন না এবং পাকসেনারা তাঁদের দমন করে ফেলেছে, এটাই ছিলো তখনকার খবর।

তারপর যা সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হতো, তা শরণার্থীদের খবর। *গার্ডিয়ান* পত্রিকায় শরণার্থীদের প্রথম খবর প্রকাশিত হয় ৭ই এপ্রিল। তারপর ছবিসহ বড়ো করে খবর প্রকাশিত হয় ১৩ই এপ্রিল, *টাইমসে* ১৭ই, *অবজার্ভারে* ১৮ই। *ইভনিং স্ট্যান্ডার্ড* পত্রিকায় ২০শে এপ্রিলের সংবাদে বলা হয় ইতিমধ্যে ভারতে কমপক্ষে এক লাখ শরণার্থী প্রবেশ করেছেন। মোট কথা, এর পর প্রায় রোজই প্রকাশিত হয় শরণার্থী এবং তাঁদের দুঃসহ দুর্গতির খবর। মে মাসে গুরুত্ব পায় শরণার্থীদের মধ্যে ব্যাপকভাবে কলেরা ছড়িয়ে পড়ার কথা।

হাজার হাজার লোক যে কলেরায় মারা যাচ্ছিলেন তা পত্রিকাগুলোয় লেখা হয় সহানুভূতির সঙ্গে। বস্তুত, তখন বিদেশীদের দৃষ্টি এবং সহানুভূতি আকর্ষণ করেছিলো মুক্তিযুদ্ধ নয়, বরং শরণার্থীদের মানবিক সমস্যা। বিলেত থেকে যে-এমপিরা এবং অ্যামেরিকা থেকে যে-সিনেটররা আসেন, সে যুদ্ধের অবস্থা দেখতে নয়, শরণার্থীদের করুণ অবস্থা দেখতে। ২৮শে মে তারিখের *টাইমস* পত্রিকায় এমনও লেখা হয় যে, শরণার্থীদের এ রকম চাপ বজায় থাকলে ভারতের পক্ষে যুদ্ধ না-করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। এসব বিবেচনা করলে বলতে হয় যে, শরণার্থী সমস্যাই বাংলাদেশ সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহানুভূতি আকর্ষণ করতে সহায়তা করেছিলো।

বস্তুত, প্রত্যেক শরণার্থীরই বলার মতো একটা কাহিনী ছিলো। বয়স যাই হোক, যতো বৃদ্ধ, অথবা যতো শিশু হোক, সবাইকে হেঁটে যেতে হয়েছে। সেপ্টেম্বর মাসে এক বৃদ্ধা গিয়েছিলেন খুলনা-যশোরের দিক দিয়ে। সীমান্ত অতিক্রম করে যে-শিবিরে গেছেন, সেখানেই তাঁকে শুনতে হয়েছে—জায়গা নেই। এভাবে ক্রমে তিনি দেশের ভেতরে যেতে থাকেন। শেষে আশি মাইল হেঁটে এসে জায়গা পান, কলকাতার উপকণ্ঠে সল্ট লেইকের একটা নর্দমার বিশাল পাইপের মধ্যে। আশ্রয় মিলেছে—এই স্বস্তিতে অতঃপর তিনি হাঁপ ছেড়ে দেন। তারপর আর চোখ খোলেননি। (*স্টেটসম্যানে* বৃদ্ধার ছবিসহ তাঁর কাহিনী প্রকাশিত হয়েছিলো।) শরণার্থী শিবিরে নয়, তাঁর আশ্রয় মিললো একেবারে স্বর্গে। খুলনার

ভারত অভিমুখী শরণার্থী

কলকাতার শরণার্থী আশ্রয়শিবির

আর-এক বৃদ্ধার কথা জানি, যিনি ছিটকে পড়েছিলেন তাঁর পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে। আর কোনোদিন তাঁর সন্ধান পাওয়া যায়নি। মোট কথা, বন্যার ধারার মতো শরণার্থীরা যেতে থাকেন ভারতে এবং মে মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে তাঁদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৫ লাখে, আর যুদ্ধের শেষ দিকে নিরানব্বুই লাখে।

শরণার্থী ছাড়া, আওয়ামী লীগের নেতা এবং নির্বাচিত সদস্যরাও ভারতে পালিয়ে গিয়েছিলেন। পালিয়ে গিয়েছিলেন অসংখ্য বুদ্ধিজীবী। পরের দিকে যাঁরা যান, তাঁরা খানিকটা গুছিয়ে যেতে পেরেছিলেন। বেশ টাকাপয়সা নিয়ে তৈরি হয়ে গিয়েছিলেন। বিশেষ করে নির্বাচিত সদস্য এবং ধনী যাঁরা গিয়েছিলেন, তাঁরা কলকাতায় বেশ সুখেই ছিলেন। আমার এক পড়শি ছিলেন এমন একজন নির্বাচিত সদস্য। বেশ সচ্ছলতার মধ্যেই ছিলেন। কিন্তু প্রথম দিকে যাঁরা যান, তাঁরা গিয়েছিলেন প্রায় শূন্য হাতে। বিশিষ্ট শরণার্থীদের যেমন আশ্রয় দিয়েছিলো ভারত, তেমনি আশ্রয় দিয়েছিলো সাধারণ শরণার্থীদের। কেবল আশ্রয় নয়, ন মাস এই বিপুল সংখ্যক শরণার্থীর থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাও করতে হয়েছিলো ভারতকে। যে-শরণার্থীরা কারো কাছে আশ্রয় পেয়েছিলেন, তাঁরাও সরকারের কাছ থেকে পেয়েছিলেন রেশন কার্ড।

তবে বলা উচিত যে, কেবল বাঙালিদের প্রতি ভালোবাসাবশত ভারত সরকার তাঁদের আশ্রয় দেয়নি, অথবা তাঁদের হয়ে যুদ্ধ করেনি। ভারতেরও স্বার্থ ছিলো বৈকি! দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৮ বছরের মধ্যে পাকিস্তানের সঙ্গে তার দুবার যুদ্ধ হয়েছিলো। পাকিস্তানের দুটি অংশ থাকায়, ভারতের সীমান্তরেখা অনেক দীর্ঘ

হয়েছিলো। তা ছাড়া, আশঙ্কা ছিলো দুদিক থেকে আক্রান্ত হওয়ার। অপর পক্ষে, পাকিস্তান বিভক্ত হয়ে গেলে, সেটা ভারতের জন্যে মস্ত লাভের ব্যাপার। বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের জায়গায় বন্ধুত্বপূর্ণ একটা স্বাধীন দেশ গঠিত হলে, সেটা তার জন্যে একই সঙ্গে নিশ্চিন্ত এবং আনন্দিত হওয়ার কারণ হবে। এর ফলে, একদিকে, পাকিস্তান দুর্বল হয়ে যাবে কূটনৈতিক এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়ে; অন্যদিকে, পূর্ব সীমান্তে তার সৈন্য মোতায়েন করে রাখতে হবে না।

বাংলাদেশকে ভারতের সাহায্য দেওয়ার আর-একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ—আগেই বলেছি—শরণার্থী সমস্যা। এক কোটি লোককে আশ্রয় ও খাবার দেওয়ার জন্যে তার ব্যয় হচ্ছিলো শত শত কোটি টাকা। কেবল আর্থিক ক্ষতিই নয়, ভারতের পুব দিকের রাজ্যগুলোতে সামাজিক সমস্যাও তৈরি হয়েছিলো। তার ওপর, শরণার্থীদের আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন, যাঁরা ভারত সরকারের ওপর চাপ দিচ্ছিলেন বাংলাদেশকে সাহায্য দিতে। তাই এই সমস্যার দ্রুত সমাধানই ছিলো ভারতের জন্যে কাম্য। বলা যেতে পারে, ভারত সরকারকে সাহায্য দেবার জন্যে বাধ্য করেছিলেন এক কোটি শরণার্থী। পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ সমস্যাকে শরণার্থীরা আন্তর্জাতিক সমস্যায় পরিণত করতে এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহানুভূতি আকর্ষণ করতে সাহায্য করেছিলেন। ফলে পাকিস্তানের ওপর একটা বড়ো রকমের আন্তর্জাতিক চাপ তৈরি হয়েছিলো। মোট কথা, ভারত কিছুটা নিজের স্বার্থে, কিছুটা বাধ্য হয়েই বাংলাদেশকে স্বাধীন হতে সাহায্য করেছিলো।

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের পক্ষে বাংলাদেশে এই সহায়তা দেওয়া সম্ভব ছিলো না। কারণ, বাংলাদেশে কী ধরনের সরকার গঠিত হবে—সে সম্পর্কে ভারত তখন নিশ্চিত ছিলো না। সে সরকার যদি বন্ধুত্বপূর্ণ না-হয়, তা হলে তাকে সাহায্য দেওয়ার কোনো অর্থ হয় না। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় ভারত একটা সম্ভাব্য বিপদেরও আশঙ্কা করেছিলো। সে হলো: পশ্চিমবঙ্গও যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে যোগ দেয়, তা হলে সেটা হবে সমগ্র পূর্ব ভারতের জন্যেই একটা বিপদের হুমকি। এই যুক্তবঙ্গের সঙ্গে পরে আসামও যোগ দিতে পারে। পশ্চিমবঙ্গকে বাংলাদেশের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্যে ভারতের কোনো কোনো বামপন্থী দল পোস্টারও দিয়েছিলো যুদ্ধের প্রথম দিকে। (জিল্লুর, ১৯৮৪। স্বাধীনতাযুদ্ধের বিশ বছরেরও পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অশকশে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ সম্মেলনে সিরাজুল আলম খানকে এই যুক্তবঙ্গ-আসাম গঠনের পরিকল্পনার কথা বলতে শুনেছি।) তৃতীয়ত, গোলযোগ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারত পূর্ব পাকিস্তানে সৈন্য পাঠালে আন্তর্জাতিক সমাজে তার দুর্নাম হতো। তাকে বলা হতো: আক্রমণকারী এবং আগ্রাসী। এমন কি, বাংলাদেশের ভেতরেও বহু লোক সমস্ত ব্যাপারটাকেই ভারতের ষড়যন্ত্র বলে গণ্য

করতেন। কিন্তু ন মাস ধরে যুদ্ধ চলার ফলে এই সমস্যাগুলো ভারত অংশত কাটিয়ে উঠেছিলো। তা ছাড়া, ভারতের মস্ত বড়ো কৃতিত্ব এই যে, সে শরণার্থী সমস্যাকে কাজে লাগিয়ে সমস্ত বিষয়টাকেই আন্তর্জাতিক সমস্যায় পরিণত করতে পেরেছিলো। তা না-হলে, আগেই বলেছি, এটি বিবেচিত হতো পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ সমস্যা হিশেবে।

বস্তুত, যুদ্ধ যতোই দীর্ঘ হতে থাকে, আন্তর্জাতিক সমাজ ততোই পাকিস্তানী শাসনের সত্যিকার চেহারাটা বুঝতে পারে। এবং বাংলাদেশের পক্ষে একটা জনমত তৈরি হয়। কিভাবে এই আন্তর্জাতিক সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যায়, তার একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। এপ্রিল মাসের ১৩ তারিখ যেমন, চীনের প্রধানমন্ত্রী পাকিস্তানের পক্ষে জোরালো সমর্থন জানিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, বাইরের আক্রমণ থেকে পাকিস্তানকে রক্ষা করার জন্যে চীন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও ছিলো পাকিস্তানের বড়ো সমর্থনকারী। অন্যান্য দেশও একে পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ সমস্যা বলে চিহ্নিত করেছিলো। কিন্তু দীর্ঘ যুদ্ধের সময়ে বেশির ভাগ দেশই অনুভব করেছিলো যে, বাংলাদেশের আন্দোলন ছিলো ন্যায্য আন্দোলন। মনোভাবের এই বিবর্তন সত্ত্বেও ডিসেম্বরে যখন যুদ্ধ শুরু হয়, তখন নিরাপত্তা পরিষদে পাকিস্তানের সমর্থনে এগিয়ে এসেছিলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন। বাংলাদেশের পক্ষে ছিলো কেবল সোভিয়েত ইউনিয়ন আর তারই ব্লকের সদস্য পোল্যান্ড। মনোভাবের পরিবর্তন অবশ্য যুদ্ধের কোনো পর্যায়ে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোর হয়নি।

মানুষের কাঁধে বৃদ্ধা শরণার্থী

এই সম্ভাব্য শত্রুতার কথা বিবেচনা করেই, ভারতের প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে সমগ্র বিষয়টি পরিচালনা করেছিলেন। প্রথমত, তিনি পূর্ব পাকিস্তানের যুদ্ধের চরিত্রটি বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। তাজউদ্দীনের সঙ্গে দিল্লিতে তাঁর প্রথম আলাপ হয় চৌঠা এপ্রিল। তার আগেই অবশ্য তিনি তাঁর সচিব পি এন ধর এবং প্রিন্সিপ্যাল সেক্রেটারি পি এন হাকসারের কাছ থেকে খানিকটা ধারণা পেয়েছিলেন। এঁরা দুজনেই খবর পেয়েছিলেন রেহমান সোবহানের কাছ থেকে। তিনি তাজউদ্দীনের আগেই দিল্লিতে পৌঁছে গিয়েছিলেন এবং তাঁর বন্ধু অমর্ত্য সেনের মাধ্যমে তাঁদের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পেয়েছিলেন। (সোবহান, ১৯৯৪)

বাংলাদেশের নেতারা আশা করেছিলেন যে, ভারত প্রথমেই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবে। কিন্তু তখনো পর্যন্ত বাংলাদেশের কোনো সরকার গঠিত হয়নি। সে জন্যে প্রথমে স্বাধীনতার সনদ ঘোষণা করা হয় ১০ই এপ্রিল। এতে বাংলাদেশের নাম দেওয়া হয় 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ'। সরকারও গঠিত হয় একই দিনে। এই ঘোষণায় শেখ মুজিবকে বলা হয় রাষ্ট্রপতি। কিন্তু অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিশেবে থাকেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম। প্রধানমন্ত্রী হন তাজউদ্দীন আহমদ। আর, তাঁর সঙ্গে মন্ত্রী ছিলেন মনসুর আলী, কামরুজ্জামান এবং খন্দকার মোশতাক। এই ঘোষণার খবর প্রথমে আকাশবাণী শিলিগুড়ি কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়। তারপর প্রচারিত হয় আকাশবাণীর অন্যান্য কেন্দ্র থেকে। সাত দিন পরে বাংলাদেশের মেহেরপুরের মুক্তাঞ্চলে একটি গ্রাম—বৈদ্যনাথতলায়—এই নির্বাসিত সরকার শপথ গ্রহণ করে। এই জায়গার নাম দেওয়া হয় মুজিবনগর। পরের দিন কলকাতায় পাকিস্তানের ডেপুটি হাই কমিশনার হোসেন আলী বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেন। আনুগত্য ঘোষণা করেন তাঁর অন্য সহকর্মীরাও।

এর পর মুজিবনগর সরকার কলকাতায় বসেই দেশ পরিচালনা করেন। দেশ-পরিচালনার জন্যে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাও তৈরি করেন তাঁরা। এই সরকারে কেবল মন্ত্রী অথবা সহায়ক কর্মচারী ছিলেন না। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন বিশেষজ্ঞরা। যেমন, দেশের নাম-করা অর্থনীতিবিদরা। এঁদের মধ্যে ছিলেন আনিসুর রহমান, রেহমান সোবহান, মোশাররফ হোসেন, স্বদেশ বসু, সনৎ সাহা প্রমুখ। খান সারওয়ার মুরশিদ, মোজাফ্‌ফর আহমদ এবং আনিসুজ্জামানও পরিকল্পনা দপ্তরের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মওদুদ আহমদ এবং আমীর-উল ইসলামও বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। তখকার বহু জেলা ও মহকুমা প্রশাসক এই যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন এবং বেশির ভাগ মুজিবনগর সরকারের হয়ে কাজ করতেন। যুদ্ধের আগে অর্থনীতিবিদ নুরুল ইসলাম ছিলেন শেখ মুজিবের প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টা। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান। এ আর মল্লিকও বাংলাদেশ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। (বাংলাদেশ সরকারের বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন এইচ টি ইমাম, তাঁর *বাংলাদেশ সরকার ১৯৭১* [২০০৪] গ্রন্থে।)
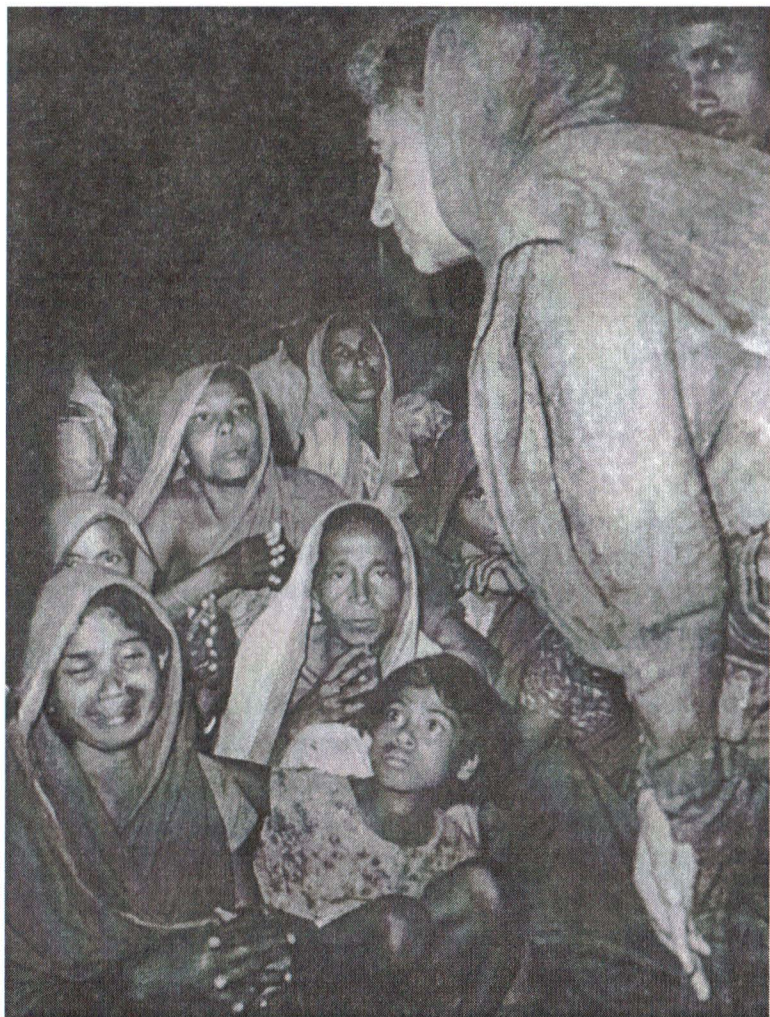
শরণার্থী শিবিরে ইন্দিরা গান্ধী

ওদিকে, নির্বাসিত সরকার গঠনের আগে থেকেই তার বিরোধিতা আরম্ভ হয়। এই বিরোধিতা করেন শেখ মুজিবের একান্তে অনুগত তরুণ নেতারা। তাঁদের মধ্যে শেখ ফজলুল হক মণিই ছিলেন সবচেয়ে প্রধান। তাঁরা যুক্তি দেখান যে, তাঁরাই মুজিবের সত্যিকার প্রতিনিধি। সুতরাং নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন প্রমুখের মন্ত্রিসভা গঠন করার কোনো বৈধতা নেই। সরকার গঠনের সময় থেকে দলাদলি শুরু হয় বাংলাদেশের অন্য রাজনীতিকদের মধ্যেও। অনেকে

তাজউদ্দীনকে অপছন্দ করতেন। তাঁরা মনে করতেন, তিনি ভারতপন্থী। অনেকে আবার নিজেদের গণ্য করতেন তাজউদ্দীনের প্রতিদ্বন্দ্বী হিশেবে। এঁদের মধ্যে ছিলেন বিশেষ করে খন্দকার মোশতাক এবং মুজিবের কয়েকজন স্বজন।

তদুপরি, অনেকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে দলীয়করণের চেষ্টা করেন। এই যুদ্ধ যে কেবল আওয়ামী লীগের—তাঁরা এটা দেখানোর জন্যে আগ্রহী ছিলেন। তাই বামপন্থী দলগুলোকে তাঁরা দূরে সরিয়ে রাখতে চেষ্টা করেন। চীনপন্থী ন্যাপের নেতা মওলানা ভাসানী কলকাতায় ছিলেন। কিন্তু তাঁকে এক প্রকার নিষ্ক্রিয় করে রাখা হয়। ভারত সরকারও তাঁকে বিশ্বাস করতো না। মস্কোপন্থী ন্যাপের নেতা মোজাফফর আহমদও কলকাতায় ছিলেন। কিন্তু তাঁকে বাংলাদেশ সরকারের তেমন কোনো কাজে প্রথম কয়েক মাস লাগানো হয়নি। কমিউনিস্ট পার্টির নেতা মণি সিংহকেও নয়।

এই দলীয়করণে ভারত সরকারও পরোক্ষভাবে জড়িয়ে পড়ে। যেমন, আশ্রয় শিবিরগুলো থেকে তরুণদের নিয়ে মুক্তি বাহিনী গড়ে তোলার নির্দেশ দিয়েছিলো ভারত সরকার। মুক্তি বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থাও করে ভারতের নিরাপত্তা বাহিনী। আবার, ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা 'র' ২০শে এপ্রিলই আওয়ামী লীগের কট্টর সমর্থকদের নিয়ে 'মুজিব বাহিনী' গঠন করে। এই বাহিনীর নেতা ছিলেন শেখ মণি, সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমদ, আবদুর রব এবং শাজাহান সিরাজ। ভিন্ন জায়গায় নিয়ে গিয়ে এই বাহিনীকে আলাদা করে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এবং একে রাখা হয় বাংলাদেশ সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। অর্থাৎ প্রথম থেকেই মুক্তি বাহিনীর মধ্যে বিভেদের বীজ রোপণ করা হয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে যেসব গ্রন্থ লেখা হয়েছে, তা থেকে এই বাহিনীর কোনো সক্রিয় ভূমিকার কথা জানা যায় না। এদের প্রধান কাজ ছিলো রাজনৈতিক অঙ্গনে। এই বাহিনীর যে-টুকু তৎপরতার কথা জানা যায়, তা নভেম্বর-ডিসেম্বরের যুদ্ধের সময়। তখন স্বাধীনতা একেবারে দোরগোড়ায় এসে গিয়েছিলো। সেই সময় মুজিব বাহিনীর সদস্যরা বিভিন্ন জায়গায় এসে যান। অন্য কারো হাতে যাতে ক্ষমতা চলে না-যায়, সেটাই ছিলো তাঁদের তখনকার ভূমিকা।

ওদিকে, মুক্তি বাহিনীর সেক্টর কম্যান্ডরা চাইছিলেন শক্তসমর্থ এবং উপযুক্ত দেখে মুক্তিযোদ্ধা রিক্রুট করতে। দলীয় রাজনীতির সঙ্গে তাঁরা জড়িত ছিলেন না। এ রকমের শক্তসমর্থ, সাহসী এবং উৎসাহী হাজার হাজার তরুণ যুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন যুবা শিবিরগুলোতে। এমন কি, দশ বছরের বালকও যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলো। এই হবু যোদ্ধাদের সঙ্গে তাঁদের পরিবার ছিলো না। দেশ দ্রুত স্বাধীন করে তাঁরা দেশে ফেরার জন্যে উদ্‌গ্রীব ছিলেন। কিন্তু প্রশিক্ষণের জন্যে তরুণদের বেছে নেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয় আওয়ামী লীগের

তাজউদ্দীন। মুক্তিযুদ্ধে যাঁর নেতৃত্ব অতুলনীয়। একই সঙ্গে যাঁর লড়তে হয়েছিলো নানা ফ্রন্টে

নির্বাচিত সদস্যদের। কোনো কোনো জায়গায় মুজিব বাহিনীর নেতাদের। তাঁরা নিরপেক্ষভাবে বিচার না-করে বিশেষ করে আওয়ামী লীগের সমর্থকদের বেছে নেন ট্রেনিং দেওয়ার জন্যে। তাঁরা যদি জানতেন যে, কেউ, ধরা যাক, ছাত্র ইউনিয়নের সদস্য, তা হলে তাকে ট্রেনিংয়ের জন্যে সুপারিশ করতেন না। (রফিক, ১৯৮৬) তা ছাড়া, এর কিছুকাল পরে নির্বাচিত আওয়ামী সদস্যদের সেক্টর কম্যান্ডারদেরও এক ধাপ উঁচুতে বসানো হয়। (অ্যান্টনি, ১৯৮৬)

এই দলীয় বিবেচনা দেখে সেক্টর কম্যান্ডাররা বিরক্ত হন। (রফিক, ১৯৮৬) তাই তাঁরা বহু জায়গায় নিজেরাই উৎসাহী তরুণদের ট্রেনিং দিয়েছিলেন। এ রকমের একজন সেক্টর কম্যান্ডার ছিলেন খালেদ মোশাররফ। ঢাকা থেকে যে-ছাত্ররা পালিয়ে গিয়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেবার জন্যে, তাঁরা অনেকেই ছিলেন খালেদের কাছে ট্রেনিং-প্রাপ্ত। এঁদের মধ্যে বদি, স্বপন, জুয়েল, রুমী প্রমুখ বিখ্যাত 'বিচ্ছু' ছিলেন। (ইমাম, ১৯৮৬) সেক্টর কম্যান্ডার তাহেরও অনেককে ট্রেনিং দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে তাঁর নিজের একাধিক ভাইও ছিলেন। পাছে তাঁদের রিক্রুট করা না-হয়, সে জন্যে ছাত্র ইউনিয়নের বহু সদস্য আবার নিজেদের সত্যিকার পরিচয় গোপন রেখে মুক্তি বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। (মুজাহিদুল

ইসলাম সেলিমের সাক্ষাৎকার, ২৮. ৯. ২০০৯) মস্কোপন্থী ছাত্র ইউনিয়ন মেঘালয়ে আলাদা ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলো। কিন্তু দলীয়করণের ফলে বাংলাদেশের নামে তাবৎ বাঙালি যে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন—সেই স্পিরিটকে ধ্বংস করার চেষ্টা চলে।

যুদ্ধে যোগ দেবার জন্যে তরুণদের মধ্যে (এমন কি, বহু তরুণীর মধ্যেও) যে-প্রবল উৎসাহ দেখা গিয়েছিলো, সেক্টর কম্যান্ডার আবু তাহেরের মতে, তার কোনো তুলনা ছিলো না। 'রিক্রুটিং সেন্টারে লাইন দেখে আমি বুঝেছি এ যোদ্ধারা জয়ী হবেই। কারণ পৃথিবীতে এমন স্বতঃস্ফূর্তভাবে যুদ্ধে যোগ দেয়ার দৃষ্টান্ত আর নেই। গণচীন থেকে শুরু করে ইন্দোচীনের স্বাধীনতাযুদ্ধ, কোনোটাই বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের মতো এ দৃষ্টান্ত রাখতে পারেনি। চীন, ভিয়েতনাম, কিউবাতে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত হয়েছে, ব্যাপক রাজনৈতিক ও সামরিক প্রস্তুতির সঙ্গে। সম্পূর্ণরূপে রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃত্ব ছাড়া বাংলার তরুণরা যেভাবে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে তার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর কোনো মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে নেই।' (তাহের [কবির, ২০০৫])

তবে যাঁরা ট্রেনিং নিয়েছিলেন, তাঁরাই যুদ্ধ করতে সমান উৎসাহী হয়েছিলেন, এটা বলা মুশকিল। যেমন, মুজিব বাহিনীর সদস্যরা। এ কথা কতো দূর নির্ভরযোগ্য, আমার জানা নেই, কিন্তু এ রকম একটি অনীহার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন সেক্টর কম্যান্ডার কাজী নূর-উজজামান। সঠিক হলে, এটি প্রশংসনীয় ছিলো না। তিনি লিখেছেন যে, শেখ কামালকে যুদ্ধে যোগ দেওয়া জন্যে তিনি উৎসাহ দিয়েছিলেন। কিন্তু ওসমানী তাঁকে নিজের সহকারী হিশেবে কলকাতাতেই রাখতে চাইছিলেন। নূর-উজজামানের উৎসাহে যুদ্ধে যোগ দিতে মোটামুটি রাজি হলেও

১৭ই এপ্রিল মুজিব নগরে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান শেষে বক্তৃতা করছেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম

শেখ কামাল শেষ পর্যন্ত যোগ দেননি। এ নিয়ে নূর-উজজামান দুঃখ করে লিখেছেন, 'সেদিন যদি কামাল আমার সঙ্গে যেতো, ও যদি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতো, তা হলে শেখ মুজিব দেশে আসার পর অন্যের মুখ থেকে তাঁকে মুক্তিযুদ্ধ ও যোদ্ধাদের কথা শোনার প্রয়োজন হতো না। নিজের ছেলের কাছ থেকেই মুক্তিযুদ্ধের ত্যাগ, তিতিক্ষা ও যন্ত্রণার কথা জেনে তিনি তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারতেন। এ ছাড়া, মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী ছেলেদের মধ্যে যে চারিত্রিক সততা এবং দেশপ্রেম তখন জন্মেছিলো, তারও অংশীদার হতো শেখ কামাল।' (কাজী নূর-উজজামান [কবির, ২০০৫])

শরণার্থী শিবিরে যে-উদ্বাস্তরা আশ্রয় নিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যেও যুদ্ধে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে উৎসাহের অভাব দেখা গিয়েছিলো। কারণ, তাঁরা বেশির ভাগই গিয়েছিলেন সপরিবারে। দেশে ফেরার আগ্রহ তাঁদের ছিলো তুলনামূলকভাবে কম। অপর পক্ষে, যে-শিক্ষিত তরুণরা অথবা যে-চাষী ও শ্রমিকরা যুদ্ধ করার জন্যেই সীমান্ত অতিক্রম করেছিলেন, তাঁরা চেয়েছিলেন যতো দূর সম্ভব অল্প সময়ের মধ্যে দেশকে স্বাধীন করতে। মোট কথা, সবার মধ্যে মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণের ইচ্ছা সমান প্রবল ছিলো না।

খোদ বাংলাদেশ সরকারের মধ্যেও বেশ দলীয় কোন্দল চলছিলো। তাজউদ্দীন প্রধানমন্ত্রী হওয়ায় খন্দকার মোশতাকের মতো মার্কিন ও পাকিস্তান-পন্থীরা খুশি ছিলেন না। তা ছাড়া, অনেকের কাছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ছিলো পরোক্ষ বিষয়। মুখ্য বিষয়টা ছিলো কিভাবে নিজেরা আরও বড়ো পদ পেতে পারেন। এরই ধান্ধায় এঁরা দল পাকাচ্ছিলেন। এক দল বলছিলেন যে, শেখ মুজিবের মুক্তি দেশের স্বাধীনতার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এ ছাড়া, নির্বাচিত সদস্যদের অনেকে কলকাতার বাইরে আশ্রয় শিবিরগুলোতে কখনো যাননি। বরং কলকাতায় বিলাসিতার মধ্যে সময় কাটিয়েছেন। আবার তাজউদ্দীনের মতো লোকও ছিলেন, যাঁরা অত্যন্ত মিতব্যয়ী এবং সৎ জীবন যাপন করেন।

৬ ও ৭ই জুলাই শিলিগুড়িতে বাংলাদেশের নির্বাচিত সদস্যদের একটি জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়। এখানে তাজউদ্দীনের প্রতি বিরোধিতা বেশ পরিষ্কার হয়ে ওঠে। খন্দকার মোশতাক তো ছিলেনই, তার ওপর মিজানুর রহমান চৌধুরী প্রকাশ্যে তাজউদ্দীনের পদত্যাগ দাবি করেন। আবদুর রব সেরনিয়াবাত, শেখ আবদুল আজিজ প্রমুখ সদস্যও তাজউদ্দীন বিরোধী ছিলেন। জুলাই মাসের এই অধিবেশনের পরই তাজউদ্দীনের প্রতি বিরোধিতা থেমে গেলো না। বরং তা চলতে থাকলো পুরো দমে। সেক্টর ৯ অর্থাৎ খুলনা-বরিশাল-ফরিদপুরের ৪০ জন নির্বাচিত সদস্য তাজউদ্দীনের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব দেন। তারপর এগারোই সেপ্টেম্বর জাতীয় পরিষদের সদস্য এনায়েত হোসেনের সভাপতিত্বে খন্দকার মোশতাক, শেখ মণি, আবদুর রব সেরনিয়াবাত, শেখ আজিজ প্রমুখ এক সভায়

তাজউদ্দীনকে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে অপসারণের সিদ্ধান্ত নেন। এমন কি, এঁরা তাজউদ্দীনকে আওয়ামী লীগের সদস্য পদ থেকে বহিষ্কার করারও দাবি জানান আওয়ামী লীগ হাই কম্যান্ডের কাছে। (মঈদুল, ১৯৯২; হাবিবুর, ২০০৮) তাজউদ্দীনের বিরুদ্ধে অনেক অপপ্রচারও চালিয়েছিলেন এঁরা।

সরকার এবং নির্বাচিত সদস্যরা ছাড়া, শেখ মণির পরিচালনায় মুজিব বাহিনীও রীতিমতো তাজউদ্দীন বিরোধী ভূমিকা পালন করতো। ভারতীয় গোয়েন্দা বাহিনীর সমর্থনপুষ্ট এই মুজিব বাহিনী ছিলো প্রবল শক্তিশালী। সৈয়দ নজরুল ইসলামের এক পুত্রও এঁর সদস্য ছিলেন। অক্টোবর মাসে মুজিব বাহিনীর এক সদস্য পিস্তল নিয়ে তাজউদ্দীনের ঘরে ঢুকে পড়ে। সে স্বীকার করে যে, নেতাদের নির্দেশে সে প্রধানমন্ত্রীকে হত্যা করতে এসেছিলো। (মঈদুল, ১৯৯২) প্রকৃত পক্ষে, একজন সাধারণ পর্যবেক্ষক প্রশ্ন করতে পারেন যে, মুজিব বাহিনীর ইতিবাচক ভূমিকা তখন কী ছিলো। এর জবাবে মুক্তিযুদ্ধে তাদের উল্লেখযোগ্য কোনো অবদানের কথা বলা মুশকিল। কিন্তু, আগেই বলেছি, ডিসেম্বরের যুদ্ধের শেষ দিকে মুজিব বাহিনীর অনেক সদস্য বিভিন্ন এলাকায় এসে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে আরম্ভ করেন। অনেকের মতে, তাঁরা এই সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে আরম্ভ করেন কৃতিত্ব দাবি এবং ক্ষমতা দখল করার জন্যে।

অনেকের দৃষ্টিতে ভারতপন্থী ছাড়াও, তাজউদ্দীন ছিলেন রুশ-পন্থী। এ-ও আওয়ামী লীগ-সমর্থকরা ভালো চোখে দেখতেন না। এ ছাড়া, আওয়ামী লীগের সদস্য না-হলেও তিনি যে দলমত-নির্বিশেষে যোগ্য লোকেদের প্রশাসন এবং পরিকল্পনা দপ্তরে নিয়োগ দিয়েছিলেন, মুজিব বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা তারও সমালোচনা করতেন। (মঈদুল, ১৯৯২) একটি নির্বাসিত সরকারের প্রধানমন্ত্রীর এই নগ্ন বিরোধিতা মুক্তিযুদ্ধকে আদৌ সহায়তা করেনি।

ভারত সরকার এবং বাংলাদেশের রাজনীতিকদের আচরণ যেমনই হোক, এই যুদ্ধের প্রতি ভারতের সাধারণ মানুষদের মনোভাব ছিলো সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরা শরণার্থীদের সাহায্য করেছিলেন মুক্ত হাতে। বাড়িতে থাকতে দিয়েছিলেন; খেতে দিয়েছিলেন। কেবল আত্মীয়দেরই তাঁরা আশ্রয় দেননি। অপরিচিত লাখ-লাখ মানুষকেও তাঁরা যথাসাধ্য সাহায্য করেছিলেন। বিশেষ করে যাঁদের এক কালে বাড়ি ছিলো পূর্ববাংলায়, অর্থাৎ যাঁদের বলা হতো 'বাঙাল', সেই বাঙালরা এই যুদ্ধকে নিজেদের যুদ্ধ বলে বিবেচনা করেন। তবে খোদ পশ্চিম বাংলার লোকেরা, যাঁদের বলা হয় ঘটি—তাঁরাও অকৃপণভাবে সাহায্য দিয়েছিলেন। এ রকমের পশ্চিম বাংলার একটি পরিবারকে জানি, যে-পরিবার বাংলাদেশের ২২ জন লোককে আশ্রয় দিয়েছিলেন।

যাঁদের কাছ থেকে সহযোগিতা পাওয়া যায়নি, তাঁরা হলেন বিহারী এবং পশ্চিম বাংলার বেশির ভাগ মুসলমান। পাকিস্তান ভেঙে যাওয়ায় তাঁরা দুঃখ

পেয়েছিলেন। এ ছাড়া, সাহায্য করেননি, তখনকার কট্টর চীন-সমর্থক কমিউনিস্টরা। পিকিং রেডিও থেকে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এবং পাকিস্তানের পক্ষে নিয়মিত প্রচার চালানো হতো। এই কমিউনিস্টরা পিকিং বেতারের কথাকেই কোরানের বাণীর মতো অবশ্য পালনীয় বলে গণ্য করতেন। এপ্রিলের মাঝামাঝি কলকাতায় একটি সভায় বক্তৃতা করতে গিয়ে লক্ষ করেছিলাম, এই অন্ধ ভক্তদের চীনের প্রতি আনুগত্য কতো প্রবল ছিলো। এ ছাড়া, মাও-লেনিনপন্থী কমিউনিস্ট আন্দোলনকারী নকশালরাও বাংলাদেশের তীব্র বিরোধিতা করেছিলো। *টাইমস* পত্রিকার ২৪শে এপ্রিলের সংখ্যায় নকশালদের বিরোধিতার খবর প্রকাশিত হয়েছিলো।

সাধারণ বাঙালিরা ছাড়া, কলকাতার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান শরণার্থীদের সাহায্য করতে চেষ্টা করেছিলো। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যেমন একটি সহায়ক সমিতি

আবু সাঈদ চৌধুরী

নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনসার্টে গান গাইছেন তরুণ জর্জ হ্যারিসন। এবং সেতার বাজাচ্ছেন রবীশংকর

গড়ে তোলে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের জন্যে। বহু অধ্যাপক এতে স্বেচ্ছাসেবক হিশেবে কাজ করেন। কিভাবে, বাংলাদেশ থেকে আসা বুদ্ধিজীবীদের সাহায্য করা যায়, তার জন্যে তাঁরা ছিলেন তৎপর। মৈত্রেয়ী দেবী, গৌরী আইয়ুব এবং জাস্টিস মাসুদের মতো সমাজসেবীও এগিয়ে আসেন শরণার্থীদের সাহায্য করার জন্যে। মৈত্রেয়ী দেবী এবং গৌরী আইয়ুব—দু জনেরই শারীরিক অক্ষমতা ছিলো। তা সত্ত্বেও তাঁরা শরণার্থী শিবিরে গিয়ে কলেরার রোগীদের সেবা করতেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের কয়েকজন অধ্যাপককে অস্থায়ী চাকরি দিয়েছিলো। চাকরি দিয়েছিলো ভারতীয় পরিসংখ্যান ইনস্টিটিউট, আইআইটি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান। *আনন্দবাজার* গ্রুপ এ সময়ে বাংলাদেশের পক্ষে জনমত তৈরি করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলো। বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের লেখারও সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছিলো এই পত্রিকা গোষ্ঠী।

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থাও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলো। শরণার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা দুই কিস্তিতে আইসিআরসি-র কাছ থেকে এগারো শো টাকা করে পেয়েছিলেন। তখন তাঁরা এই টাকাকেই বিরাট সাহায্য বলে বিবেচনা করেছেন। কেবল বুদ্ধিজীবীদের নয়, সাধারণভাবে সকল শরণার্থীদেরই সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলো অক্সফাম, সেইভ দ্য চিলড্রেন ইত্যাদি আন্তর্জাতিক দাতব্য প্রতিষ্ঠান।

সাহায্যের জন্যে আরও এগিয়ে এসেছিলেন ব্রিটিশ এমপি এবং মার্কিন সিনেটররা। তাঁরা বহু শরণার্থী শিবির দেখে গিয়ে নিজের নিজের সরকারকে প্রভাবিত করতে চেষ্টা করেন। সংবাদমাধ্যমের কাছে বাংলাদেশের পক্ষে নিজেদের মতামত দিয়েও তাঁরা দেশবাসীকে প্রভাবিত করেন। ব্রিটেন, অ্যামেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, হল্যান্ড ইত্যাদি দেশ থেকে আসেন প্রচুর সাংবাদিক। তাঁরা শরণার্থীদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। তাঁদের সংবাদ পরিবেশনার ফলেও আন্তর্জাতিক সমাজে বাংলাদেশের প্রতি অনুকূল মতামত গড়ে ওঠে। এমন কি, বাংলাদেশের ভেতরেও বিবিসি, অস্ট্রেলিয়া রেডিও ইত্যাদি শোনার জন্যে লোকেরা উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতেন। এসব সংবাদ শুনে হতাশার মধ্যে স্বপ্ন দেখতেন তাঁরা। এ ছাড়া, কোনো কোনো দেশ থেকে শরণার্থীদের জন্যে আসে খাদ্য, কাপড়-চোপড় এবং অন্যান্য ত্রাণ সাহায্য। অর্থ সাহায্যও আসে। হল্যান্ড থেকে ত্রাণ সামগ্রী এসেছিলো সম্ভবত সবার আগে।

যুদ্ধের দ্বিতীয় ভাগে ফ্রান্সের প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী এবং মুক্তিযোদ্ধা আঁদ্রে মার্লো বাংলাদেশের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেন। বৃদ্ধ হয়েও তিনি নিজে একটি মুক্তিযোদ্ধার দল গঠন করে এই যুদ্ধে যোগ দেওয়ার সংকল্প প্রকাশ করেন। জর্জ হ্যারিসন-সহ জনপ্রিয় বীটল সঙ্গীত-গোষ্ঠী—বীটলরা ছিলেন তখন জনপ্রিয়তার শীর্ষে। তাঁরা নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশের জন্যে কনসার্ট করে অর্থ সংগ্রহ

করেছিলেন। এ ছাড়া, রবি শঙ্কর, আলী আকবর, নির্মলেন্দু চৌধুরী, সবিতাব্রত দত্ত, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, দেবব্রত বিশ্বাস-সহ পশ্চিমবঙ্গের অসংখ্য শিল্পী বাংলাদেশকে সাহায্য করেন অকাতরে। এভাবেই বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহানুভূতি আকর্ষণ করে।

বাংলাদেশের ভেতরে প্রচার চালানোর জন্যে কলকাতায় একটি বেতার কেন্দ্রও স্থাপন করা হয় মে মাসে। এর নাম ছিলো স্বাধীন বাংলা বেতার। এই বেতার থেকে যেসব খবর এবং কথিকা প্রচারিত হতো, তা শুনে বাংলাদেশের ভেতরে সাধারণ মানুষরা জানতে পেতেন কোথায় কী হচ্ছে। এবং তা থেকে তাঁরা মনোবল সঞ্চয় করতেন। এই বেতার থেকে প্রচারিত খবর এবং এম আর আখতার মুকুলের 'চরমপত্র' নামে একটি ব্যঙ্গাত্মক কথিকা বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলো। তা ছাড়া, বাংলাদেশের বহু বুদ্ধিজীবী পশ্চিম বাংলার পত্রপত্রিকায় লিখে বাংলাদেশের পক্ষে সেখানকার জনগণের মধ্যে সহানুভূতি সৃষ্টি করেছিলেন।

বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে রেহমান সোবহানের নাম বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে দিল্লিতে তাজউদ্দীনের সঙ্গে কথা বলার পর, তিনি প্রথমে যান লন্ডনে। সেখানে লেবার দলের এমপিদের সামনে বক্তৃতা করেন। তা ছাড়া, আলাদাভাবে দেখা করেন কনসারভেটিভ দলের এমপি এবং একাধিক মন্ত্রীর সঙ্গে। লন্ডন থেকে তিনি যান ওয়াশিংটনে। সেখানে তিনি টেড কেনেডি-সহ বেশ কয়েকজন সিনেটরের সঙ্গে বাংলাদেশের সত্যিকার অবস্থা নিয়ে আলোচনা করেন। সংবাদ-মাধ্যমের কাছেও বাংলাদেশের বিস্তারিত বিবরণ দেন তিনি। জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে লন্ডনের *গার্ডিয়ান* পত্রিকায় বাংলাদেশ সম্পর্কে তাঁর দুটি লেখাও প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া, তিনি অ্যামেরিকায় টেলিভিশনে সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন। (সোবহান, ১৯৯৪) অর্থনীতিবিদ নুরুল ইসলামও তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছে গিয়েছিলেন। তিনিও বাংলাদেশের পক্ষে মতামত গঠনে ভূমিকা রাখেন।

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিলেতে বসবাসকারী বাঙালিরা পাকিস্তান হাই কমিশনের সামনে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরের দিনই—২৬শে মার্চ। পরের দিনের *গার্ডিয়ান* পত্রিকায় এ খবর ছবিসহ প্রকাশিত হয়েছিলো। এ সময় বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ছিলেন লন্ডনে। তিনি ঘোষণা দিয়ে এপ্রিলের গোড়াতেই কাজ করতে শুরু করেন বাংলাদেশের পক্ষে। মুজিবনগর তাঁর সমর্থনের কথা জানতে পেরে তাঁকে লন্ডনে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিশেবে নিয়োগ করে এপ্রিল মাসের তৃতীয় সপ্তাহে। এর পর সরকারীভাবেই তিনি ব্রিটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী-সহ সরকারের বহু প্রভাবশালী সদস্যের সঙ্গে দেখা করে বাংলাদেশের সত্যিকার অবস্থার কথা জানান। পরে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে সেখানেও বাংলাদেশের প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরেন। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সামনেও তিনি বাংলাদেশের অবস্থা সম্পর্কে সদস্যদের অবহিত করেছিলেন। তা ছাড়া, তিনি

ঘুরে বেড়ান ইউরোপের প্রধান দেশগুলোতে। সরকার এবং কূটনীতিকদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে তিনি বাংলাদেশের জন্যে ব্যাপক সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ করেন। বাঙালি কূটনীতিকরা যাতে পাকিস্তানের বদলে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেন এবং বাংলাদেশের পক্ষে কাজ করেন, তার জন্যেও তিনি কার্যকর ভূমিকা পালন করেন। (চৌধুরী, ১৯৯২)

এম আর আখতার মুকুল। স্বাধীন বাংলা বেতারের সকল শ্রোতাকে যাঁর চরমপত্র উদ্বুদ্ধ করতো
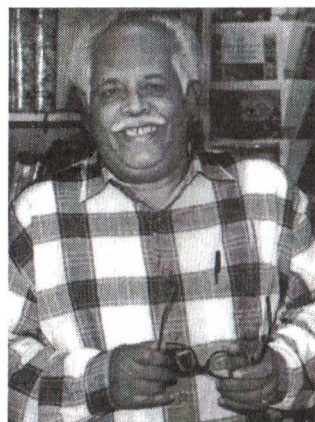
আবু সাঈদ চৌধুরীর সঙ্গে বিলেতের বাঙালি সমাজ ব্যাপক সাহায্য ও সহযোগিতা করেছিলো। কেবল টাকাপয়সা দিয়ে নয়, নানাভাবে। তাঁদের টাকা দিয়ে ত্রাণ সামগ্রী এবং অস্ত্রশস্ত্রও কেনা হয়েছিলো। বিলেত থেকে দুজন ডাক্তারও জুন মাসে এসে সিলেটে খালেদ মোশাররফ-চালিত মুক্তিবাহিনীর এক ফিল্ড হসপিটালে যোগ দেন। ব্রিটিশ সরকারের সমর্থন আদায়ের জন্যেও দেড় লাখ বাঙালি তখন আন্দোলন করেছিলেন। (চৌধুরী, ১৯৯২; মতিন, ১৯৮৯)

বাঙালি গায়ক, বাদক-সহ শিল্পীরা যাঁরা ভারতে পালিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁরাও মুক্তিযুদ্ধে বড়ো একটা ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁরা বাংলাদেশ সম্পর্কে কেবল ভারতে অনুকূল জনমত সৃষ্টি করেননি, বরং সীমান্ত এলাকায় ঘুরে ঘুরে মুক্তিযোদ্ধাদের উৎসাহিত করেন। 'মুক্তির গান' ডকুমেন্টারিতে এ রকম এক দল নিবেদিতপ্রাণ গায়ক-গায়িকাকে দেখতে পাই। গায়ক-গায়িকাদের সংগঠিত করার ব্যাপারে ওয়াহিদুল হক একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছিলেন স্বাধীন বাংলা বেতারের শিল্পীরাও। তাঁদের গান কেবল সীমান্ত অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিলো না, বরং তা দেশের অভ্যন্তরে যাঁরা নির্বাসিতের মতো জীবন যাপন করছিলেন, তাঁদের মুষড়ে-পড়া মনকেও চাঙ্গা করে তুলেছিলো। নিরাশার মধ্যে তাঁরা আশার আলো জাগিয়ে রেখেছিলেন। এমন কি, বাংলাদেশের খেলোয়াড়রাও ফুটবল দল গঠন করেছিলেন। বস্তুত, সবাই কমবেশি অবদান রেখেছিলেন দেশকে স্বাধীন করার ব্যাপারে।

শরণার্থী প্রসঙ্গে আরও একটা কথা না-বললে অন্যায় করা হবে। অনেকে শেষ পর্যন্ত ভারতে পালিয়ে যেতে পারেননি, পারিবারিক কারণে এবং সুযোগের অভাবে। কিন্তু তাঁরা দেশের মধ্যে অন্যত্র পালিয়ে গিয়ে শরণার্থী হয়েছিলেন। এ রকম গৃহহীন ব্যক্তিদের সংখ্যা অন্তত বিশ লাখ ছিলো বলে কেউ কেউ অনুমান

করেছেন। এঁরাও অনেকে দুঃসহ যন্ত্রণার মধ্যে যুদ্ধের ন মাস কাটিয়েছিলেন। হয়তো শরণার্থীদের মতো তাঁদের খাওয়া-দাওয়ায় অতোটা কষ্ট করতে হয়নি। কিন্তু সৈন্যদের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে শরণার্থীদের যে জীবনের নিরাপত্তা দেখা দিয়েছিলো, দেশের ভেতরে গৃহহীনদের সে নিরাপত্তা ছিলো না। কেবল প্রাণের ভয় নয়, লুণ্ঠন এবং মেয়েদের ধর্ষিত হওয়ারও দারুণ ঝুঁকি ছিলো।

যাঁদের নিজেদের বাড়ি ছেড়ে পালাতে হয়নি, তাঁদের জীবনেরও কোনো নিরাপত্তা ছিলো না। সব সময়েই তাঁদের তটস্থ হয়ে থাকতে হতো। (মা. কবির, ১৯৭২) তাঁদের তরুণ সন্তানরাই অনেকে ভারতে পালিয়ে গিয়ে ট্রেনিং নিয়ে মুক্তিযোদ্ধা হয়েছিলেন। বাবা-মা তাঁদের উৎসাহ দিয়েছেন। সাহায্য করেছেন। এমন কি, দরাজভাবে সাহায্য করেছেন অন্য মুক্তিযোদ্ধাদের। অল্প সংখ্যক পাকিস্তান-প্রেমী এবং দালাল ছাড়া, সবাই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। বহু ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন।

সংগঠিত যুদ্ধ
মুক্তিযুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায়

মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ বেশি ছিলো না। কিন্তু সেটা তাঁরা পুষিয়ে নিয়েছিলেন উৎসাহ এবং মনোবল দিয়ে। দেশের এক-একটা জায়গায় বিচ্ছিন্নভাবে যুদ্ধ করছিলেন তাঁরা। কোথাও কোথাও অসাধারণ সাফল্যও লাভ করেছেন। তা সত্ত্বেও এই যুদ্ধের সবচেয়ে দুর্বল দিক ছিলো সমন্বয়ের অভাব। ফলে এপ্রিলের দ্বিতীয় ভাগ থেকে যুদ্ধ খানিকটা থিতিয়ে গিয়েছিলো। কলকাতায় বসে সদ্য-গঠিত বাংলাদেশ সরকারও এ বিষয়ে কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নিতে পারেনি। তখন সরকারের প্রধান দৃষ্টি ছিলো রাজনৈতিক বিষয়ের দিকে। এগারোই এপ্রিল কর্নেল ওসমানীকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিলো যুদ্ধ পরিচালনার। কিন্তু একজন বয়স্ক লোক হিশেবে এতে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো ক্ষমতা তাঁর ছিলো কিনা, তা সন্দেহের বিষয়। অন্তত, এর জন্যে যে-তারুণ্যের দরকার ছিলো, তা ছিলো না তাঁর। এ পর্যায়ে মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলাবারুদও প্রায় ফুরিয়ে গিয়েছিলো। তার জন্যে পুরোপুরি নির্ভর করতে হচ্ছিলো ভারতের নিরাপত্তা বাহিনীর ওপর। মনে হয় না, সে সময়ে ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর মধ্যেও এ সম্পর্কে যথেষ্ট পরিকল্পনা এবং সমন্বয় ছিলো। ভারতের সরকারী নীতিও সুস্পষ্ট রূপ নেয়নি সে পর্যায়ে।

কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের সাফল্যের জন্যে সমন্বয় যে অত্যাবশ্যক ছিলো—এটা মুক্তিযোদ্ধারা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছিলেন। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে সিলেটের চা-বাগানে তাঁরা যে-পরিকল্পনা করেছিলেন, তা-ই যথেষ্ট ছিলো না। শেষ পর্যন্ত সমন্বয় করার জন্যে বাংলাদেশ সরকার কলকাতায় সেক্টর কম্যান্ডারদের বৈঠক ডাকে এগারোই জুলাই—মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার সাড়ে তিন মাস পরে। এই বৈঠকে বাংলাদেশকে মোট এগারোটি সেক্টরে ভাগ করা হয়। নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় প্রতিটি সেক্টরের সীমানা। সেক্টরগুলোকে আবার ভাগ করা হয় সাব-সেক্টরে।

সেক্টর কম্যান্ডার এবং তাঁদের সহকারীদেরও ঠিক করে দেওয়া হয়। এ ছাড়া, মুক্তিযোদ্ধাদের বিভক্ত করা হয় দু ভাগে। নিয়মিত বাহিনী বলা হয় বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের। এঁদের মধ্যে বেশির ভাগই ছিলেন ইপিআর-এর সদস্য। আর ছিলেন সেনাবাহিনী এবং পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা। সংক্ষিপ্ত ট্রেনিংপ্রাপ্ত বেসামরিক যুবকদের বলা হয় গণবাহিনী বা গেরিলা বাহিনী। গণবাহিনীতেই ছিলেন বেশির ভাগ মুক্তিযোদ্ধা।

এক-একটা সেক্টরে নিয়মিত বাহিনী আর গণবাহিনীর অনুপাত কেমন ছিলো, তার একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় ১ নম্বর সেক্টর দিয়ে। এই সেক্টরকে ভাগ করা হয় পাঁচটি সাব-সেক্টরে। ঠিক হয় যে, এতে ইপিআর-এর সদস্য থাকবেন দেড় হাজার, পুলিশ থাকবেন দু শো এবং সেনাবাহিনীর সদস্য থাকবেন তিন শো—এই মোট দু হাজার। আর গণবাহিনী অর্থাৎ গেরিলা সদস্য থাকবেন বিশ হাজার। এ রকমের এগারোটি সেক্টর ছাড়া, পরে একাধিক সেক্টর নিয়ে আলাদা তিনটি 'ফোর্স'ও গঠন করা হয় জিয়াউর রহমান, খালেদ মোশাররফ, এবং সফিউল্লাহর নেতৃত্বে।

সেক্টরগুলোর দায়িত্বে যাঁরা নিয়োজিত হন, এখানে তাঁদের পরিচয় দেওয়া যেতে পারে। চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম আর নোয়াখালী নিয়ে গঠিত হয় ১ নম্বর সেক্টর। এর দায়িত্বে প্রথমে ছিলেন জিয়াউর রহমান, পরে রফিকুল ইসলাম। অন্য প্রধান যোদ্ধারা ছিলেন মুন্সী আবদুর রউফ, আফতাব কাদের, সুলতান মাহমুদ, হারুন আহমেদ চৌধুরী, মাহফুজুর রহমান, শমসের মোবিন চৌধুরী, রকিবুল ইসলাম, শওকত আলী, শামসুল হক প্রমুখ।

২ নম্বর সেক্টর গঠিত হয় ফরিদপুরের একাংশ, ঢাকা এবং কুমিল্লা নিয়ে। এর ভার দেওয়া হয়েছিলো খালেদ মোশাররফকে। তা ছাড়া, তিনি 'কে' ফোর্সেরও অধিনায়ক ছিলেন। তাঁর সহকারী ছিলেন সালেক চৌধুরী, খোন্দকার আজিজুল ইসলাম, সিতারা বেগম, মমতাজ হাসান, এম এ মতিন, আইনউদ্দীন, গাফফার হালদার, এ টি এম হায়দার, মেহবুবুর রহমান, হারুনুর রশিদ, ইমামুজ জামান, জাফর ইমাম, আকবর হোসেন প্রমুখ। বেসামরিক গেরিলাদের মধ্যে 'বীর বিক্রম' উপাধি পেয়েছিলেন সব মিলে ৩৭ জন। তাঁদের মধ্যে ১২ জনই ছিলেন তাঁর বাহিনীর সদস্য।

কুমিল্লা, সিলেট আর ঢাকা—প্রতিটির অংশ এবং কিশোরগঞ্জ নিয়ে ৩ নম্বর সেক্টর। এর প্রধান নিযুক্ত হন সফিউল্লাহ। এ ছাড়া তিনি 'এস' ফোর্সেরও অধিনায়ক ছিলেন। সহকারী হিশেবে তিনি পেয়েছিলেন নুরুজ্জামান, আজিজুর রহমান, মইনুল হোসেন চৌধুরী, গোলাম হেলাল খোরশেদ, আবদুল মান্নান, এ এস এম নাসিম প্রমুখকে। আশ্চর্য যে, কেবল এই সেক্টর থেকেই গণবাহিনীর কোনো সদস্য বীর বিক্রম উপাধি পাননি।

৪ নম্বর সেক্টর সিলেট। চিত্তরঞ্জন দত্ত ছিলেন এর অধিনায়ক। তাঁর সঙ্গে ছিলেন শরিফুল হক, রাশেদ চৌধুরী, সাজ্জাদ আলি জহির, জহিরুল হক প্রমুখ।

সিলেটের আর-একটি অংশ নিয়ে গঠিত হয় ৫ নম্বর সেক্টর, যার দায়িত্ব বর্তায় মীর শওকত আলির ওপর। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আবদুর রউফ, মোসলেমউদ্দীন, তাহেরউদ্দীন প্রমুখ।

রংপুর আর দিনাজপুরের অংশ নিয়ে ৬ নম্বর সেক্টর। অধিনায়ক এম কে বাশার। তাঁর সহকারী এ এম সামাদ, মতিউর রহমান, মেসবাহ আহমেদ, সদরুদ্দীন, নুরুল হক, দেলোয়ার হোসেন, নজরুল হক, মাসুদউর রহমান প্রমুখ।

রাজশাহী, পাবনা আর বগুড়া নিয়ে গঠন করা হয় ৭ নম্বর সেক্টর। এর দায়িত্ব দেওয়া হয় নাজমুল হকের ওপর। কিন্তু অগস্ট মাসে তিনি নিহত হলে দায়িত্ব গ্রহণ করেন কাজী নূর-উজজামান। সঙ্গী হিশেবে তিনি পেয়েছিলেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর, গিয়াসউদ্দীন, ইদ্রিস, সুবেদার মজিদ, আবদুর রশিদ প্রমুখকে।

কুষ্টিয়া আর যশোর নিয়ে গঠিত ৮ নম্বর সেক্টরের কম্যান্ডার নিযুক্ত হন আবু ওসমান চৌধুরী। পরে অগস্ট মাস থেকে এম এ মঞ্জুর। এই সেক্টরে আরও যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে মুস্তাফিজুর রহমান, কে এন হুদা, এ আর আজম চৌধুরী, এম শফিকুল্লাহ, অলীককুমার গুপ্ত, রওশন ইয়াজদানী প্রধান। সিভিল সার্ভিসের তওফিক-ই এলাহী চৌধুরীও এই সেক্টরে যুদ্ধ করেছিলেন। তিনি ছিলেন মেহেরপুরের এসডিও। প্রসঙ্গত বলা দরকার, বেশ কয়েকজন সিভিল সার্ভেন্টই যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। তবে সবাই সত্যিকার যুদ্ধ করেননি। অনেকে কাজ করেছিলেন মুজিবনগর সরকারে।

বরিশাল, পটুয়াখালী, খুলনা এবং ফরিদপুরের অংশ বিশেষ নিয়ে তৈরি করা হয় ৯ নম্বর সেক্টর। এর দায়িত্ব ছিলো এম এ জলিলের ওপর। তাঁর সহকারীদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যাঁদের নাম, তাঁরা হলেন : শাহজাহান ওমর, মেহদী আলি ইমাম, শামসুল আলম, ক্যাপ্টেন হুদা, এম এ বেগ, লেফটেনেন্ট মুখার্জী। এ ছাড়া, দশ বছর বয়সী অসম সাহসী একটি বালকের কথা আলাদা করে বলতে হয়। তার নাম মেজর জলিল লিখেছেন, ভট্টাচার্য। সেক্টর কম্যান্ডার একে সার্জেন্ট-মেজর পদে উন্নীত করেছিলেন। বস্তুত, জলিল তাঁর বাহিনীতে এ রকমের বহু বেসামরিক গেরিলা পেয়েছিলেন।

১০ নম্বর সেক্টর নির্দিষ্ট ছিলো না। এর ওপর দায়িত্ব দেওয়া হয় নৌবাহিনীর। ১১ নম্বর সেক্টর গঠিত হয় প্রধানত ময়মনসিংহ নিয়ে। এর প্রধান নিযুক্ত হন আবু তাহের। নভেম্বর মাসে তিনি আহত হলে দায়িত্ব গ্রহণ করেন বিমান বাহিনীর হামিদুল্লাহ। এই সেক্টরের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য অন্য যোদ্ধারা হলেন : তাহের আহমদ, মিজানুর রহমান, আবদুল আজিজ প্রমুখ। গণবাহিনীর বহু বীর গেরিলাও যোগ দিয়েছিলেন তাহেরের সঙ্গে। 'বীর উত্তম'দের মধ্যে ছিলেন কাদের সিদ্দিকী।

ময়মনসিংহের আফসার বাহিনী এবং আফতাব বাহিনীও অগস্ট মাস থেকে তাঁর অধীনে যুদ্ধ করেছিলেন। এ ছাড়া, গণবাহিনীর ৩৭ জন 'বীর বিক্রমে'র মধ্যে তিনি সঙ্গে পেয়েছিলেন ৯ জনকে। মনে হয়, খালেদ মোশাররফ, আবু তাহের এবং জলিলই সবচেয়ে বেশি বেসামরিক গেরিলাদের আকৃষ্ট করতে পেরেছিলেন।

জেড ফোর্সের দায়িত্ব ভার ছিলো জিয়াউর রহমানের ওপর। তাঁর সহযোদ্ধাদের মধ্যে ছিলেন অনেক নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তি। এঁদের মধ্যে সাত জন পেয়েছিলেন 'বীর উত্তম' উপাধি—এ জে এম আমিনুল হক, এম জিয়াউদ্দীন, লিয়াকত আলি খান, সালাহউদ্দীন মুমতাজ, মাহবুবুর রহমান ও ইমদাদুল হক। 'বীর বিক্রম' পেয়েছিলেন মহসিন উদ্দীন আহমদ, শাফায়াত জামিল, অলি আহমদ, আমিন আহম্মেদ চৌধুরী, নুরুন নবী খান, হাফিজউদ্দীন এবং নুর চৌধুরী। এ ছাড়া, 'বীর প্রতীক' উপাধি পেয়েছিলেন আরও অন্তত ছজন।

সদর দপ্তরের সঙ্গে যুক্ত কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধাও তাঁদের কৃতিত্বের জন্যে বীর উত্তম, বীর বিক্রম ইত্যাদি উপাধি পেয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন এ কে খন্দকার, আবদুর রব, শামসুল আলম, বদরুল আলম, এবং আনোয়ার হোসেন। মতিউর রহমান 'বীর শ্রেষ্ঠ' হয়েছিলেন। তাঁকেও সদর দপ্তরের সঙ্গে যুক্ত বলে সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে দেখানো হয়েছে—যদিও তিনি বিমান নিয়ে পাকিস্তান থেকে পালানোর সময়ই নিহত হয়েছিলেন।

কলকাতায় সেক্টর কম্যান্ডারদের বৈঠকে আরও ঠিক হয় যে, সেক্টর কম্যান্ডাররা ভারতীয় সেনাবাহিনীর সেক্টর কম্যান্ডারদের সঙ্গে একযোগে কাজ করবেন। নির্দেশ নেবেন তাঁদের কাছ থেকে। এ ছাড়া, গেরিলা বাহিনী কী করবেন, সে বিষয়েও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ঠিক হয় যে, তাঁরা বিশেষ করে বাংলাদেশের ভেতরে যোগাযোগ ব্যবস্থার ওপর হামলা করবেন। কল-কারখানাগুলো যাতে চলতে না-পারে, তার জন্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাহত করবেন। আমদানি-রফতানি বন্ধ করার জন্যে যে-অবকাঠামো প্রয়োজন, তাকেও খর্ব করবেন। এ ছাড়া, চোরাগোপ্তা হামলা করে পাকিস্তানী সৈন্যদের হতাহত করবেন। ফলে পাকসেনাদের মনোবল ভেঙে পড়বে। আর, একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গেরিলারা পালন করবেন গোপন খবর সংগ্রহ করে। (রফিক, ১৯৮৬)

প্রথম দিকে গেরিলাদের ট্রেনিং দেওয়া হতো দু থেকে তিন সপ্তাহ। এই সময়ের মধ্যে তাঁদের রাইফেল এবং লাইট মেশিন গান কী করে ব্যবহার করতে হয়, তা শেখানো হতো। আর শেখানো হতো গ্রেনেড এবং বিস্ফোরকের ব্যবহার। এ ছাড়া, চোরাগোপ্তা হামলা করার কৌশলও তাঁদের শেখানো হতো। পরের দিকে ট্রেনিং-এর মেয়াদ আরও বাড়ানো হয়েছিলো। ভারতের বিভিন্ন জায়গায় এ রকম প্রায় এক লাখ তরুণকে গেরিলা ট্রেনিং দেওয়া হয়েছিলো। মঈদুল হাসানের মতে, ভারত সরকারের অধীনে ট্রেনিং পাওয়া গেরিলাদের সংখ্যা ছিলো ৮৪ হাজার।
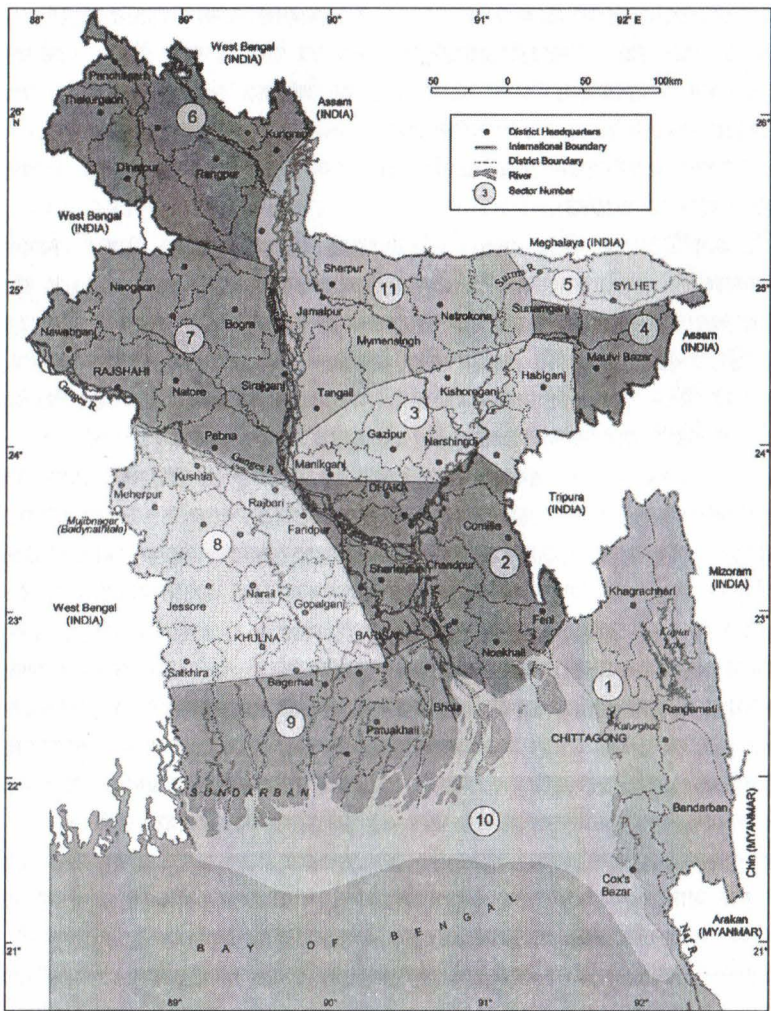
সেক্টরের ম্যাপ

(মঈদুল, ১৯৯২) কিন্তু, আগেই উল্লেখ করেছি, ভারতের ক্যাম্প ছাড়াও, খালেদ মোশাররফ এবং আবু তাহেরের মতো কোনো কোনো সেক্টর কম্যান্ডার নিজের নিজের এলাকায় গেরিলাদের ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন।

এই গেরিলারা মুক্তিযুদ্ধে অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। অনেকে অসামান্য সাহস দেখিয়েছিলেন। এমন কি, খোদ ঢাকায় তাঁরা এক-একটা দুঃসাহসিক চোরাগোপ্তা হামলায় অসাধারণ সাফল্য লাভ করেন। এটা তাঁরা করতে

পেরেছিলেন দেশের প্রতি ভালোবাসা এবং নিজেদের মনের জোরের জন্যে। তা ছাড়া, তাঁরা অকৃপণ সাহায্য পেয়েছিলেন সাধারণ মানুষের কাছ থেকে। কিন্তু বহু রকমের সীমাবদ্ধতাও ছিলো তাঁদের। যেমন, তাঁদের বেশির ভাগেরই বিশেষ কোনো অস্ত্র থাকতো না। প্রতিটি দশজনের দলকে প্রথম দিকে হয়তো তিন-চারটি রাইফেল, একটি স্টেনগান/এলএমজি এবং সামান্য কিছু গুলি দেওয়া হতো। আর দেওয়া হতো গ্রেনেড।

একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। মাহবুব আলম ছিলেন একজন অসাধারণ সাহসী এবং সফল গেরিলা। তিনি প্রথম 'অপারেশনে' যান ২৭শে জুন রাতে। তাঁর দলে সব মিলে ছিলেন দশজন গেরিলা। এই দশজনকে দেওয়া হয় দুটি রাইফেল, একটি এসএমজি আর পাঁচটি গ্রেনেড। রাইফেল এবং এসএমজি—প্রত্যেকটার জন্যে মাত্র দশটি করে গুলি। অপারেশনের সময় পাঁচটির মধ্যে একটি গ্রেনেড আবার ফোটেনি। (মাহবুব, ১, ২০০৭)

এ রকম প্রায় নিরস্ত্রভাবে দেশের ভেতরে ঢুকে গেরিলারা সব সময়ে খুব কার্যকর হতেন না। তা ছাড়া, অকারণে মারাও যেতেন অনেকে। বহু মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান—ছাত্র। তাঁরা কঠোর পরিশ্রম করতে অভ্যস্ত ছিলেন না। অথবা একনাগাড়ে বেশি দিন যুদ্ধ করার মতো কঠোর পরিশ্রমও করতে পারতেন না। কেউ কেউ দায়িত্ব পালনে অবহেলাও দেখাতেন। (রফিক, ১৯৮৬) কিন্তু তাঁদের সবচেয়ে বড়ো সম্বল ছিলো তাঁদের সাহস এবং তারুণ্য। তা ছাড়া, জনগণের কাছ থেকে তাঁরা যে-আন্তরিক সাহায্য এবং সহানুভূতি পেতেন, তা ছিলো তাঁদের জন্যে মস্ত একটা সম্বল। জনগণের ভেতরে থেকে তাঁদের সাহায্য নিয়েই গেরিলারা অভিযান চালাতেন। মাহবুব আলম জনগণের সাহায্য এবং সহানুভূতির অনেকগুলো দৃষ্টান্ত দিয়েছেন তাঁর গ্রন্থে—*গেরিলা থেকে সম্মুখ যুদ্ধে* (দুই খণ্ড)।

কলকাতায় সেক্টর কম্যান্ডারদের সম্মেলনের পর থেকে ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের যোগাযোগ এবং সমঝোতা বৃদ্ধি পায়। কেবল অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ দিয়ে নয়, যানবাহন এবং চিকিৎসা-সুবিধার জন্যেও ভারতীয় বাহিনীর ওপর তাঁদের নির্ভর করতে হতো। তা ছাড়া, সীমান্ত অঞ্চলে সামনাসামনি যুদ্ধ হলে, ভারতীয় বাহিনী অনেক সময়ে কামান এবং মর্টারের গোলা ছুঁড়েও মুক্তিবাহিনীকে আচ্ছাদন দিতেন। এ ছাড়া, মুক্তিবাহিনীর নিজেদের মধ্যেও সমন্বয় এবং সমঝোতা অনেকটাই বৃদ্ধি পায়। ফলে তাঁদের অভিযান আগের চেয়ে বেশি কার্যকর হয়ে ওঠে। এ সময় থেকে এই যুদ্ধকে স্পষ্ট দুটো ভাগে ভাগ করা হয়। এক দিকে, থাকতো গেরিলা যুদ্ধ। অন্যদিকে, নিয়মিত বাহিনীর সামনাসামনি যুদ্ধ। যুদ্ধের কৌশল হলো: পাকবাহিনীর ওপর আক্রমণ করে যদ্দুর সম্ভব ক্ষয়ক্ষতি করে সরে পড়া। এই গেরিলা যুদ্ধের ফলেই সবচেয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছিলো পাকবাহিনী। বেশির ভাগ সাফল্যও আসে এই পথে।

নিয়মিত বাহিনী এবং গণবাহিনী কী রকম সমান্তরালভাবে অভিযান করতেন এ ধরনের একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে রফিকুল ইসলামের গ্রন্থ থেকে। এই অভিযানগুলো সবই হয় রাজশাহী অঞ্চলে।

হাবিলদার শফিক তেসরা অগস্ট তাঁর সহযোদ্ধাদের নিয়ে পুঠিয়ার ঝলমলিয়া সেতুর ওপর আক্রমণ করে পাকিস্তানীদের দুটি মেশিন গান অবস্থান ধ্বংস করেন। সেখানে চারজন পাকিস্তানী সৈন্য নিহত হয়। তারপরের দিনই তিনি তাহেরপুরে হামলা চালান একটি পাকিস্তানী টহলবাহিনীর ওপর। এতে ১৮ জন পাকিস্তানী সৈন্য নিহত হয়। এর পাশাপাশি, ১৭ই অগস্ট দুঃসাহসী গেরিলা শিবলি তাঁর অভিযান চালান পুঠিয়ার কাছাকাছি সারদা পুলিশ অ্যাকাডেমির ওপর—যে-হামলার বিবরণ আমরা একটু পরেই দেখতে পাবো। (রফিক, ১৯৮৬) এভাবে কখনো গেরিলাদের চোরাগোপ্তা আক্রমণে, কখনো নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর জওয়ানদের সম্মুখ যুদ্ধে পাকিস্তানী বাহিনী রীতিমতো বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

বস্তুত, অগস্ট মাসে মুক্তিযুদ্ধ একটা বড়ো রকমের মোড় নেয়। পরিকল্পনা এবং সমন্বয়ের ফলে সাফল্যের মুখ দেখা যায় প্রায়ই। সিদ্দিক সালিকও অগস্ট-সেপ্টেম্বরকে মুক্তিযুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায় বলে উল্লেখ করেছেন। (সালিক, ১৯৮৮) এই মাসে কেবল স্থল যুদ্ধ নয়, গেরিলারা নৌযুদ্ধও শুরু করেন। তাঁদের প্রথম হামলাতেই পাকিস্তানীরা ভীত এবং সচকিত হয়। পলাশীর কাছে ভারতীয় সেনাবাহিনী বাংলাদেশের তিন শো তরুণকে নৌযুদ্ধ করার ট্রেনিং দিয়েছিলেন। এই তরুণরাই প্রথম অভিযানটি চালিয়েছিলেন। ২৮শে জুলাই রফিকুল ইসলাম এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর শাবেগ সিংহ মিলে এই অভিযানের পরিকল্পনা করেন। এর নাম দেওয়া হয়: অপারেশন জ্যাকপট। চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরকে তাক করে এই অভিযান শুরু করা হয় ১০ই অগস্ট। ৬০ জন ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে চট্টগ্রামের দিকে যাত্রা করেন। তাঁদের প্রত্যেকের সঙ্গে ছিলো লিম্পেট মাইন আর প্রতি তিনজনের জন্যে একটি করে স্টেনগান। সঙ্গে কিছু খাবার।

কথা ছিলো পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস ১৪ই অগস্ট তাঁরা যতোগুলো জাহাজে পারেন, ততোগুলোর সঙ্গে লিম্পেট মাইন লাগিয়ে আসবেন। কিন্তু তিনটি দলের মধ্যে একটি দল দেরি করে ফেলে। তাই ১৫ই অগস্ট রাত একটায় (অর্থাৎ ১৬ই অগস্ট ভোর রাতে) মুক্তিযোদ্ধারা জাহাজের দিকে যাত্রা করেন। তাঁরা অনেকগুলো জাহাজের গায়ে লিম্পেট মাইন লাগিয়ে নিজেরা সাঁতরে কর্ণফুলীর উল্টো পাড়ে চলে যান। রাত একটা ৪০ মিনিটের সময় ঘটে প্রথম বিস্ফোরণ। কয়েক মিনিটের মধ্যে আর-একটি। কয়েক মিনিটের মধ্যে আরও একটি। এমনি হতে থাকে একটির পর একটি বিস্ফোরণ। এর ফলে অনেকগুলো জাহাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং কয়েকটি ডুবে যায়। এই জাহাজগুলোর তিনটি নিয়ে এসেছিলো সামরিক সরঞ্জাম এবং গোলাবারুদ। (রফিক, ১৯৮৬) ন মাস ধরে মুক্তিযুদ্ধ চলার সময়ে যেসব

অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিলো, এই নৌ-হামলাটি ছিলো তার মধ্যে একটি। পরে মুক্তিযোদ্ধারা মঙ্গলা বন্দরেও অভিযান চালিয়েছিলেন। তাঁরা এ পর্যায়ে ৫০ হাজার টনের বেশি জাহাজ ডুবিয়ে দিয়েছিলেন। আর আংশিক ক্ষতি করেছিলেন প্রায় ৬০ হাজার টন জাহাজের। (মঈদুল, ১৯৯২) এসব হামলার পর পাকিস্তানীরা তাদের জাহাজের নিরাপত্তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়লো। এমন কি, যেসব বিদেশী মালবাহী জাহাজ আসছিলো, তারাও। ফলে আমদানি-রফতানির কাজ আর নিরাপদ বলে গণ্য হলো না।

পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসে অগস্ট মাসে মেজর আবু তাহের ১১ নম্বর সেক্টরের দায়িত্ব পান। তিনি এ মাসেই কামালপুর সড়কে একাধিক অভিযান চালান। প্রতিবারেই তিনি যথেষ্ট সফলতা অর্জন করেছিলেন। সেপ্টেম্বর মাসে তিনি অভিযান চালান কামালপুর, কোদালকাঠি, চিলমারী ইত্যাদি নানা জায়গায়। বিশেষ করে এ মাসের শেষ সপ্তাহে তিনি চিলমারীর ওপর যে-হামলা করেন, তাতে প্রায় এক শো পাকিস্তানী সৈন্য নিহত হয়েছিলো। এই হামলাটি তিনি নিজেই পরিচালনা করেছিলেন। এতে যোগ দিয়েছিলেন মুক্তিবাহিনীর দুই ব্যাটেলিয়ান জওয়ান আর ভারতীয় মাউন্টেন ব্রিগেডের কিছু সৈন্য। (তাহের [কবির, ২০০৪])

গেরিলা বাহিনীর কার্যকারিতা বিবেচনা করে এ মাসে তাঁদের ট্রেনিং-এর দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। এ মাসে ট্রেনিং ক্যাম্পের সংখ্যা দ্রুত বাড়িয়ে চল্লিশটি করা হয়। শেষ পর্যন্ত ৮৪টি ক্যাম্প গঠন করা হয়েছিলো। প্রতিটি ক্যাম্পে প্রায় পাঁচ শো গেরিলার ট্রেনিং দেওয়া হতো। কখনো চোরাগোপ্তা হামলা, কখনো সম্মুখ যুদ্ধে পাকিস্তানী সৈন্যরা এতো হতাহত হয়েছিলো যে, জুলাই-অগস্ট মাস থেকে নিহতদের লাশ পশ্চিম পাকিস্তানে না-পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কারণ, ক্রমাগত লাশ পাঠানোর ফলে সাধারণ মানুষ এবং সেনাবাহিনী—উভয়ই হতাশায় ভেঙে পড়ছিলো। (সালিক, ১৯৮৮)

মুক্তিযুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায়ে সাফল্য লাভের একটা প্রধান কারণ ছিলো, ট্রেনিং-প্রাপ্ত গেরিলাদের কার্যক্রম। গেরিলারা দুঃসাহসী অভিযান চালিয়ে শত্রুদের হতাহত করতেন এবং নিজেরাও অনেক ক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দিতেন। তাঁদের এই সাহস এবং ত্যাগের দু-একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। প্রথম দৃষ্টান্ত কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, শিবলির—যার কথা একটু আগেই উল্লেখ করেছি। আরও পাঁচজন গেরিলা নিয়ে তিনি সারদার পুলিশ অ্যাকাডেমিতে পাকিস্তানী সৈন্যদের ওপর দারুণ এক হামলা চালান। সেখানে ছিলো ৩২ নম্বর পাঞ্জাব রেজিমেন্টের এক কম্পেনি সৈন্য। শিবলি এবং তাঁর বন্ধুরা চুপিচুপি শত্রুদের বাঙ্কারে ঢুকে পড়েন। তারপর বাঙ্কারের মধ্যেই গ্রেনেড ফাটিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যান। এভাবে তাঁরা সৈন্যদের আসল ঘাঁটিতেই ঢুকে পড়েন। সেখানে হয় সামনাসামনি

গেরিলারা যুদ্ধ করছেন

যুদ্ধ। দশজন পাকিস্তানী সৈন্য নিহত হলেও, গেরিলাদের চারজন সেখানেই নিহত হন। একজন পালিয়ে যান। আর ধরা পড়েন শিবলি। মুক্তিযোদ্ধাদের খবর বের করার জন্যে সৈন্যরা তাঁর ওপর চরম নির্যাতন করে। তারা একটা একটা করে তাঁর চোখ এবং দাঁত তুলে নেয়, কিন্তু শিবলি মারা গেলেও কোনো খবর বলেননি। (রফিক, ১৯৮৬)

এ রকম নির্ভীক আর-এক গেরিলার বর্ণনা দিয়েছেন পাকিস্তানী সেনাকর্মকর্তা সালিক। জুন মাসে রোহনপুরে একটি বালক-মুক্তিযোদ্ধা ধরা পড়েছিলো। খবর বের করার জন্যে তার ওপর নির্যাতন চালানো হয়। শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানী মেজর তার বুকে চেপে বসে। বুকের সঙ্গে স্টেন গান লাগিয়ে মেজর বলে যে, এই তার শেষ সুযোগ। ছেলেটি তখন হাঁটু গেড়ে মাথা নুইয়ে ভূমি চুম্বন করে বললো, 'আমি মরতে প্রস্তুত। আমার রক্ত নিশ্চয় আমার পবিত্র ভূমির মুক্তিকে ত্বরান্বিত করবে।' (সালিক, ১৯৮৮)

এর পরের দৃষ্টান্ত ঢাকার গেরিলাদের। এঁরা সংগঠিত হন খালেদ মোশাররফের অধীনে। তিনি ষোলোজন গেরিলার একটি 'আত্মঘাতী' বাহিনী গঠন করেছিলেন। প্রাণ দেওয়ার জন্যে ষোলো আনাই তৈরি ছিলেন এঁরা। এঁদের প্রত্যেকের কাছে ছিলো চারটি করে গ্রেনেড। আর সব মিলে ছিলো ২০ পাউন্ড বিস্ফোরক। তাঁদের

মধ্যে মায়া-সহ ছজন হোটেল ইন্টারকনের (বর্তমান শেরাটন) সামনে দাঁড়ানো বিশ্ব ব্যাংকের গাড়ির ওপর গ্রেনেড ছুঁড়ে সেটিকে বিধ্বস্ত করেন ৯ই জুন। সেদিন এই হোটেলে একত্রিত হয়েছিলেন বিদেশী অতিথি এবং সাংবাদিকরা। হোটেল থেকে বেরিয়ে এই গেরিলারা যান মগবাজারে। সেখানে তাঁরা শান্তি কমিটির এক নেতার বাড়ির ওপর গ্রেনেড ছোঁড়েন। সেখান থেকে গিয়ে গ্রেনেড ছোঁড়েন *মর্নিং নিউজ* এবং *দৈনিক পাকিস্তানের* অফিসে। ১১ই অগস্ট মায়ার নেতৃত্বে গেরিলারা আবার হামলা চালান ইন্টারকনে। এবারে এই হোটেলের টয়লেট বিভাগ পুরোপুরি বিধ্বস্ত হয়। (র. ইসলাম, ১৯৮৮) সিদ্দিক সালিক লিখেছেন, এই হামলা ছিলো গুরুত্বপূর্ণ। এবং হোটেল মেরামত করতে কয়েক সপ্তাহ লেগে গিয়েছিলো। (সালিক, ১৯৮৮) এই একই গেরিলা দল অগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে অতর্কিত হামলা চালিয়েছিলেন ফার্মগেটে পাহারারত পাক সেনাদের ওপর। তাঁরা হামলা চালিয়েছিলেন এলএমজি আর গ্রেনেড দিয়ে। এতে একজন অফিসার এবং ১৭ জন পাকিস্তানী জওয়ান নিহত হয়। (র ইসলাম, ১৯৮৮)

আগস্টের প্রথম দিকে অন্য একটি গেরিলা দল বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিলেন স্টেট ব্যাংক ভবনে। অন্য তিন জন গেরিলা যোদ্ধা দ্বিতীয় বার স্টেট ব্যাংক ভবনে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিলেন ২০শে অক্টোবর। দ্বিতীয় বারের বিস্ফোরণে কয়েকজন পাকিস্তানী কম্যান্ডো গুরুতরভাবে আহত হয়েছিলো। এর এক সপ্তাহ আগে—অগস্ট মাসের ১৩ তারিখে গেরিলারা গোপীবাগে তিনজন পাকিস্তানী গোয়েন্দা বাহিনীর কর্মচারীকে গুলি করে হত্যা করেছিলেন। তারপর মৃত সৈন্যদের কাছ থেকে নিয়ে আসেন তাদের রিভলভারগুলো। (র ইসলাম, ১৯৮৮)

গেরিলাদের আর-একটা বড়ো কীর্তি হলো ২৮শে অক্টোবর ডিআইটি ভবনে অবস্থিত টেলিভিশন কেন্দ্রে প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণ ঘটানো। এখানে টেলিভিশন কেন্দ্র থাকায় এই ভবনটি ছিলো বিশেষ পাহারাধীন। কিন্তু সকল সতর্কতার চোখে ধুলো দিয়ে ডিআইটিতে কর্মরত মাহবুব একটি পাস জোগাড় করে দেন ফেরদৌস এবং তাঁর এক বন্ধু, জনকে। মাহবুব জুতোর তলায় আর পায়ে কৃত্রিম ব্যান্ডেজের মধ্যে করে অল্প কিছু বিস্ফোরক নিয়ে যেতেন প্রতিবার। বারো দিনে তিনি বারো পাউন্ড বিস্ফোরক, সেইফটি ফিউজ আর ডিটোনেটর নিয়ে যেতে পেরেছিলেন। এই দিয়েই ফেরদৌস এবং জন বোমা পেতে দ্রুত চলে যান স্টেডিয়ামের দিকে। তারপরেই ঘটে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। (ইসলাম, ১৯৮৬)

এ রকমের একটি সফল হামলা তাঁরা চালিয়েছিলেন সিদ্ধিরগঞ্জ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ওপরও। কেবল তাই নয়, এই কেন্দ্র মেরামত করতে যারা এসেছিলো পশ্চিম পাকিস্তান থেকে তাদের পাঁচজনকেই গেরিলা হত্যা করেন। (সালিক, ১৯৮৮)

গেরিলারা কিভাবে অতর্কিতে আক্রমণ করে পাকিস্তানীদের হতাহত করতেন,

তার একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত জানা যায় জাহানারা ইমামের *একাত্তরের দিনগুলি* থেকে। এই হামলা চালিয়েছিলেন তাঁর পুত্র রুমী, বদি, স্বপন, আলম, কাজী, হ্যারিস, মুক্তার, জিয়া আর আনু। দুটো গাড়ি নিয়ে তাঁরা এই হামলা চালান ধানমন্ডির ১৮ নম্বর সড়কে। এতে সাত-আটজন মিলিটারি পুলিশ নিহত হয়। এই হামলায় সময় লাগে মাত্র কয়েক সেকেন্ড। কয়েক মিনিটের মধ্যে ফেরার পথে ফের তাঁরা হামলা করেন অবশিষ্টদের ওপর। তার একটু পরে এঁরা যখন চেকপোস্টের সামনে পড়ে যান, তখন হত্যা করেন এলএমজি নিয়ে অবস্থান-রত দুজন সৈন্যকে। পাকসেনারা তখন জীপ নিয়ে তাড়া করে তাঁদের। গাড়ির পেছনের কাচ ভেঙে ফেলেন রুমী। তারপর সেই ফাঁক দিয়ে বদি আর স্বপন স্টেনগান দিয়ে গুলি ছুঁড়তে আরম্ভ করেন। কজন নিহত হলো, জানা গেলো না। কিন্তু উল্টে গেলো জীপ। মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে পাকসেনাদের ওপর তিনটি আক্রমণ। এই হামলার বর্ণনা দিয়েছিলেন রুমী। সেই বর্ণনাই লিখেছেন জাহানারা ইমান। (ইমাম, ২০০৫)

এ ধরনের অতর্কিত হামলায় পাকিস্তানী সৈন্যরা যেমন হতাহত হতো, তেমনি মনোবল ভেঙে পড়তো তাদের। কিন্তু এর ফলে গেরিলাদের অনেক সময় চরম মূল্য দিতে হতো। যেমন, রুমীদের এই দলের কয়েকজন ধরা পড়েন এই ঘটনার চার দিনে পরে—২৯শে অগস্ট। তাঁদের ওপর চরম নির্যাতন চলে কদিন ধরে। শেষ পর্যন্ত এই নির্যাতনের ফলেই তাঁরা নিহত হন। এঁদের অভিভাবকরাও ধরা পড়েন এবং অকথ্য নির্যাতনের শিকার হন। কেউ ছাড়া পান, কেউ বা চিরতরে হারিয়ে যান আলতাফ মাহমুদের মতো। (ইমাম, ২০০৫)

রাজধানী ঢাকায়, সত্যিকার অর্থে গোটা দেশেই, গেরিলা হামলার এতো সাফল্যের কারণ এই যে তাঁরা লড়াই করতেন সাধারণ মানুষের আশ্রয়ে থেকে। এই সাধারণ মানুষেরা তাঁদের যদ্দুর সম্ভব সাহায্য করতেন। থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করেই নয়, বরং সাহায্য করতেন নানা উপায়ে। আলতাফ মাহমুদের শ্যালকরা ছিলেন গেরিলা যোদ্ধা। তাঁর বাড়িতে লুকিয়ে রাখা হয়েছিলো অস্ত্রশস্ত্র। শ্যালকদের বাঁচানোর জন্যে আলতাফ মাহমুদ নিজেই সবকিছুর জন্যে দায়ী বলে স্বীকার করেন। শ্যালকদের মুখ খুলতে নিষেধ করেন। তাঁকে কী নিদারুণ নির্যাতনের ফলে মরতে হয়, তার বর্ণনা দিয়েছেন জাহানারা ইমাম। (ইমাম, ১৯৮৬) আগস্টে ঢাকার গেরিলাদের কয়েকজন দুর্ভাগ্যক্রমে ধরা পড়লেও, এর পরও অন্যরা তাঁদের দুঃসাহসিক অভিযান চালিয়ে যান। তাঁদের অভিযান একদিকে আন্তর্জাতিক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অন্যদিকে, পাকিস্তানী সৈন্যদের মনোবল একেবারে তলায় গিয়ে ঠেকে। এমন কি, পাকিস্তানী কর্মকর্তাদের মনোবলও। ঢাকা শহরের মধ্যেই তারা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিরাপদে যেতে পারলে, হাঁফ ছেড়ে বাঁচতো। (সালিক, ১৯৮৮)

ডিসেম্বরের যুদ্ধে ত্বরিত সফলতার একটা বড়ো কারণই গেরিলা যুদ্ধ। বিভিন্ন সেক্টরে নিবেদিত-প্রাণ গেরিলারা কী অসাধারণ সাফল্য লাভ করেছিলেন, তার খানিকটা আভাস পাওয়া যায় পাকিস্তানী মেজর সিদ্দিক সালিকের জবানি থেকে। তিনি লিখেছেন যে, গেরিলারা ২৩১টি সেতু, ১২২টি রেল লাইন এবং ৯০টি বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্র ধ্বংস অথবা ক্ষতিগ্রস্ত করেছিলেন। (সালিক, ১৯৮৮) এর ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা দারুণ বিধ্বস্ত হয়েছিলো। উৎপাদন এবং আমদানি-রফতানি ব্যাহত হয়েছিলো। সর্বোপরি, আতঙ্কগ্রস্ত হয়েছিলো পাকসেনারা।

গণবাহিনী অর্থাৎ গেরিলাদের সাফল্য এবং তাঁদের বীরত্বের কিছুটা প্রমাণ মেলে যুদ্ধের পর তাঁরা যে-খেতাব পেয়েছিলেন, তা থেকে। মোট ৪৯ জন 'বীর উত্তমে'র মধ্যে পাঁচজন এবং ১৭৫ জন 'বীর বিক্রমে'র মধ্যে ৩৭ জন ছিলেন গণবাহিনীর সদস্য। ৪২৬ জন বীর প্রতীকের মধ্যেও প্রচুর গণবাহিনীর সদস্য ছিলেন, তবে আমি তাঁদের সঠিক সংখ্যা জানতে পারিনি। ঢাকায় যে-গেরিলারা ত্রাসের সৃষ্টি করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে বদি, রুমী, স্বপন, কাজী, জুয়েল, কবিরুজ্জামান, আবুল কাসেম, মায়া-সহ ১২ জন 'বীর বিক্রম' উপাধি পেয়েছিলেন।

বস্তুত, মুক্তিবাহিনী অল্প সময়ে এবং সামান্য রসদ নিয়ে যে-সাফল্য দেখান, তার পেছনে গেরিলা বাহিনীর অবদান ছিলো অপরিসীম। তাঁরা যে যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং অতর্কিত হামলায় সৈন্যদের হত্যা করছিলেন, তার ফলে পাকিস্তানীদের মনোবল পুরোপুরি ভেঙে পড়েছিলো। এই অবস্থাতেই নিয়মিত বাহিনী এতো সাফল্য লাভ করেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হয় যে, নিয়মিত বাহিনী যুদ্ধ করতেন সীমান্ত এলাকায়। তাঁদের অস্ত্রশস্ত্রের বিশেষ অভাব ছিলো না। অপর পক্ষে, দেশের ভেতরে যুদ্ধ করেছিলেন গেরিলারা, নগণ্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে। তাঁরা যোগাযোগ ও বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার ক্ষতি না-করলে, অথবা পাকিস্তানীদের মনে ত্রাস সৃষ্টি না-করলে, নিয়মিত বাহিনী খুব সহজে তাদের কাবু করতে পারতেন না। অথবা মুক্তিবাহিনী আগে থেকে পাকিস্তানীদের দুর্বল না-করলে ডিসেম্বর মাসে ভারতীয় সৈন্যরাও অতো দ্রুত জয়ী হতে পারতেন না। (মনিরুজ্জামান, ১৯৮০)

যুদ্ধের আড়ালে আর-এক যুদ্ধ

মুক্তিযুদ্ধের পাশাপাশি রাজনীতির অঙ্গনেও ক্ষমতার লড়াই চলতে থাকে। এ লড়াই চলে তিন রকম—খোদ নির্বাসিত বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে; ভারত সরকারের সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের আদান-প্রদানে; এবং বাংলাদেশের ভেতরে—দখলদার সরকারে। এমন কি, আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও বাংলাদেশকে নিয়ে কম লড়াই হয়নি।

বাংলাদেশ সরকারের ভেতের অক্টোবর মাস নাগাদ তাজউদ্দীন-বিরোধিতা খানিকটা কমে যায়। তবে খন্দকার মোশতাক তাঁর সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে চক্রান্ত করতে থাকেন পাকিস্তানকে আবার জোড়া লাগানোর। এর সূচনা হয় মার্কিন রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে। একটা রাজনৈতিক মীমাংসার মধ্য দিয়ে, সম্ভবত একটা ফেডারেশন গঠনের মধ্য দিয়ে, এই সমস্যার সমাধান করা যায় কিনা, তারই চেষ্টা করছিলো যুক্তরাষ্ট্রের নিক্সন সরকার। তাজউদ্দীন-বিরোধী গোষ্ঠী এবং মুজিব বাহিনীর সমর্থকরা মোশতাকের এই প্রয়াসের সঙ্গে সহযোগিতা করতে থাকেন। তাঁরা মোশতাকের ষড়যন্ত্রের কথা জানতেন কিনা, তা অবশ্য জানা যায় না।

আগেই বলেছি, মুক্তিযুদ্ধকে তাজউদ্দীন কেবল আওয়ামী লীগের যুদ্ধ হিশেবে দেখতেন না। সে জন্যে প্রশাসনকে তিনি সাজিয়েছিলেন বিশেষজ্ঞদের দিয়ে—দলমত নির্বিশেষে। তা ছাড়া, মুক্তিযুদ্ধে বামপন্থী দলগুলো যে রকম স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ গ্রহণ করেছিলো, তাতে তাদের অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়ারও প্রয়োজন ছিলো। [প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, '৬৮ সালে মস্কোপন্থী কমিউনিস্ট পার্টির কংগ্রেসে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিলো যে, অখণ্ড পাকিস্তান-ভিত্তিক জাতীয় গণতন্ত্র আনা সম্ভব নয়। আর, '৭১-এর ফেব্রুয়ারিতে স্বাধীনতার সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়। (মুজাহিদুল ইসলাম সেলিমের সাক্ষাৎকার, ২৮. ৯. ২০০৯)] ন্যাপের নেতা মুজাফফর আহমদ এবং কমিউনিস্ট দলের নেতা মণি সিংহকে নিয়ে একটা উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করার ব্যাপারে এই দলগুলোর এবং

ভারত সরকারের তরফ থেকে তাজউদ্দীনের ওপরে চাপ ছিলো। কারণ, ভারতের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের মৈত্রী চুক্তি হচ্ছিলো। স্বভাবতই সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে বামপন্থীদের যোগাযোগ এবং সহযোগিতা দেখতে চাইছিলো। তাদের তরফ থেকেও চাপ ছিলো ভারতের ওপর। এরই পরিপ্রেক্ষিতে, বাংলাদেশ সরকার ভাসানী, মুজাফফর আহমদ, মণি সিংহ প্রমুখকে নিয়ে একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠনে করেছিলো সেপ্টেম্বর মাসে। তা সত্ত্বেও দলীয় কোন্দল চলতেই থাকে। তাই ভারত সরকারের সঙ্গে এ নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের নানা ধরনের আলাপ-আলোচনা চলছিলো অগস্ট-সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে।

ওদিকে, পাকিস্তান সরকার শেখ মুজিবের বিচার আরম্ভ করেছিলো অগস্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে। শুনানি হবার পরই তা এক মাসের জন্যে স্থগিত করা হয়। (আহমদ সালিম, ১৯৯৭) এই বিচারের মাধ্যমে ইয়াহিয়া চাইছিলেন একই সঙ্গে তিন পাখি মারতে। তিনি ভয় দেখিয়ে শেখ মুজিবের ওপর চাপ দিচ্ছিলেন, আপোশ করা জন্যে। দ্বিতীয়ত, চাপ দিচ্ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের নেতাদের ওপর—মুজিবের মুক্তির বিনিময়ে মীমাংসায় আসার জন্যে। তৃতীয়ত, খুশি করার চেষ্টা করছিলেন পাকিস্তানের সাধারণ মানুষদের। সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমে বিচার আবার শুরু হয়। তারপর বিচার—অথবা বিচারের নামে প্রহসন চলতে থাকে অনেক দিন ধরে। আদালতে রোজ নিয়ে যাওয়া হতো শেখ মুজিবকে। তিনি ফিরেও তাকাতেন না, বিচারক অথবা বিচার কার্যের দিকে। তিনি বলেছিলেন যে, তিনি দেশের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী। তাঁর বিচার করার কোনো এক্তিয়ার ঐ আদালতের নেই। তা ছাড়া, তিনি জানতেন: ইয়াহিয়া এর আগেই ঘোষণা করেছিলেন যে, তিনি দেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন এবং তার জন্যে তাঁকে উপযুক্ত শাস্তি পেতে হবে। (আহমদ সালিম, ১৯৯৭)

আগেই বলেছি, মুজিব ছিলেন সত্যিকার অর্থেই নির্ভীক এবং আপোশহীন। তিনি বিচারে ভয়ও পাননি, অথবা আপোশ করতেও রাজি হননি। এমন কি, তাঁর পক্ষ সমর্থন করার জন্যে কোনো আইনজীবীও নিয়োগ করেননি। সরকারের তরফ থেকে তাঁর পক্ষ সমর্থন করার জন্যে নিয়োগ করা হয়েছিলো বিখ্যাত আইনজীবী এ কে ব্রোহিকে। ব্রিগেডিয়ার খলিলুর রহমান লিখেছেন যে, সাক্ষীদের জেরা করা দূরে থাক, ব্রোহি সাক্ষীদের একটা প্রশ্নও করেননি। (খলিল, ২০০৯) অপর পক্ষে, সালিম লিখেছেন যে, সাক্ষীরা জেরার উত্তরে কোনো বিশ্বাসযোগ্য কথা বলতে পারেননি। (সালিম, ১৯৯৭) এই সাক্ষীদের মধ্যে ছিলেন তিনজন বাঙালি—ব্রিগেডিয়ার মজুমদার, যিনি চট্টগ্রামে দ্বিধা করেছিলেন বিদ্রোহ করার ব্যাপারে। আর, কর্নেল মাসুদ এবং কর্নেল ইয়াসীন। এর মধ্যে মাসুদ ছিলেন শেখ মুজিবের সমসাময়িক ছাত্র। চল্লিশের দশকে কলকাতায় ছাত্রাবাসে থাকার সময়

থেকেই দুজনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিলো। পাকিস্তানীরা এই তিনজনের ওপরই অমানুষিক শারীরিক নির্যাতন করে তাঁদের সাক্ষী দিতে রাজি করায়। মাসুদ সাক্ষী দিতে এলে মুজিবের সঙ্গে চোখাচোখি হওয়ার মাথা নিচু করেন। আর আসামীর কাঠগড়ায় বসে মুজিব মুচকি মুচকি হাসতে থাকেন। (খলিল, ২০০৯)

বিচারের রায় কী হবে—তা আগে থেকেই ঠিক করা ছিলো। জেলখানাতে মুজিবের কবরও খোঁড়া হয়েছিলো। (খলিল, ২০০৯) আহমদ সালিম লিখেছেন যে, একবার নয়, তিনবার তাঁর জন্যে কবর খোঁড়া হয়েছিলো। কিন্তু তিনবারই তাঁর ফাঁসি কার্যকর করার প্রয়াস স্থগিত হয়। শেষবার কবর খোঁড়া হয়েছিলো ১৫ই ডিসেম্বর যেদিন তাঁকে ফাঁসি দেওয়ার জন্যে ইয়াহিয়া আদেশ দিয়েছিলেন। আত্মসমর্পণের দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে যে-সংশয় দেখা দেয়, তার ফলে ফাঁসি যাদের দেবার কথা, তাদের কিছু দেরি হয়ে যায়। সেই সুযোগে দয়ালু জেলার মুজিবকে লুকিয়ে নিয়ে যান নিজের বাড়িতে। তিনি শুনেছিলেন যে, ইয়াহিয়া পদত্যাগ করতে যাচ্ছেন। (অ্যান্টনি, ১৯৮৬) এই জেলর তাঁকে নিজের বাড়িতে রাখেন দুদিন। তারপর এক কলোনিতে পাঁচ-ছ দিন। (সালিম, ১৯৯৭) ১৯৭৪ সালে ভুট্টো যখন ঢাকায় আসেন, তখন মুজিব এই জেলারকেও আসার জন্যে নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। (অ্যান্টনি, ১৯৮৬)

যখন মুজিবের বিচার হচ্ছিলো, ততো দিনে মুক্তিযুদ্ধের বয়স প্রায় ছ মাস হয়ে গিয়েছিলো। বেশির ভাগ বাঙালি বাংলাদেশকে একটা বাস্তবতা বলেই ধরে নিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও মুজিব যদি এ পর্যায়ে পাকিস্তানের চাপে আপোশ করতে রাজি হয়ে যেতেন, তা হলে বাংলাদেশ স্বাধীন হতো কিনা, সন্দেহ আছে। কিন্তু তিনি তাঁর সাহস বজায় রেখেছিলেন বলেই বাংলাদেশ বাস্তবতায় পরিণত হতে পেরেছিলো।

আন্তর্জাতিক সমাজকে ধোঁকা দেওয়ার জন্যে পাকিস্তান সরকার আরও একটা হাস্যকর কাণ্ড ঘটিয়েছিলো। সে হলো : 'পূর্ব পাকিস্তানে' ৭৮টি আসনে উপনির্বাচন করা। দেখানো হয় যে, এইসব আসনে আওয়ামী লীগের নির্বাচিত সদস্যরা অনুপস্থিত। সুতরাং তাঁদের শূন্য আসনে নির্বাচন করা হচ্ছে। সিদ্দিক সালিকের মতে, 'এ উপ-নির্বাচন ছিলো একটি প্রতারণা। প্রকৃত পক্ষে, জেনারেল ফরমানই আসনসমূহ ভাগ করে দেন।' (সালিক, ১৯৮৮) ফরমান আলি এর মধ্যে কয়েকটি আসন ভুট্টোর পিপলস পার্টিকেও দিয়েছিলেন।

আন্তর্জাতিক সমাজ এর অনেক আগে থেকেই মুজিবকে মুক্তি দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলো। এমন কি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ব্রিটেন, জার্মেনি, ইয়োগোস্লাভিয়া—সবাই। ইয়াহিয়া রাজনীতিক ছিলেন না। কিন্তু ভুট্টো ছিলেন। কেবল তাই নয়, তিনি ছিলেন ক্ষমতা-পাগল রাজনীতিক। তিনিও বুঝতে পেরেছিলেন যে, মুজিবকে বিচার করে ফাঁসি দিলে, 'মৃত মুজিব জীবিত মুজিবের

থেকেও বেশি প্রভাবশালী হবেন।' বাঙালিরা তা হলে পাকিস্তানী সৈন্য ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের একজনকেও জীবিত অবস্থায় ফিরতে দেবেন না।

অক্টোবর মাসে ভারত এবং পাকিস্তান—উভয়কে সীমান্ত থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করার আহ্বান জানিয়েছিলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। নিক্সন প্রশাসনের ধারণা ছিলো যে, ভারতের সঙ্গে সমঝোতায় হলেই যথেষ্ট হবে, বাঙালিরা কোনো বিবেচনার বিষয় নয়। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে পরোক্ষভাবে ভয়ও দেখাচ্ছিলো। যেমন, ইন্দিরা গান্ধীকে মার্কিন রাষ্ট্রদূত জানান যে, মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য দেওয়া বন্ধ না-করলে পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে পাকিস্তান ভারতের ওপর সামরিক আক্রমণ চালাতে পারে। এ কথা তিনি জানান অক্টোবর মাসের ১২ তারিখে।

অপর পক্ষে, পাকিস্তানের ওপরেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চাপ দিচ্ছিলো 'পূর্ব পাকিস্তানে' মীমাংসায় আসার মতো পরিবেশ সৃষ্টি করতে। সে জন্যেই, সেপ্টেম্বর মাসের গোড়ায় টিক্কা খানকে সরিয়ে একজন বাঙালিকে—ডাক্তার আবদুল মালিককে—গভর্নর করা হয়েছিলো। তাঁর অধীনে ১০ জন বাঙালি মন্ত্রীও জোগাড় করা হয়। তা ছাড়া, ইয়াহিয়ার পক্ষ থেকে একটা লোক-দেখানো সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হয়েছিলো। যদিও এর পরও চলতে থাকে নির্বিচারে 'সন্দেহভাজন' বাঙালিদের হত্যা এবং নির্যাতন। মোট কথা, বেসামরিক সরকার গঠন করে, অথবা সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে, বাংলাদেশের পরিস্থিতির কোনো উন্নতি করা সম্ভব হয়নি।

বাংলাদেশে কোনো গণহত্যা হয়নি, এই প্রচার চালানোর জন্যে পাকিস্তান খুব চেষ্টা করেছিলো। এ জন্যে ব্যবহার করেছিলো বাঙালি বুদ্ধিজীবী এবং রাজনীতিকদের। যেমন, নুরুল আমীনকে। তিনি সত্যি সত্যি পাকিস্তান-পন্থী ছিলেন। তবে রাজনীতি অঙ্গনে এ ধরনের রাজনীতিকদের কোনো প্রভাব ছিলো না। এ রকমের আর-একজন রাজনীতিক ছিলেন শাহ আজিজুর রহমান। যখন বাংলাদেশের মুক্তি একেবারে আসন্ন, সেই নভেম্বর মাসে তিনি পাকিস্তানের প্রতিনিধি হিশেবে যান জাতিসংঘে। সেখানে তিনি পাকিস্তানের সাফাই গেয়েছিলেন এবং নিন্দা করেছিলেন বাঙালি জাতীয়তাবাদের। ফলে যুদ্ধের পর তিনি সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে ফিরতে পারেননি। কিন্তু এই রাজনীতিকই কয়েক বছর পরে মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমানকে তাঁর জাতীয়তাবাদী দল গঠনে সাহায্য করেন। পুরস্কার হিশেবে জিয়া তাঁকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। জিয়া বিএনপি গঠন করেছিলেন যে, তিনটি দল নিয়ে তার মধ্যে একটির প্রধান ছিলেন শাহ আজিজুর রহমান। আর-একটির প্রধান ছিলেন মশিউর রহমান। দুজনই বিএনপি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। মশিউর রহমান বিএনপির সহ-সভাপতি এবং জিয়ার 'সিনিয়র মন্ত্রী' হয়েছিলেন '৭৮ সালে। যুদ্ধের সময়কার 'পূর্ব

পাকিস্তান শান্তি ও কল্যাণ কাউন্সিলে'র সদস্য জুলমত আলি খানও এক সময়ে বিএনপির সহ-সভাপতি হন।

যুদ্ধের সময় অন্য যাঁরা পাকিস্তানের প্রতিনিধি হয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রচার চালান, তাঁদের মধ্যে বুদ্ধিজীবীরাও ছিলেন। যেমন, অধ্যাপক সাজ্জাদ হুসায়েন, মোহর আলি এবং কাজী দীন মোহাম্মদ। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিশেবে এঁদের এক ধরনের বিশ্বাসযোগ্যতা ছিলো বহির্বিশ্বে। বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের ওপর পাকিস্তানীরা হামলা চালিয়েছে—এ সংবাদের প্রতিবাদ করে সাজ্জাদ হুসায়েন এবং মোহর আলি *টাইমস* পত্রিকার সম্পাদকের কাছে প্রতিবাদ-পত্র পাঠিয়েছিলেন। তাঁদের এই চিঠি ছাপা হয় ৭ই জুলাই তারিখের *টাইমস*-এ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া, পাকিস্তানের অন্য মুরব্বি ছিলো চীন। কিন্তু চীনের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোনো কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিলো না। যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধু ছিলো তাইওয়ান। ফলে স্বাধীন হওয়ার পর থেকে (১৯৪৯) গণ চীন কখনোই জাতিসংঘের সদস্য হতে পারেনি। তাইওয়ানই প্রতিনিধিত্ব করতো মূল চীনা ভূখণ্ডের। কিন্তু চীনের গুরুত্ব, বিশেষ করে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামরিক গুরুত্ব, বৃদ্ধির কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী হয়। এই উদ্দেশ্যে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার পাকিস্তান থেকে গোপনে যান পিকিংয়ে অর্থাৎ বর্তমান বেইজিং-এ। এবং চীনের সঙ্গে বহু বছরের শত্রুতা কাটিয়ে বন্ধুত্ব স্থাপন করে আসেন। (অক্টোবর, '৭১) এতে মধ্যস্থের ভূমিকা পালন করেছিলো পাকিস্তান। এই বন্ধুত্ব হওয়ার ফলে চীন নিরাপত্তা পরিষদ-সহ জাতিসংঘে যোগদান করতে সমর্থ হয় ২৩শে নভেম্বর। পাকিস্তান তার এই দুই মুরব্বির কাছ থেকেই নৈতিক সমর্থন পেয়েছিলো।

পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর উচ্চপদস্থ সদস্যদের প্রতিনিধি দল নিয়ে ভুট্টো চীনে যান ৩রা নভেম্বর। পাকিস্তানকে ভারত আক্রমণ করলে চীন ভারতকে আক্রমণ করবে—এই ছিলো তাঁর দাবি। দেশে ফিরে তিনি জানান যে, চীনে তাঁর সফর সফল হয়েছে। এ ছাড়া, ইয়াহিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে জানিয়ে দেন যে, ১৯৫৯ সালের চুক্তি অনুযায়ী যুদ্ধের সময় পাকিস্তানের পাশে যুক্তরাষ্ট্রের দাঁড়ানোর কথা। মোট কথা, বাংলাদেশের যুদ্ধ কেবল বাংলাদেশের মধ্যে সীমিত ছিলো না। অথবা বাংলাদেশকে ভারত কূটনৈতিক স্বীকৃতি দিলেই এ সমস্যার সমাধান হতো না। এ সমস্যা একটা আন্তর্জাতিক সমস্যায় পরিণত হয়েছিলো।

ওদিকে, বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্বের জনমত তৈরি করার জন্যে ভারতও যদ্দুর সম্ভব কাজ করতে থাকে। এ জন্যে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্বরণ সিংহ একাধিবার বিদেশ সফরে যান। ইন্দিরা গান্ধীও যান একাধিকবার। অক্টোবর মাসের ২৪শে তিনি বের হন প্রধান পশ্চিমা দেশগুলো সফর করতে। একে-একে তিনি প্যারিস, বন, লন্ডন, ওয়াশিংটন সফর করেন। তা ছাড়া, যান বেলজিয়াম এবং অস্ট্রিয়ায়।

এই দেশগুলোর নেতাদের তিনি বুঝিয়ে বলেন ভারত এবং বাংলাদেশের সমস্যার কথা। অগস্ট মাসেই তিনি একটি বড়ো চাল দিয়েছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সহযোগিতার চুক্তি করে। এই চুক্তি অনুযায়ী ভারত আক্রান্ত হলে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতকে সামরিক সাহায্য দেবে বলে শর্ত ছিলো। ইন্দিরা গান্ধীর সফরের ফলে পশ্চিমা দেশগুলো বাংলাদেশ সমস্যা এবং তার গুরুত্ব আরও ভালো করে বুঝতে পেরেছিলো। বিরোধিতা করতে থাকে কেবল অ্যামেরিকা আর চীন। এই সফরের মধ্য দিয়ে ইন্দিরা গান্ধী আরও প্রমাণ করতে চান যে, তিনি আন্তর্জাতিক সমাজের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধের তৃতীয় পর্ব

জুলাই মাসে কলকাতায় সেক্টর কম্যান্ডারদের বৈঠকের পর থেকে যুদ্ধে কিছু পরিবর্তন দেখা দেয়। যুদ্ধে দেখা দেয় শৃঙ্খলা এবং পরিকল্পনা। ভারতীয় বাহিনীও এ সময়ে যথেষ্ট রসদ জোগাতে থাকে। এবং সীমান্ত এলাকায় নিয়মিতভাবে দিতে থাকে গোলাগুলির আচ্ছাদন। ফলে মুক্তিযোদ্ধারা অনেক বেশি সাফল্য লাভ করতে আরম্ভ করেন। এর প্রমাণ মেলে ২৯শে জুলাই বয়রা থেকে তাঁর স্ত্রীকে লেখা মুক্তিযোদ্ধা খন্দকার নাজমুল হুদার একটি একটি চিঠি থেকে। তিনি ২৮শে জুলাই ভোর রাতে বয়রা অঞ্চলের একটি যুদ্ধের বর্ণনা দিয়েছেন। এতে তিনি লেখেন যে, তাঁরা মাত্র ৪০ জনের একটি দল নিয়ে প্রায় দেড় শো পাকিস্তানী সৈন্যের ওপর আক্রমণ চালিয়েছিলেন। এ যুদ্ধ চলে প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা ধরে। তাতে ১২ জন পাকিস্তানী নিহত হয়, বাকি সবাই পালিয়ে যায়। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধাদের গোলাগুলি ফুরিয়ে যাওয়ায় শেষে তাঁদের পিছু হটতে হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের একজনের হাতে গুলি লেগেছিলো। এ যুদ্ধ সম্পর্কে ভারতীয় কর্নেল কাপুর ওপরওয়ালার কাছে হুদার খুব প্রশংসা করে রিপোর্ট দিয়েছেন। (*একাত্তরের চিঠি*, ২০০৯) এই বিবরণ থেকে দেখা যায়, সাড়ে তিন ঘণ্টা যুদ্ধ করার মতো রসদ ততোদিনে মুক্তিযোদ্ধারা পেয়ে গিয়েছিলেন। এবং তখন থেকেই মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সহযোগিতা এবং তত্ত্বাবধান শুরু হয়েছিলো। (হুদা পরে 'বীরবিক্রম' উপাধি পেয়েছিলেন। '৭৫-এর ৭ই নভেম্বরের সিপাহী বিদ্রোহে নিহত হন।)

আবু তাহেরের লেখা থেকেও দেখা যায়, সেপ্টেম্বর মাসে তাঁর বাহিনীর আক্রমণে ভারতের জওয়ানরাও অংশ নিতে শুরু করেন। (কবির, ২০০৫) অনুমান করি, অন্যান্য এলাকায়ও একই রকমের ঘটনা ঘটেছিলো। এ সময়ের ভরা নদী-নালা এবং বৃষ্টিও বাংলাদেশের গেরিলা এবং নিয়মিত বাহিনীকে সাহায্য করেছিলো।

অগস্ট-সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের খুব উল্লেখযোগ্য যেসব লড়াইয়ের কথা সেক্টর কম্যান্ডারা লিখেছেন, তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যেতে পারে। কাজী নূর-উজজামান লিখেছেন, তাঁর সেক্টরে বেশির ভাগ অপারেশন হয়েছিলো সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর—এই তিন মাসে। এই সময়ে মেজর গিয়াস, ক্যাপ্টেন ইদ্রিস এবং ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীর তাঁদের গেরিলা ইউনিট নিয়ে অনেকগুলো থানার ওপর অভিযান চালান। এবং এই তিনজনই মুক্তিযোদ্ধা হিশেবে খ্যাতি লাভ করেন।

আগস্টের প্রথম দিকে ঝলমলিয়া এবং তাহেরপুরের অ্যাম্বুশের কথা আগেই বলেছি। এই অভিযান দুটি পরিচালনা করেন সুবেদার-মেজর মাজেদ। ১১ই অগস্ট এই মাজেদই কলাবাড়ির ওপর আক্রমণ করেন ৬৪ জন মুক্তিযোদ্ধাকে নিয়ে। এখানে শত্রুরা হেরে গিয়ে কানসাটে পালিয়ে যায়। তিনি তখন ১৪ই অগস্ট কানসাটের ওপরই আক্রমণ করেন। কয়েক দিন পরে—২৩শে অগস্ট কানসাটের ওপর তিনি আবার অভিযান চালান। এতে তাঁর সঙ্গে যোগ দেন ক্যাপ্টেন ইদ্রিস। তাঁদের হামলায় কানসাট ঘাঁটির পতন হয়। তবে তাঁরা কানসাট ধরে রাখতে পারেননি। পাকিস্তান আরও বেশি সৈন্য নিয়ে হাজির হলে, তাঁরা পিছু হটতে বাধ্য হন।

অগস্ট মাসে মুক্তিযোদ্ধারা দখল করে কিছু দিনের জন্যে ধরে রাখতে পেরেছিলেন রৌমারীর প্রত্যন্ত অঞ্চল। এখানে লেফটেনেন্ট নবী বেসামরিক প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন। তার মধ্যে শুল্ক দপ্তর, থানা, স্কুল এবং ডাকঘরও ছিলো। এই বেসামরিক প্রশাসন ব্যবস্থা ২৭শে অগস্ট উদ্‌বোধন করেন জিয়াউর রহমান। (জামিল, ২০০৯)

আবু তাহের পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসে যুদ্ধে যোগ দিয়েই নিজে ১৫ই অগস্ট হামলা চালান পাকিস্তানীদের শক্ত ঘাঁটি কামালপুরের ওপর। এতে ১৫/১৬ জন পাকসেনা নিহত হয়। এই মাসেই কাদের সিদ্দিকী তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং তাঁর নির্দেশে সমন্বিত হামলা শুরু করেন।

এর আগে মে মাস থেকে কাদের সিদ্দিকী নিজে টাঙ্গাইল অঞ্চলে একটি মুক্তি বাহিনী গড়ে তোলেন। এবং অসামান্য সাহসের সঙ্গে পরের মাসগুলোতে যুদ্ধ করেন। তিনি পরিণত হন রূপকথার এক নায়কে। মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অসামান্য অবদানের জন্যে তিনি 'বীর উত্তম' উপাধি পান। ময়মনসিংহের ভালুকা এলাকায় অবসর-প্রাপ্ত মেজর আফসারও নিজে একটি বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন। তাহেরের সঙ্গে তিনিও যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন। এ রকমের স্থানীয় প্রয়াসে ছোটো ছোটো মুক্তিযোদ্ধা দল গঠিত হয়েছিলো বাংলাদেশের অনেক জায়গাতেই। মেজর জলিল এ রকমের আর-একজন মুক্তিযুদ্ধের সংগঠকের কথা লিখেছেন। তাঁর নাম এম এ বেগ। তিনি বরিশালের স্বরূপকাঠি অঞ্চলে এই বাহিনী গড়ে তোলেন। সেখানকার পেয়ারা বাগানে চোরাগোপ্তা হামলা চালিয়ে বহু পাকসেনাকে হতাহত করেছিলেন তিনি। (জলিল [কবির, ২০০৫])

তাহের

মুনতাসীর মামুনের *একাত্তরের বিজয় গাথা* গ্রন্থে স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা বাহিনী গড়ে তোলার অনেকগুলো দৃষ্টান্ত দেখা যায়। মাহবুব আলমের *গেরিলা থেকে সম্মুখ যুদ্ধে* গ্রন্থ থেকেও বোঝা যায়, তখন কি রকম স্বতঃস্ফূর্তভাবে জনগণ যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন, তাঁরা জীবনে অনেকে কোনো দিন একটা বন্দুকও দেখেননি। অথবা কাউকে হত্যা করা দূরে থাক, আঘাত করার কথাও ভাবেননি। এমন কি, তাঁরা কোথাও ট্রেনিংও গ্রহণ করেননি। জাহানারা ইমামের অসাধারণ গ্রন্থ *একাত্তরের দিনগুলি* থেকেও এ রকমের দৃষ্টান্ত দেখা যায়। দেখা যায়, কিভাবে মধ্যবিত্ত পরিবারের প্রতিশ্রুতিশীল তরুণরা পিতামাতার নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। কেউ যুদ্ধে যোগ দেবার কথা বলেননি এই তরুণদের। তাঁরা নিজের থেকেই এতে অংশ নিয়েছিলেন। কোথাও তাঁরা পাকবাহিনীর যথেষ্ট ক্ষতি করতে পেরেছিলেন। কোথাও তাঁরা নিজেদের প্রাণ বিসর্জন করেছেন। কিন্তু তাঁদের সম্মিলিত ত্যাগের ফলে পাকবাহিনী আতঙ্কিত এবং দুর্বল হয়েছিলো।

সে যাই হোক, তাহেরের মুক্তিযোদ্ধারা আগস্টের শেষ দিকে এবং ৬ই সেপ্টেম্বর চোরাগোপ্তা আক্রমণ করেন কামালপুর-বকসিগঞ্জ সড়কে। দুবারেই এঁরা ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করেন পাকিস্তানীদের। এর পর ১০ই সেপ্টেম্বর সুকৌশলে তিনি আবার কামালপুর ঘাঁটি থেকে পাকসেনাদের বের করে আনেন। তারপর হামলা করেন তাদের ওপর। এই আক্রমণে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন মুক্তিযোদ্ধা

মাহফুজ। তাহের লিখেছেন যে, এই অভিযানের কথা তাঁর মুক্তিযোদ্ধাদের অনেক দিন মনে থাকবে। (তাহের [কবির, ২০০৫]) তাহের ছিলেন অসামান্য সাহসী যোদ্ধা। নিজেই যুদ্ধে অংশ নিতেন। পেছনে থেকে যুদ্ধ পরিচালনা করতেন না। কাদের সিদ্দিকী লিখেছেন যে, তিনি যখন তাহেরের ক্যাম্পের রিয়ার লাইন অথবা পেছনের দিকের ঘাঁটিতে থাকতেন, তখন তাহেরের সঙ্গে তাঁর বড়ো একটা দেখা হতো না। কারণ, শতকরা ৭৫ দিনই তাহের থাকতেন ফ্রন্টে অর্থাৎ রণাঙ্গনে। সাধারণ সৈনিকদের সঙ্গেই খেতেন এবং বাস করতেন। (কাদের, ১৯৮৫) রণাঙ্গনে থাকার মাশুলও তাঁকে দিতে হয়েছিলো। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রেই তাঁর একটি পা হারিয়েছিলেন। খালেদ মোশাররফ, শাফায়াত জামিল এবং মোস্তাফিজুর রহমানের মতো মুক্তিযোদ্ধাও সৈন্যদের সঙ্গে থেকে যুদ্ধ করতেন। এঁরা যুদ্ধে আহত হয়েছিলেন। যাঁরা নিয়মিত যুদ্ধে অংশ নিতেন তাঁদের আর দুজন রফিকুল ইসলাম আর আবদুল জলিল। একজন জুনিয়র অফিসার হয়েও রফিক অসাধারণ নেতৃত্ব এবং রণকৌশল দেখিয়েছিলেন।

তাহেরের আগেই জিয়াউর রহমানের বাহিনী কামালপুর ঘাঁটির ওপর হামলা করেছিলো। এই আক্রমণ চালানো হয় ৩১শে জুলাই ভোর রাতে। কিন্তু পাকিস্তানীদের তীব্র পাল্টা আক্রমণে এখানে ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দীন-সহ ৬৭ জন মুক্তিযোদ্ধা নিহত হন। এতে বহু পাকিস্তানী সেনাও নিহত হয়েছিলো। (জামিল, ২০০৯) জিয়া এর পর কামালপুরের ওপর আবার অভিযান চালান ১০ই অগস্ট। এবারে এই দলের নেতৃত্ব দেন ক্যাপ্টেন পাটোয়ারি। পাকিস্তানী সৈন্যরা ঘাঁটি থেকে বের হয়ে এলে তাদের ওপর হামলা করা হয়। এতে, তাহেরের মতে, বহু পাকিস্তানী সৈন্য নিহত হয় এবং বাকিরা বাধ্য হয় পিছু হটতে। (তাহের [কবির, ২০০৫])

জিয়ার নির্দেশে শাফায়াত জামিল তাঁর ৩য় বেঙ্গল রেজিমেন্ট নিয়ে বাহাদুরাবাদের ওপর অভিযান করেন ১লা অগস্ট খুব ভোরে। এ জায়গাটি ছিলো ভারতের সীমান্তে যেখানে তাঁর ঘাঁটি ছিলো, সেখান থেকে প্রায় পঁচিশ মাইল ভেতরে। আচমকা আক্রমণে পাকিস্তানী বাহিনী প্রথমে বেকায়দায় পড়ে। তার পর আধ ঘণ্টা ধরে সেখানে চলে প্রচণ্ড যুদ্ধ। বহু পাকিস্তানী সৈন্য হতাহত হয় এতে। এখানে ইপিআর-এর ভুলু মিয়া গুরুতরভাবে আহত হন। (জামিল, ২০০৯) ভুলু মিয়া ২৫শে মার্চ রাতেই দিনাজপুরের সীমান্ত আউট পোস্টে বিদ্রোহ করেছিলেন—আগেই তা উল্লেখ করেছি।

আবু তাহেরের যোদ্ধারা কোদালকাঠি দখল করেছিলেন সেপ্টেম্বরের গোড়ার দিকে। তিনি লিখেছেন যে, এই হামলায় শত্রু সৈন্যরা এমন কাবু হয় যে, তাদের অল্প কজনই গানবোটে করে পালিয়ে যেতে পেরেছিলো। বাকি সবাই নিহত হয়েছিলো। এ মাসের শেষ দিকে দুই ব্যাটেলিয়ান মুক্তিযোদ্ধা এবং ভারতীয়

মাউন্টেন ব্রিগেডের একটি 'সেকশন' নিয়ে তাহের আক্রমণ করেন চিলমারী। এখানেও ছিলো পাকিস্তানীদের একটি শক্ত ঘাঁটি। এই আক্রমণের ফলে পাকিস্তানের প্রায় এক শো সৈন্য নিহত হয়।

অক্টোবর মাসে তাহের আরও সংগঠিত যুদ্ধ পরিচালনা করেন। এ সময়ে রৌমারী, কামালপুর, জামালপুর, বাহাদুরাবাদ ঘাট, বকসিগঞ্জ ও চিলমারী এলাকায় তিনি হামলা আরও তীব্র করে তোলেন। তবে সে পর্যায়ে আক্রমণের লক্ষ্য ছিলো পাকিস্তানীদের হতাহত করা এবং অস্ত্রশস্ত্র দখল করে ফিরে যাওয়া। কোনো জায়গা ধরে রাখা নয়। ১৩ই অক্টোবর অনেক মুক্তিযোদ্ধা এবং অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তিনি দ্বিতীয়বার রৌমারী আক্রমণ করেন। এখানে বিশেষ বীরত্ব দেখান সফিকউল্লাহ, সুবেদার মান্নান, চাঁদ, দুলু, সুলেমান, নজরুল প্রমুখ। তাহেরের ভাষায় 'এরাই বাংলার সোনার ছেলে'। (তাহের [কবির, ২০০৫]) ১৩ই নভেম্বর ভোর রাতে পাঁচ কম্পেনি সৈন্য নিয়ে তিনি আক্রমণ করেন কামালপুর। তিনটি কম্পেনি তাঁর নিজের এবং দুটি ভারতীয় সৈন্যদের। ভারতের গোলন্দাজ বাহিনীও তাঁদের আচ্ছাদন দেন। এই আক্রমণে পাকিস্তানের একজন মেজর এবং তার দুই কম্পেনি সৈন্য নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তাহের নিজেও অবশ্য গুরুতরভাবে আহত হন এ দিনের যুদ্ধে—তাঁর একটি পা হারান তিনি গোলার আঘাতে। তাঁকে চিকিৎসার জন্যে হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁর বাহিনীর কম্যান্ডার হন বিমান বাহিনীর হামিদুল্লাহ।

আর-একজন সেক্টর কম্যান্ডার তাঁর বাহিনীর কৃতিত্বের কথা মোটামুটি বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি খালেদ মোশাররফ। মতিনগরে ক্যাম্প করেছিলেন তিনি। এখান থেকে তিনি যুদ্ধ চালাতেন সালদা নদী, মন্দভাগ, কসবা, বেলোনিয়া, পরশুরাম, আখাউড়া, লাকসাম ইত্যাদি জায়গায়। ঢাকাও ছিলো তাঁর অধীনে। তাঁর মতিনগরের ক্যাম্পে ট্রেনিং নিয়ে গেরিলা সদস্যরা ঢাকায় অভিযান চালিয়েছিলেন—বিভিন্ন জায়গায়। এসব অভিযান একদিকে পাকিস্তানীদের মনে ত্রাসের সঞ্চার করেছিলো, অন্যদিকে আন্তর্জাতিক মহলে সংবাদ সৃষ্টি করেছিলো। (খালেদ, ২০০৯; খালেদ [কবির, ২০০৫]) এই সফল গেরিলাদের কীর্তির কথা আগেই উল্লেখ করেছি। তবে এসব অভিযানের ফলে মুক্তিযোদ্ধাদেরও কম ত্যাগ স্বীকার করতে হয়নি। যেমন, খালেদের কম্যান্ডো সৈন্যদের একটি প্লাটুন ছিলো ৩৬ জনের। এর কম্যান্ডার ছিলেন ক্যাপ্টেন মাহবুব। যুদ্ধের শেষে ৩৬ জনের মধ্যে বেঁচে ছিলেন মাত্র ছজন। বস্তুত, মে-জুন মাসে যখন মুক্তিযুদ্ধ খানিকটা থিতিয়ে গিয়েছিলো, তখন খালেদের মুক্তিযোদ্ধারা আশার আলো উস্কে রেখেছিলেন। তাঁর সাফল্য অন্যদের মনেও উৎসাহ জাগিয়ে তুলেছে। তিনি যে তাঁর এলাকায় অতো বড়ো একটি ফিল্ড হসপিটাল গড়ে তুলতে পেরেছিলেন, সেও তাঁর অসাধারণ কৃতিত্ব।

কাদের সিদ্দিকী

একটি অভিযানের কথা তিনি বিশেষ করে উল্লেখ করেছেন। সালদা নদী রেলওয়ে স্টেশনের ওপর। এটি পরিচালনা করেছিলেন সুবেদার বেলায়েত। মাত্র ৪১ জন সৈন্য নিয়ে তিনি এই হামলা চালিয়েছিলেন। অপর পক্ষে, পাকিস্তানী সৈন্যদের সংখ্যা ছিলো সাড়ে তিন শো। তা ছাড়া, তাদের সঙ্গে ছিলো ৩৫ জন রাজাকার। বারো ঘণ্টা যুদ্ধ করে মুক্তিযোদ্ধারা চল্লিশটি বাঙ্কার দখল করেন। এখান থেকে বেলায়েত পাকিস্তানীদের প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলাগুলি উদ্ধার করেন। এর দুদিন পরে এই বীর সেনানী নিহত হন, শত্রুর ঘাঁটির খোঁজখবর নিতে গিয়ে।

উইং কম্যান্ডার এম কে বাশার অক্টোবর-নভেম্বর মাসের কয়েকটি বড়ো অভিযানের কথা লিখেছেন। যেমন, তাঁর সহযোদ্ধা নওয়াজেশ তিন কম্পেনি মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে ভুরুঙ্গামারী আক্রমণ করেন। এতে ভারতীয় সৈন্য বাহিনীরও সাহায্য নেওয়া হয়েছিলো। ভুরুঙ্গামারী ছিলো পাকিস্তানীদের একটি 'কম্পেনি'র সদর দপ্তর। আঠারো ঘণ্টা লড়াইয়ের পরে পাকিস্তানীরা এখান থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এখানকার যুদ্ধে লেফটেনেন্ট সামাদ-সহ বেশ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা নিহত হন। নওয়াজেশের বাহিনী এর পর নাগেশ্বরী দখল করেন। এ ছাড়া, লেফটেনেন্ট ইকবালের নেতৃত্বে একটি বাহিনী নীলফামারীর দিকে এগিয়ে যায়। ক্যাপ্টেন দেলোয়ারের নেতৃত্বে আর-একটি বাহিনী এগিয়ে যায় লালমনিরহাটের দিকে। এভাবে চলতে থাকে তাঁদের জয়যাত্রা। (বাশার [কবির, ২০০৫])

সিদ্দিক সালিক লিখেছেন যে, ১২ই অক্টোবরের মধ্যে সীমান্ত এলাকায় তিন হাজার বর্গমাইল মুক্তিবাহিনীর দখলে চলে যায়। এবং যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগেই ২৩৭ জন পাকিস্তানী অফিসার, ১৩৬ জন জেসিও এবং ৩৫৫৯ জন জওয়ান নিহত হয়েছিলো। (সালিক, ১৯৮৮)

১৪ই অক্টোবর শাফায়াত জামিল এবং শওকত আলি একটি বড়ো রকমের অভিযান চালান ছাতক সিমেন্ট ফ্যাক্টরিতে। তাঁদের আক্রমণে টিকতে না-পেরে পাকিস্তানী সৈন্যরা নদীর ওপারে ছাতক শহরে পিছিয়ে যায়। ক্যাপ্টেন আনোয়ার সিমেন্ট ফ্যাক্টরি দখল করে সেখানে অবস্থান নেন। এখানে পাঁচ দিন ধরে যুদ্ধ চলে। দোয়ারা বাজারের ওপর আক্রমণ করে মুক্তিযোদ্ধারা অবশ্য অনেক ক্ষয়ক্ষতির মুখোমুখি হয়েছিলেন। (জামিল, ২০০৯)

নভেম্বর মাসে পাকিস্তানের পরাজয় ঘনিয়ে আসে। ততোদিনে মুক্তিযোদ্ধারা আগের চেয়ে অনেক বেশি সংগঠিত হন। অভিজ্ঞতাও লাভ করেন যথেষ্ট পরিমাণে। ভারতের কাছ থেকে অধিকতর অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলাবারুদ পাওয়ার ফলে তাঁদের যুদ্ধ করার মতো শক্তি স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়। ট্রেনিং-প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যাও বেড়ে যায় এ সময়ে। তা ছাড়া, আগেই লক্ষ করেছি, ভারতীয় সৈন্যরা সেপ্টেম্বর মাস থেকে সীমান্ত এলাকায় বাংলাদেশের ভেতরে ঢুকেই সাহায্য করতে আরম্ভ করেছিলেন। নভেম্বর মাসে তাঁরা খোলাখুলিভাবেই এই সহায়তা দিতে থাকেন। এমন কি, এ সময়ে ভারতীয় ট্যাংকও ভেতরে চলে আসতো। এ রকমের ট্যাংক হিলি-সীমান্তে আটকে থাকা অবস্থায় দেখার জন্যে নিয়াজির সঙ্গে কয়েকজন বিদেশী সাংবাদিক সেখানে গিয়েছিলেন। (সালিক, ১৯৮৮) ভারতীয় বিমান বাহিনীও এ সময়ে মাঝেমধ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের আচ্ছাদন দিতে আরম্ভ করে।

রফিকের মতে, ৫ নভেম্বর থেকেই আসলে বড়ো রকমের যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। এ সময়ে ভারতীয় সৈন্যরা খোলাখুলি সাহায্য করতে আরম্ভ করেন। যদিও এই সাহায্য ছিলো সীমিত মাত্রায় এবং স্থানীয়ভাবে। এ মাসের প্রথম সপ্তাহে ১ নম্বর সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধারা রফিকের নেতৃত্বে বেলোনিয়া আক্রমণ করেন। এখানে ছিলো দুই ব্যাটালিয়ন পাকিস্তানী সৈন্য। পাকিস্তানীরা এক কম্পেনি সৈন্য পাঠায় মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থানের দিকে। প্রথম দিনই পাকিস্তানীদের ২৯ জন সৈন্য নিহত হয়। পিছু হটে যায় অন্যরা। পরের দিন পাকিস্তানীরা পাল্টা আক্রমণ করে সেবার জেট নিয়ে। কিন্তু সুবিধে করতে পারেনি। তারপর ১১ তারিখে তারা পালাতে চেষ্টা করলে সবাই নিহত হয় মুক্তিসেনাদের হাতে। (রফিক, ১৯৮৬)

এ সময়কার যশোর সীমান্তের বিবরণ দিয়েছেন সিদ্দিক সালিক। তাঁর মতে, ১৩ই নভেম্বর ভারতীয় সৈন্যরা বয়রায় বাংলাদেশ সীমানার মধ্যে ঢুকে সেখানেই ঘাঁটি তৈরি করেন। পাকিস্তানীরা এটা আবিষ্কার করে ছ দিন পরে—১৯ তারিখে।

তারপর দুই কম্পেনি পাকিস্তানী সৈন্য এঁদের হটাতে চেষ্টা করে। কিন্তু তারা নিজেরাই ফিরে যায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে। শক্তি বৃদ্ধি করে দু দিন পরে ২১ তারিখ ভোর বেলায় পাকিস্তানীরা আবার আক্রমণ করে। তখন তারা এও জানতো না যে, ভারতীয় বাহিনী ছিলো ট্যাংক-সজ্জিত। এই ট্যাংক থেকে গোলা ছুঁড়লে সেখানে তুমুল লড়াই শুরু হয়। তিনটি সেবার জেট আসে পাকিস্তানীদের সহায়তায়। কিন্তু দুটি জেট এবং সবগুলো ট্যাংক খুইয়ে পাকিস্তানীরা পিছু হটে। (সালিক, ১৯৮৮)

সালিকের মতে, এই সপ্তাহে ভারতীয় সৈন্যসহ মুক্তিযোদ্ধারা আক্রমণ চালান সিলেটের আটগ্রাম ও জকিগঞ্জ, রংপুরের হিলি এবং দিনাজপুরের পঞ্চগড়ে। তিনি বলেন, মুক্তিবাহিনী নবাবগঞ্জ থানা দখল করে নেন ২৯শে নভেম্বর। এ ছাড়া, মীর শওকত আলী লিখেছেন ২৮শে নভেম্বর ট্যাংরাটিলা অভিযান করার কথা। নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে অন্য একটি দুঃসাহসিক অভিযানের কথা লিখেছেন শাফায়াত জামিল।

২১শে নভেম্বর জামিলের বাহিনী ভারতীয় কম্যান্ডের অধীনে আসে। জেনারেল গিল হলেন তাঁদের কম্যান্ডার। তাঁর নির্দেশে নভেম্বরের শেষে শাফায়াত জামিলের বাহিনী নিয়ে গুর্খা রেজিমেন্ট রাধানগর এবং ছোটখেলের ওপর আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধে গুর্খারা ছোটখেল অল্প সময়ে জন্যে দখল করেন। কিন্তু তারপর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে সেখান থেকে পিছু হটেন। তাঁদের ৪ জন অফিসার এবং অন্য ৬৭ জন সৈন্য হতাহত হন। পরের দিন ৩য় বেঙ্গল রেজিমেন্ট নিয়ে জামিলের বাহিনী অসাধারণ সাহস এবং উদ্যমের সঙ্গে আক্রমণ করে ছোটখেল দখল করেন। 'তৃতীয় বেঙ্গলের ডেল্টা কোম্পানি প্রমাণ করলো বেঙ্গল রেজিমেন্টের যোদ্ধারা বিশ্বের অন্য যে-কোনো রেজিমেন্টের তুলনায় কোনো অংশে কম নয়। ... গ্রামের সর্বত্র পাকিস্তানি সৈন্যদের মৃতদেহ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে ছিলো। ছোটখেল দখলের পর পাকসেনাদের প্রচুর অস্ত্র, গোলাবারুদ ও খাদ্যসামগ্রী ডেল্টা কোম্পানির হাতে আসে, যা দিয়ে অন্তত কয়েক মাস যুদ্ধ করা সম্ভব। পাকসেনাদের বাঙ্কারগুলোতে চারজন ধর্ষিত মহিলার লাশ পাওয়া গেলো।' জামিল নিজে এই যুদ্ধে গুরুতরভাবে আহত হন। (জামিল, ২০০৯)

নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে দেশের অন্য প্রান্তে—দিনাজপুরের হিলি এলাকায়ও প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। ২৭শে নভেম্বর এখানকার পাকিস্তানী বাহিনী ভারতীয় অবস্থানের ওপর ট্যাংক নিয়ে বিরাট হামলা করে। এতে পাকিস্তানের প্রায় ৮০ জন সৈন্য নিহত হয় এবং ৪টি ট্যাংক ধ্বংস হয়। পরের দিন নিহত হয় আরও পাকিস্তানী সৈন্যরা। তা ছাড়া, তাদের তিনটি ট্যাংক আটক করা হয়। পাকিস্তানীদের তাড়া করে ভারতীয় সৈন্যরা বাংলাদেশের কয়েক মাইল ভেতরে ঢুকে পড়ে। (রফিক, ১৯৮৬)

মোট কথা, নভেম্বর মাসের শেষ দিক থেকেই ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে শুরু হয়েছিলো অঘোষিত যুদ্ধ। এ সময়ে এক দিকে পাকিস্তান যেমন একটা যুদ্ধ শুরু

খালেদ মোশাররফ

করতে চাইছিলো, অন্যদিকে, ভারতও বাংলাদেশের বিভিন্ন সীমান্তে গোলাগুলি করে এবং মুক্তি বাহিনীর সাহায্যে হামলা করে পাকিস্তানকে যুদ্ধ শুরু করার জন্যে উস্কানি দিচ্ছিলো। ভারত-পাকিস্তানের পশ্চিম সীমান্তেও উত্তেজনা দেখা দিয়েছিলো। ইন্দিরা গান্ধী এর আগেই উনিশ দিন ধরে পশ্চিমা দেশগুলো সফর করে দেশে ফিরে এসেছিলেন। বাংলাদেশের রাস্তাঘাটও ততোদিনে বেশ শুকিয়ে গিয়েছিলো। একটা পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধের জন্যে যা যা দরকার, সব কিছু নিয়েই ভারত তৈরি হয়েছিলো। বাকি ছিলো কেবল আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধ শুরু হওয়া। তবে ভারত কিছুতেই আগে আক্রমণ করতে চাইছিলো না। কারণ, তা হলে তার দুর্নাম হতো আক্রমণকারী এবং আগ্রাসী বলে।

পাকিস্তান শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ শুরু করে তেসরা ডিসেম্বর। আগে থেকেই আক্রমণ করে ভারতের বিমান বাহিনীকে ক্ষতিগ্রস্ত করে বেকায়দার ফেলার জন্যে যুদ্ধ ঘোষণা না-করেই পাকিস্তান পশ্চিম সীমান্তে ভারতীয় কয়েকটি বিমান ঘাঁটির ওপর হামলা চালায়। কিন্তু ভারতীয় বাহিনী পুরোপুরি তৈরি ছিলো এই হামলার জন্যে। ফলে ভারতীয় বিমান বাহিনীর কোনো ক্ষতি হয়নি। বরং কয়েকটি পাকিস্তানী জঙ্গীবিমান ভারতীয় বাহিনীর হাতে বিধ্বস্ত হয়।

এদিন ইন্দিরা গান্ধী ভাষণ দিতে এসেছিলেন কলকাতায়। আক্রমণের সংবাদ শুনে তিনি দ্রুত ফিরে যান দিল্লিতে। সেখান থেকে রাত ১২টা ৪০ মিনিটের সময় তিনি বেতার ভাষণ দেন। এতে তিনি পাকিস্তানের আক্রমণের কথা উল্লেখ করেন।

তারপর সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা না-করেই বলেন যে, দেশকে তিনি যুদ্ধাবস্থায় রাখতে বাধ্য হচ্ছেন। পরের দিন থেকে আরম্ভ হলো ভারত-পাকিস্তান সম্মুখ যুদ্ধ, বাঙালিরা যার প্রতীক্ষা করেছিলেন ন মাস ধরে।

ওদিকে, নিয়াজী ঢাকায় বসে মূর্খের স্বর্গে বাস করছিলেন। তাঁর ধারণা ছিলো যে, পাকিস্তানের সৈন্যরা পৃথিবীর যে-কোনো সেনাবাহিনীর তুলনায় শ্রেষ্ঠ। তা ছাড়া, তাদের ছিলো অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র। সুতরাং তাদের কেউ হারাতে পারবে না। তদুপরি, তাঁকে বোধ হয় এমন ধারণা দেওয়া হয়েছিলো যে, তিনি কি দিন ভারতীয় সৈন্যদের ঠেকিয়ে রাখতে পারলে ততোদিনে মার্কিন এবং চীনা সাহায্য এসে যাবে। চীন ভারতের ওপর আক্রমণ করবে উত্তর দিক থেকে। আর মার্কিন সপ্তম নৌবহর আক্রমণ করবে বঙ্গোপসাগরের দিকে থেকে। তাঁর আরও ধারণা হয়েছিলো যে, ভারত যথেষ্টসংখ্যক সৈন্য নিয়ে আক্রমণ করছে না। সত্যি সত্যি আক্রমণ করতে হলে সাধারণত তিন গুণ সৈন্য নিয়ে করতে হয়। কিন্তু ভারতের সৈন্য ছিলো পাকিস্তানের দ্বিগুণ। তাই তাদের ঠেকিয়ে রাখা কঠিন হবে না। নিয়াজী এ জন্যে 'দুর্গ-প্রতিরোধ' কৌশল গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি ভাবেননি যে, ভারতের ছিলো তিনটা বাড়তি শক্তি। মুক্তিবাহিনীতে ছিলো দুই ডিভিশনের চেয়ে বেশি প্রশিক্ষিত সৈন্য। সেই সঙ্গে ছিলেন প্রায় এক লাখ গেরিলা। আর ছিলেন দেশের তাবৎ মানুষ।

যশোর, ঝিনাইদহ, বগুড়া, রংপুর, জামালপুর, ময়মনসিংহ, সিলেট, ভৈরববাজার, কুমিল্লা এবং চট্টগ্রাম—এই ৯টি জায়গায় নিয়াজী 'দুর্গ' তৈরি করলেন। এসব জায়গায় মজুদ রাখা হলো দু মাস যুদ্ধ করার মতো অস্ত্রশস্ত্র। আর দেড় মাস চলার মতো খাদ্য। তারপর বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে সৈন্যদের ছড়িয়ে দিলেন এসব দুর্গের চারদিকের জায়গাগুলোতে। কৌশল নিলেন যে, যুদ্ধকে দীর্ঘস্থায়ী করার জন্যে সীমান্তে সৈন্যরা লড়তে থাকবে। (সালিক, ১৯৮৮) নাটোরে করা হলো উত্তর-পশ্চিম সেক্টরের সদর দপ্তর। পশ্চিম সেক্টরের সদর দপ্তর হলো যশোর। উত্তর সেক্টরের মধ্যে থাকলো উত্তর সীমান্ত থেকে ঢাকা জেলা পর্যন্ত। এর মধ্যে 'দুর্গ' থাকলো জামালপুর, সিলেট আর ময়মনসিংহে। পুব সেক্টর তৈরি হলো ভৈরববাজার, কুমিল্লা আর চট্টগ্রাম নিয়ে। নিয়াজীর নির্দেশ ছিলো যে, সৈন্যদের তিন-চতুর্থাংশ হতাহত না-হওয়া পর্যন্ত তার কোনো বাহিনী যেন পিছু না-হটে। আর যদি পিছিয়ে আসতেই হয়, তা হলে তারা জায়গা নেবে 'দুর্গে'র ভেতরে। অতঃপর সেই শক্ত অবস্থান থেকে যুদ্ধ চালিয়ে যাবে তারা। নিয়াজীর আরও নির্দেশ ছিলো যে, গত্যন্তর না-থাকলে তারা ঢাকায় ফিরে আসবে। এ কারণে ঢাকা রক্ষা করার জন্যে তিনি তেমন কোনো আলাদা ব্যবস্থা নেননি।

ভারতীয় সৈন্যদের পূর্বাঞ্চলের কম্যান্ডার ছিলেন লেফটেনেন্ট জেনারেল জগজিৎ সিংহ অরোরা। তিনি আদৌ নিয়াজির প্রত্যাশা অনুযায়ী আক্রমণ

পরিচালনা করেননি। সীমান্ত যুদ্ধ নিয়ে ব্যস্তও রাখতে চাননি তাঁর সৈন্যদের। সীমান্তে যুদ্ধ চলতে থাকলো ঠিকই। কিন্তু তাঁর লক্ষ্য ছিলো যদ্দুর সম্ভব দ্রুত ঢাকা দখল করা। যাতে আন্তর্জাতিক সমাজ কোনো আপোশের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়ার সময় না-পায়। তাই ঢাকার উদ্দেশে তিনি তাঁর সেনাদের পাঠান তিন দিক থেকে। পশ্চিম দিক দিয়ে তাঁর সৈন্যরা ঢুকলেন যশোর, কুষ্টিয়া আর দিনাজপুরের দিক দিয়ে। উত্তরে এলেন রংপুর আর কামালপুরের দিক দিয়ে। আর পুবে এলেন সিলেট আর আগরতলার দিক দিয়ে। সীমান্তের এতো জায়গা দিয়ে মুক্তিবাহিনী আর ভারতীয় সৈন্যরা ঢুকে পড়লেন যে, পাকিস্তানী সৈন্যরা তার হদিস রাখতে পারলো না। একে-একে তাদের ঘাঁটিগুলোর পতন হতে থাকলো যৌথ বাহিনীর হাতে।

যৌথ বাহিনী যুদ্ধ করছিলো দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে। এক দল থাকলো সীমান্ত যুদ্ধ করার জন্যে। তাঁরা সীমান্ত অঞ্চলে যুদ্ধ করতে থাকলেন। ব্যস্ত রাখলেন বিভিন্ন 'দুর্গে'র পাকসেনাদের। কিন্তু যৌথ বাহিনীর প্রধান ভাগেরই লক্ষ্য ছিলো : 'চলো চলো, ঢাকা চলো।' বিভিন্ন দিক দিয়েই তাঁরা নিয়াজীর 'দুর্গ'গুলোর পাশ কাটিয়ে ঢাকার দিকে এগিয়ে যেতে থাকেন। তা ছাড়া, ঢাকার পথে যাওয়ার সময় তাঁরা সৃষ্টি করেন সড়ক-অবরোধ। যাতে সীমান্তের কোনো 'দুর্গ' থেকে পাকিস্তানী বাহিনী ঢাকার দিকে যেতে না-পারে। ফলে এক দিকে সীমান্তে যুদ্ধ চলতে থাকলো, অন্যদিকে অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকলো ঢাকার পথে।

ভারত কেবল স্থলপথে তিন দিক থেকে আক্রমণ করেনি। বঙ্গোপসাগরের দিক থেকেও আক্রমণ করেছিলো বিমানবাহী জাহাজ 'বিক্রান্ত' নিয়ে। এই 'বিক্রান্ত' থেকেই ভারতীয় বিমানগুলো হামলা চালাতে থাকে ঢাকা এবং অন্যান্য জায়গায়। এ ছাড়া, বঙ্গোপসাগরে নৌসেনাদেরও মোতায়েন করা হয়েছিলো। নৌবাহিনীর ওপর ছিলো দুটো দায়িত্ব—বঙ্গোপসাগরের দিক থেকে কেউ যাতে পাকিস্তানকে সাহায্য করতে না-পারে, আর পাকিস্তানীরা যাতে বঙ্গোপসাগরের দিক দিয়ে পালিয়ে যেতে না-পারে।

পাকিস্তানী বাহিনী ছিলো আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। সৈন্যসংখ্যাও কম ছিলো না। যুদ্ধশেষে যুদ্ধবন্দীর সংখ্যা ছিলো ৯১ হাজার ৪৯৮ জন। আর এদের মধ্যে নিয়মিত সৈন্যই ছিলো ৫৬ হাজার ৯৯৮ জন। (মঈদুল, ১৯৯২) তবে নিয়াজীর মতে, নিয়মিত সৈন্য-সহ পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীতে ৪৫ হাজারের বেশি লোক ছিলো না। (নিয়াজী, ২০০৮) তা সত্ত্বেও পাকিস্তানীরা যে হেরে যায়, তার অনেকগুলো কারণ ছিলো। যেমন, তারা ভেবেছিলো যে, শুধু মাত্র গায়ের জোরে তারা বাঙালিদের শাসন করবে। ভেবেছিলো, দেশ শাসনে তাবৎ বাঙালির সমর্থন দরকার নেই। কিছু বাঙালি দালাল থাকলেই চলবে। হাজার হাজার দালাল তারা জোটাতেও পেরেছিলো। জুটিয়ে ছিলো সশস্ত্র দালাল বাহিনী—রাজাকার, আল

বদর এবং আল শামস। সব মিলে এদের সংখ্যা প্রায় এক লাখ ছিলো বলে অনেকে লিখেছেন। কিন্তু এই দালালরা ছিলো জনগণের একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। এ রকমের দালালদের একটি দল দিয়ে যে শাসন টিকিয়ে রাখা যায় না, তার একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন সিদ্দিক সালিক। একটি থানায় ৫৭ জন বাঙালিকে পাকিস্তানী যোদ্ধা হিশেবে নিয়োগ করা হয়েছিলো। তাঁদের রাজনৈতিক আনুগত্য আগে থেকে ভালো করে যাচাই করা হয়েছিলো। তা সত্ত্বেও, তাঁরা ঐ থানায় অবস্থিত ৩১ জন পাকিস্তানী যোদ্ধা—সবাইকেই হত্যা করে ২৯শে অক্টোবর। (সালিক, ১৯৮৮)

অপর পক্ষে, মুক্তিযোদ্ধাদের আন্তরিক সমর্থন এবং সাহায্য দিয়েছিলেন কোটি কোটি বাঙালি। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ—দুভাবেই সাহায্য দিয়েছেন। পাইকারিভাবে হত্যা, নির্যাতন, ব্যাপক ধর্ষণ, বাড়িঘরে আগুন লাগানো, লুটপাট—বাঙালিদের স্বাভাবিকভাবেই দারুণ ক্ষুব্ধ করেছিলো। কাজেই যখন তাঁরা সুযোগ পেয়েছেন, তখনই পাকিস্তানীদের বিরোধিতা করতে কুণ্ঠিত হননি। অনেকে বাইরে ভয়ে পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্য দেখিয়েছেন। সালিকের মতে, অনেকের বাড়িতে পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ—উভয় পতাকাই থাকতো। কিন্তু তাঁদের আসল আনুগত্য ছিলো বাংলাদেশের প্রতি। যাঁরা সত্যিকারভাবে পাকিস্তানের সমর্থন করতেন—বিশেষ করে ধর্মীয় কারণে—তাঁরাও অমানুষিক নির্যাতন দেখে পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্য হারিয়ে ফেলেন।

অন্যদিকে, জনগণের সমর্থন থাকলে অসাধ্য সাধন করা সম্ভব হয়। এর তিনটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। মিত্রবাহিনী যাতে ঢাকার দিকে দ্রুত এগিয়ে যেতে না-পারে, তার জন্যে অনেক জায়গায় সেতু উড়িয়ে দিয়েছিলো পাকিস্তানীরা। যেমন, মধুমতি, মেঘনা, শোভাপুর এবং তুরাগ নদীর ওপরকার সেতু। কিন্তু সব জায়গাতেই সাধারণ মানুষ এগিয়ে আসেন 'যার যা কিছু আছে' তা-ই নিয়ে মিত্রবাহিনীকে সাহায্য করার জন্যে। শত শত নৌকো চলে আসে চারদিক থেকে। তাতে পাড়ি দেয় মিত্রবাহিনী। এমন কি, কুষ্টিয়া থেকে ফরিদপুরের পথে এবং উত্তর বঙ্গ থেকে টাঙ্গাইলের পথে গোরুর গাড়িতে চড়ে মিত্রবাহিনী দুর্গম এলাকা পার হন। পার করা হয় তাঁদের ভারী অস্ত্রশস্ত্র। এর উল্টো দৃষ্টান্ত দিয়েছে সিদ্দিক সালিক। তিনি লিখেছেন যে, ময়মনসিংহ থেকে টাঙ্গাইল হয়ে যখন পাকিস্তানীরা ঢাকার দিকে যাত্রা করে, তখন গ্রামবাসীরা তাদের পানিও খেতে দেননি। (সালিক, ১৯৮৮)

নদীনালা, হাওর-বিলে পরিপূর্ণ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক অবস্থাও যুদ্ধে পাকিস্তানীদের সহায়তা করেনি। বাঙালিদের ভাষাও তাদের জানা ছিলো না। বীর উত্তম রফিকুল ইসলাম এক নিহত পাকসেনার একটি পত্র উদ্ধৃত করেছেন। তা থেকে দেখা যায়, অস্ত্রশস্ত্র-গোলাবারুদ তারা ঠিকমতো পেতো। কিন্তু অত্যন্ত

প্রয়োজনীয় খাবারও ঠিকমতো সরবরাহ করা হতো না। খাবার জোটাতে হতো ধারে-কাছের গ্রাম থেকে লুটপাট করে। তদুপরি, অফিসাররা তাদের সঙ্গে থাকতো না। ফলে সাধারণ সৈন্যদের মনোবল একেবারে ভেঙে পড়েছিলো। ঘাঁটির বাইরে যেতে ভয় পেতো তারা। (রফিক, ১৯৮৬) নিয়াজী বলেছিলেন যে, তিনি সর্বশেষ মানুষটি এবং সর্বশেষ গুলিটি নিয়ে লড়াই করবেন। আর, ঢাকার পতন হবে একমাত্র তাঁর মৃতদেহের ওপর। (সালিক, ১৯৮৮) কিন্তু কার্যকালে দেখা গেলো তাঁর সৈনিকরা ছিলো নৈতিক বলহীন, তাদের অস্ত্র ছিলো সেকেলে, সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিলো না এবং যুদ্ধ করার কোনো ইচ্ছাই ছিলো না তাদের। (সালিক, ১৯৮৮)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন এবং কিছু মুসলিম রাষ্ট্র ছাড়া আন্তর্জাতিক সমাজেও পাকিস্তানের কোনো সমর্থন ছিলো না। তার ওপর, অংশত শরণার্থী সমস্যা থেকে বাঁচার জন্যে, অংশত পাকিস্তানকে দু ভাগ করার সুবর্ণ সুযোগ নেওয়ার জন্যে বাংলাদেশকে ভারত যদ্দুর সম্ভব সাহায্য করেছিলো। এ সাহায্য কেবল যুদ্ধক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিলো না। আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক ক্ষেত্রেও সে অসাধারণ সহায়তা দিয়েছিলো। বস্তুত, ভারতের সাহায্য ছাড়া বাংলাদেশের পক্ষে অতো দিন যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হতো না। অথবা শুধু গেরিলা যুদ্ধ দিয়েও '৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হতে পারতো না।

ডিসেম্বরের যুদ্ধ

তেসরা ডিসেম্বর ইন্দিরা গান্ধী দেশকে 'যুদ্ধাবস্থায়' নিয়ে যান রাত বারোটা চল্লিশে। তার মাত্র সওয়া ঘণ্টা পরে ভারতীয় জঙ্গীবিমান হামলা চালায় ঢাকা এবং কুর্মিটোলা বিমানবন্দরের ওপর। এই হামলাগুলো এতো সফল হয়েছিলো যে, প্রথম দুদিনের মধ্যেই পাকিস্তানের বিমানবাহিনী পুরোপুরি অকেজো হয়ে গিয়েছিলো। কারণ, এর পর জঙ্গীবিমান থাকলেও, সেগুলো ওড়ার কোনো উপায় ছিলো না। ঢাকা এবং কুর্মিটোলা বিমানবন্দরের রানওয়ে বোমার আঘাতে ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে গিয়েছিলো। এর পরে পাকিস্তানের ছিলো কেবল কয়েকটি হেলিকপ্টার।

কেবল ঢাকার ওপর নয়, দেশের অন্য জায়গাতেও ৪ তারিখ ভোর বেলা থেকেই ভারত প্রচণ্ড বিমান-হামলা চালাতে আরম্ভ করে। এ দিন সকালে যেমন কয়েকটি 'সীহক' বিমান হামলা চালিয়েছিলো চট্টগ্রাম আর কক্সবাজারের ওপর। ঢাকা এবং অন্য শহরগুলো ছিলো বিমানবাহী যুদ্ধজাহাজ 'বিক্রান্তে'র কাছাকাছি। কাজেই এই জাহাজকেই ব্যবহার করা হয় বিমান হামলার ঘাঁটি হিশেবে। বস্তুত, ডিসেম্বরের যুদ্ধে 'বিক্রান্ত' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলো।

ওদিকে, ভারত তার ছয় ডিভিশন স্থল সৈন্যদের সমাবেশ ঘটিয়েছিলো কৃষ্ণনগর, শিলিগুড়ি আর গৌহাটিতে। বাংলাদেশের যোদ্ধাদের নিয়ে ভারতীয় সৈন্যরা বাংলাদেশে ঢুকে পড়েন একই সঙ্গে পশ্চিম, উত্তর-পশ্চিম, উত্তর, উত্তর-পূর্ব এবং পূর্ব সীমান্ত দিয়ে। কিভাবে নানা দলে বিভক্ত হয়ে যৌথ বাহিনীর সৈন্যরা বাংলাদেশে প্রবেশ করেন নানা পথে, তার বর্ণনা দিয়েছেন ভারতের মেজর জেনারেল লছমন সিংহ।

বনগাঁ-যশোর-মাগুরা-ফরিদপুর
বালুরঘাট-গোবিন্দগঞ্জ-বগুড়া-বেড়া

শিলিগুড়ি-দিনাজপুর-রংপুর-বগুড়া
জলপাইগুড়ি-ডোমার-রংপুর-বগুড়া
তুরা-জামালপুর-টাঙ্গাইল-ঢাকা
তুরা-ময়মনসিংহ-টাঙ্গাইল-ঢাকা
শিলং-সিলেট
কৈলাসশহর-মৌলভীবাজার-সিলেট
আগরতলা-আখাউড়া-আশুগঞ্জ
সোনামুড়া-কুমিল্লা-দাউদকান্দি
কুমিল্লা-লালমাই-চাঁদপুর
চৌদ্দগ্রাম-লাকসাম-চাঁদপুর (লছমন, ১৯৮১)

আর-একটু বিস্তারিতভাবে উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে উত্তর-পশ্চিম বাংলাদেশ থেকে। এখানে একটি বাহিনী ঢোকে কোচবিহার থেকে রংপুরের অভিমুখে। একটি ঢোকে পঞ্চগড় দিয়ে, যার লক্ষ্য ছিলো ঠাকুরগাঁও হয়ে কান্তনগর দখল করা। অন্য একটি দলের লক্ষ্য হয় কান্তনগর হয়ে দিনাজপুর দখল করা। এবং তারপর দুই দল মিলে সৈয়দপুরের দিকে এগিয়ে যাওয়া। একটি বাহিনী হামলা করে বালুরঘাট থেকে হিলির ওপর। অন্য একটি বাহিনীর এগিয়ে যায় ফুলবাড়ী-পলাশবাড়ী হয়ে গাইবান্ধার দিকে। তাদের একাংশের আবার দায়িত্ব থাকে দিনাজপুর দখল করা।

একই রকম, পশ্চিম সীমান্তেও বিভিন্ন জায়গা দিয়ে মিত্রবাহিনী প্রবেশ করে বাংলাদেশের ভেতরে। একটি বাহিনী ঢোকে বালুরঘাট সীমান্ত দিয়ে। একটি কলাম প্রবেশ করে কুষ্টিয়া সীমান্ত দিয়ে। তারা তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, যশোর এবং খুলনার দিকে যাত্রা করে। একটি দল এগিয়ে যায় দর্শনা- মেহেরপুরের দিকে। অন্য একটি দল বয়রা সীমান্ত দিয়ে যাত্রা করে যশোরের দিকে।

উত্তর দিক থেকে মিত্রবাহিনী অভিযান চালায় তুরা থেকে বকসিগঞ্জ, শেরপুর, জামালপুর, ময়মনসিংহ এবং টাঙ্গাইল দখল করে যদ্দুর সম্ভব কম সময়ের মধ্যে ঢাকায় প্রবেশ করার উদ্দেশ্য নিয়ে। এই দল অগ্রসর হয় শ্যামনগর হয়ে ব্রহ্মপুত্রের দিকে। উত্তর-পুবে সিলেটের ওপর মিত্রবাহিনী হামলা করে একই সঙ্গে চারটি দিক থেকে। আর, পুব দিকে আগরতলা থেকে একটি বাহিনী আক্রমণ করে আখাউড়ার ওপর। তাঁদের লক্ষ্য ছিলো ব্রাহ্মণবাড়িয়া হয়ে ভৈরববাজারের দিকে এগিয়ে যাওয়া।

চার তারিখ খুব ভোর থেকেই ভারত এবং বাংলাদেশের স্থল বাহিনী একযোগে আক্রমণ চালায় বাংলাদেশের বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুর ওপর। শহরগুলোর বাইরে যেসব জায়গায় পাকিস্তানীরা ঘাঁটি গেড়েছিলো, তার ওপরও অভিযান চালানো হয়। প্রথম দিনই মিত্রবাহিনীর হাতে পতন হয় পঞ্চগড়, বকসিগঞ্জ আর শমসেরনগর
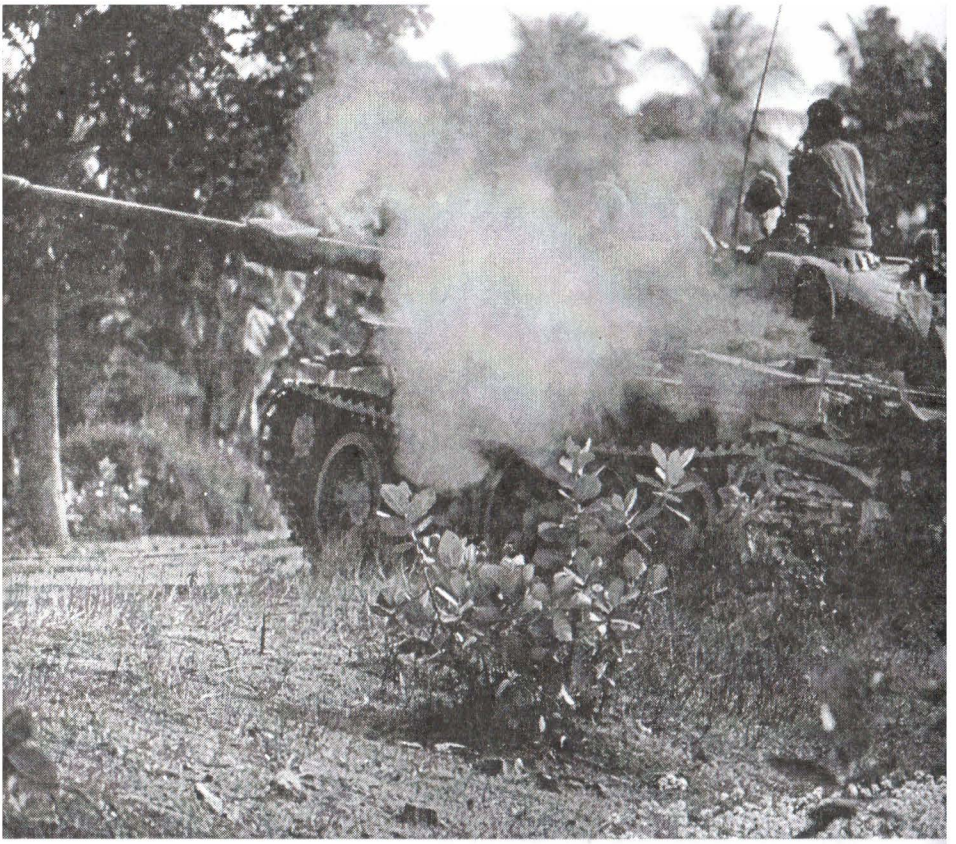
ডিসেম্বরের যুদ্ধ

বিমানক্ষেত্রের। তবে এদিন মিত্রবাহিনী বিনা বাধায় এগিয়ে যায়নি, ক্ষয়ক্ষতিরও সম্মুখীন হয় কোনো কোনো জায়গায়। যেমন, হিলিতে পাকিস্তানীরা পাকা বাংকার-সহ শক্ত ঘাঁটি নির্মাণ করেছিলো। এ ছাড়া, ভারী কামান এবং অনেকগুলো ট্যাংক ছিলো তাদের। তুমুল যুদ্ধে এদিন এখানে ভারতের ৪ জন অফিসার, ৩ জন জুনিয়র কমিশন অফিসার (জেসিও) এবং অন্যান্য ৬১ জন সৈন্য নিহত হন। আহত হন তার চেয়েও বেশি।

উত্তরে কামালপুরও ছিলো পাকিস্তানীদের আর-একটি শক্ত ঘাঁটি। অগস্ট মাস থেকে এখানে অনেকবারই মুক্তিযোদ্ধারা হামলা করেছেন, কখনো তাহেরের অধীনে, কখনো জিয়াউর রহমানের নির্দেশে। এবং প্রতিবারই পাকিস্তানের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি করা সম্ভব হয়েছিলো। কিন্তু বারবারই পাকিস্তানীরা ফিরে এসেছে এখানে। চৌঠা ডিসেম্বর এই কামালপুরে মিত্রবাহিনীর অনেক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছিলো। ভারতীয় বাহিনী তাই বিমানের আচ্ছাদন চেয়ে পাঠায়। তাতে সাড়া দিয়ে এখানে প্রথম বিমান হামলা চালানো হয় সকাল সাড়ে নটায়। তারপর ঐ দিনই আরও দুবার। দুদিন ধরে তীব্র লড়াইয়ের পরে ছ তারিখে কামালপুরের

পতন হয় মিত্রবাহিনীর কাছে। এক বিস্ফোরণে এই সেক্টরের কম্যান্ডিং অফিসার মেজর জেনারেল গিল এবং ব্রিগেডিয়ার ক্লের গুরুতরভাবে আহত হন এ সময়ে। গিলের দায়িত্ব গ্রহণ করেন মেজর জেনারেল গন্ধর্ব নাগরা। কদিন পরে ইনিই মিত্রবাহিনীর হয়ে সবার আগে ঢুকেছিলেন ঢাকা নগরীতে। কামালপুর এবং বকসিগঞ্জে বিজয়ী হয়ে মিত্রবাহিনী এগিয়ে যায় শেরপুর-জামালপুরের দিকে। এঁদেরই একটি অংশ অগ্রসর হয় শ্যামনগরের দিকে।

দ্বিতীয় দিন—পাঁচই ডিসেম্বর—মিত্রবাহিনী দখল করে কুষ্টিয়ার কোটচাঁদপুর, জীবননগর এবং দর্শনা। দখল করে যশোরের ঝিকরগাছা এবং যশোর-ঝিনাইদহ সড়ক। ঢাকার বাইরে পাকিস্তানের সবচেয়ে শক্ত ঘাঁটি ছিলো যশোরের ক্যান্টনমেন্ট। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে এদিনই তার ভিত্তি নড়ে যায় কোনো আক্রমণ ছাড়াই। পরের দিন ছ তারিখে এখানকার পাকিস্তানী কম্যান্ডার ঘাঁটি ছেড়ে সৈন্যদের নিয়ে পালিয়ে যান মাগুরায়। পাঁচ তারিখ উত্তরে পতন ঘটে পীরগঞ্জ, খানপুর, কাঞ্চনদহ, বোদা, চরখাই, ফুলবাড়ী আর নবাবগঞ্জের। কিন্তু হিলিতে দারুণ যুদ্ধ চলতে থাকে। তবে মিত্রবাহিনীর একটি বড়ো অংশই হিলিকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যায় গাইবান্ধার দিকে।

ওদিকে, দেশের উল্টো দিকে—পুব-সীমান্তে দ্বিতীয় দিনের গুরুত্বপূর্ণ বিজয় হলো বেলোনিয়ায়। এই বেলোনিয়া ছিলো এমন একটা জায়গা যেখানে মুক্তিযুদ্ধের ন মাসই মুক্তিযোদ্ধারা বারবার হামলা চালিয়েছিলেন। এখানকার বিজয়ী মিত্রবাহিনীই পাঁচ তারিখ রাতের বেলায় দখল করে নিয়েছিলো ফেনী। ফেনী দখলের পর তাঁরা এগিয়ে যান ছাগলনাইয়া-চট্টগ্রামের দিকে।

পরের দিন পতন হয় আখাউড়ার। আখাউড়ার ওপর ভারতের ১৪ নম্বর গার্ড ব্রিগেড আক্রমণ করেছিলো ৪ তারিখ খুব ভোরে। তারা গঙ্গাসাগরের কাছে শত্রুর মুখোমুখি হন। বাঁ দিকের একটি অগ্রবর্তী কম্পেনির সঙ্গে ছিলেন ল্যান্স নায়ক অ্যালবার্ট এক্কা। এ সময়ে পাকিস্তানীরা ভারী এবং হালকা—উভয় ধরনের অস্ত্র দিয়েই পাল্টা হামলা চালাচ্ছিলো। বিশেষ করে একাধিক মেশিন গানের আক্রমণের মুখে ভারতীয় সৈন্যরা সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারছিলেন না। তারই মধ্যে এক্কা নিজের নিরাপত্তার কথা না-ভেবে মেশিন গান যে-বাঙ্কারে ছিলো, তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। তিনি নিজে আহত হলেও দুজন পাকসৈন্যকে বেয়োনেট দিয়ে হত্যা করেন। তারপর তিনি এবং তাঁর সঙ্গীরা একের পর বাঙ্কার দখল করতে করতে দেড় কিলোমিটার এগিয়ে যান। এ সময়ে একটি সুরক্ষিত দোতলা বাড়ির দোতলা থেকে পাকসেনারা বৃষ্টির মতো গুলি ছুঁড়ছিলো একটি মিডিয়াম মেশিন গান থেকে। এর আঘাতে এক্কা আবার আহত হন। ভারতীয় অন্য সৈন্যরাও বেকায়দায় পড়েন। কিন্তু আহত অ্যালবার্ট এক্কা দমে যাননি। আবার বুকে হেঁটে তিনি এগিয়ে যান এই বাড়িটির দিকে। সেখানে গিয়ে বাঙ্কারের ওপর ছুঁড়ে দেন

একটি গ্রেনেড। ফলে একজন নিহত এবং অন্যরা আহত হয়। কিন্তু তখনো দোতলার মেশিন গান বন্ধ হয়নি। এক্কা তখন এই বাড়ির পাশের দেয়াল বেয়ে উপরে ওঠেন। তারপর বাংকারে ঝাঁপিয়ে পড়ে বেয়োনেট দিয়ে আক্রমণ করেন মেশিন গান-চালককে। নীরব হয়ে যায় মেশিন গান। কিন্তু দুবার আহত এক্কা অল্প পরেই মারা যান। যুদ্ধের পর ভারতের সর্বোচ্চ সামরিক খেতাব দেওয়া হয় তাঁকে—'পরম বীরচক্র'।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, সাড়ে তিন হাজারের বেশি ভারতীয় সৈন্য নিহত হয়েছিলেন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের হয়ে লড়াই করতে গিয়ে। এই তাবৎ সৈন্যের একটি তালিকা আছে সালাম আজাদের গ্রন্থ *কন্ট্রিবিউশন অব ইন্ডিয়া ইন দ্য ওঅর অব লিবারেশন অব বাংলাদেশ* (২০০৬) গ্রন্থে, পৃ. ৩২৫-৪৮১। ৭৪টি বিমান এবং হেলিকপ্টারও হারিয়েছিলো ভারত। ট্যাংক-সহ বহু সরঞ্জামও নষ্ট হয়েছিলো ভারতের। বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর অবদান যেমন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়, তেমনি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় ভারতীয় সৈন্যদের প্রাণ বিসর্জন।

গঙ্গাসাগরের পতনের ফলে পাকিস্তানীরা খুবই বেকায়দায় পড়ে। দুদিন পরে তারা আখাউড়া থেকে পালিয়ে যায়। আখাউড়া দখলের পর মিত্রবাহিনীর একটি দল যাত্রা করে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে। এই অঞ্চলেই কুমিল্লা আর লাকসামে পাকিস্তানীরা আগে থেকেই দীর্ঘদিন ধরে প্রস্তুতি নিয়ে শক্ত ঘাঁটি তৈরি করেছিলো, যশোরের মতো। তাই এই দুর্গ দখল না-করে মিত্রবাহিনীর একটি দল এখানে ব্যস্ত রাখে পাকসেনাদের। আর-একটি দল ব্রিগেডিয়ার পাণ্ডের নেতৃত্বে লাকসামের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যায় দাউদকান্দি-চাঁদপুরের দিকে। ৭ই ডিসেম্বর পাণ্ডের এই বাহিনী গোমতী পার হয়ে চান্দিনা-জাফরগঞ্জ সড়ক বন্ধ করে দেয়। তা ছাড়া, আর-একটি অগ্রবর্তী দল দ্রুত এগিয়ে গিয়ে পশ্চিম দিকে দখল করে দাউদকান্দি ফেরিঘাট।

যুদ্ধক্ষেত্রে অসামান্য সাফল্য অর্জন ছাড়াও, ৬ই ডিসেম্বরের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো : এদিন বাংলাদেশকে ভারত একটি স্বাধীন দেশ হিশেবে স্বীকৃতি দেয়। ভুটান স্বীকৃতি দেয় তারপরের দিন। ওদিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চৌঠা ডিসেম্বর যুদ্ধের জন্যে সরাসরি ভারতকে দোষী ঘোষণা করেছিলো এবং জাতিসংঘকে অনুরোধ করেছিলো নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক ডাকতে। এতে অধিকাংশের ভোটে ঠিক হয় যে, ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধবিরতি হোক। কিন্তু এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ভিটো দেয় সোভিয়েত ইউনিয়ন। তাকে সমর্থন করে পোল্যান্ড। ফলে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হলো না। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন ভিটো না-দিলে স্বাধীনতাযুদ্ধ হয়তো মাঝপথে বন্ধ হয়ে যেতো। সে অবস্থায়, বিজয়ের বদলে হতো যুদ্ধবিরতি।

ডিসেম্বরের যুদ্ধের নক্সা : মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর আক্রমণরেখা
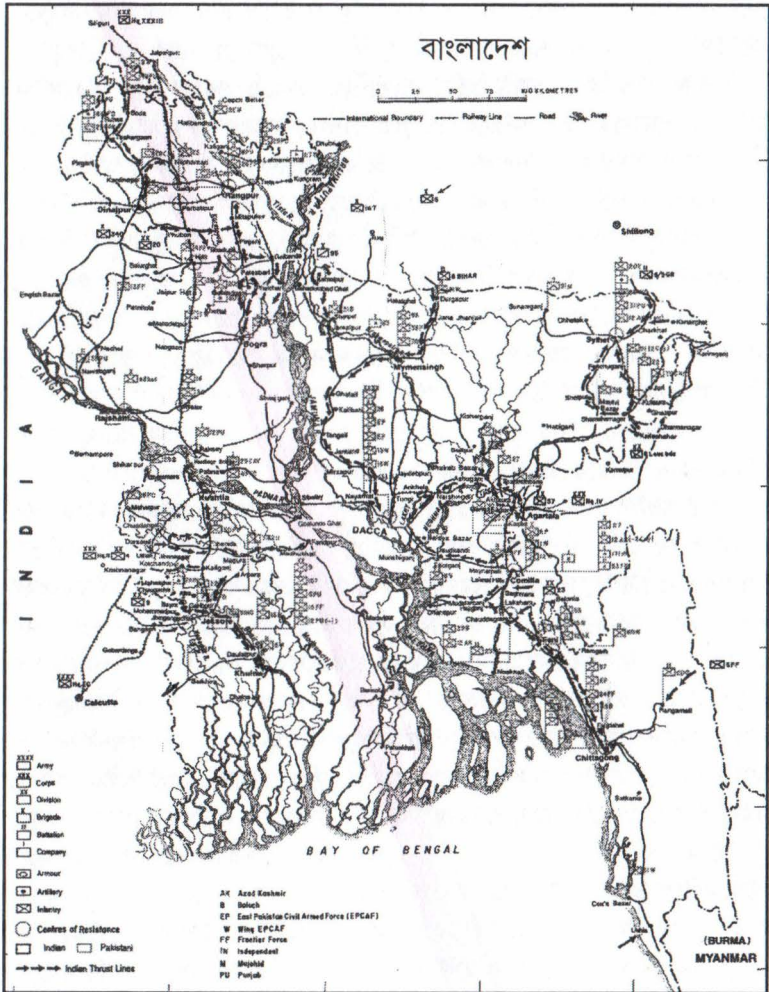
পাঁচই ডিসেম্বর নিরাপত্তা পরিষদের আবার বৈঠক বসে। এই বৈঠকে সোভিয়েত ইউনিয়ন যুদ্ধবিরতির প্রসঙ্গ না-তুলে প্রস্তাব দেয় রাজনৈতিক মীমাংসার। সে এমন মীমাংসা চায়, যাতে সংঘর্ষের সন্তোষজনক সমাধান হয় এবং শরণার্থীরা দেশে ফিরে যাওয়ার মতো অনুকূল পরিবেশ রচিত হয়। এ প্রস্তাবের সমর্থন করে একমাত্র পোল্যান্ড। অন্য দেশগুলো ভোট দানে বিরত থাকে। কিন্তু এর বিরুদ্ধে ভিটো দেয় চীন, যে-চীন দাবি করে সে নির্যাতিত মানুষের পাশে দাঁড়ায়। এখানে বলা যেতে পারে যে, জাতিসংঘে যোগ দেওয়ার পর চীন প্রথমই যে-ভিটো দিয়েছিলো, সেটি ছিলো বাংলাদেশ-বিরোধী এবং পাকিস্তানের পক্ষে। দুঃসময়ে পাকিস্তানের পক্ষ নিয়ে চীন সত্যিকার বন্ধুত্বের পরিচয় দিয়েছিলো। এমন কি, ভারত সীমান্তেও সৈন্য সমাবেশ করে ভারতকে ভয় দেখিয়েছিলো চীন।

নিরাপত্তা পরিষদে কিছু না-করতে পারলেও, প্রয়োজন বোধে পাকিস্তানকে সামরিক সাহায্য দেওয়ার জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১০ই ডিসেম্বর তার সপ্তম নৌবহরকে নির্দেশ দিয়েছিলো বঙ্গোপসাগরের দিকে অগ্রসর হতে। পরে জানা যায় যে, এই নৌবহরের পারমাণবিক অস্ত্রও ছিলো। এবং প্রেসিডেন্ট নিক্সন দরকার হলে তা ব্যবহার করতেও তৈরি ছিলেন। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন—উভয়ের বিরুদ্ধেই সোভিয়েত ইউনিয়ন সতর্কতা নিয়েছিলো। একদিকে, সে বঙ্গোপসাগরে ২০টি যুদ্ধজাহাজ পাঠায় সপ্তম নৌবহরকে চমকে দিতে; অন্যদিকে, চীনের সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করে চীনকে ভাবিয়ে তুলতে।

মিত্রবাহিনী যখন একটার পর একটা সাফল্য অর্জন করতে থাকে এবং পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ভেঙে পড়ে তাসের ঘরের মতো, তখন ১৩ই ডিসেম্বর আরও একবার নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক বসে। এতে আবার যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব রাখা হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তরফ থেকে। এবারেও তার বিরুদ্ধে ভিটো দেয় সোভিয়েত ইউনিয়ন। সত্যিকার অর্থে ভারতের পর বাংলাদেশকে তখন সবচেয়ে বেশি সাহায্য দিয়েছিলো সোভিয়েত ইউনিয়ন। (তখনকার আন্তর্জাতিক কূটনীতি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্যে দ্রষ্টব্য মঈদুল হাসানের *মূলধারা '৭১* [১৯৯২])। মোট কথা, একদিকে কূটনীতির লড়াই চলতে থাকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে, অন্যদিকে গোলাগুলি নিয়ে প্রচণ্ড লড়াই অব্যাহত থাকে রণক্ষেত্রে। যুদ্ধ এ সময়ে চলছিলো পুরোদমে। বলা বাহুল্য, মিত্রবাহিনী জিততে না-পারলে কোনো কূটনৈতিক তৎপরতাই কাজে লাগতো না।

৭ই ডিসেম্বর পতন ঘটে পাকিস্তানের শক্ত ঘাঁটি যশোরের। ভারতের সৈন্য এবং মুক্তিযোদ্ধারা এই সেনা-ছাউনিতে ঢুকে দেখতে পান যে, সেখানে অস্ত্রশস্ত্র, খাবার এবং অন্যান্য রসদ রেখে পালিয়ে গেছে পাকিস্তানী সৈন্যরা। বিনা রক্তপাতে যশোরের এই অপ্রত্যাশিত পতনের ফলে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ প্রায় মুক্ত এলাকায় পরিণত হয়। তবে পাকিস্তানীরা গিয়ে ভিড় করে দুটি

জায়গায়—পুব দিকে মাগুরায় আর দক্ষিণ দিকে খুলনায়। মাগুরায় অবশ্য তারা কোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরোধ তৈরি করতে পারেনি। হামলার মুখোমুখি হয়ে দ্রুত হাল ছেড়ে দিয়ে তারা সরে গিয়েছিলো আরও পুবে। কিন্তু খুলনার দিকে যে-দলটি পালিয়ে গিয়েছিলো, তারা দৌলতপুরে কঠিন প্রতিরোধ সৃষ্টি করেছিলো। এখানকার সৈন্যরা আত্মসমর্পণ করেছিলো ষোলোই ডিসেম্বর পাকিস্তানের আত্মসমর্পণের পরে।

যশোর থেকে বিনা যুদ্ধে পালিয়ে যাওয়ার ফলে অন্যান্য জায়গাতেও পাকিস্তানীদের মনোবল ভেঙে পড়েছিলো। এই পরিবেশে ৮ই ডিসেম্বর থেকে ভারতের প্রধান সেনাপতি মানেক্‌শ এক মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ শুরু করেন। তিনি পাকিস্তানীদের বারবার আহ্বান জানাতে থাকেন আত্মসমর্পণ করার জন্যে। এটা ছিলো পাকিস্তানীদের মনোবল ভেঙে যাওয়ার আর-একটা কারণ। রণকৌশল হিশেবে পূর্বাঞ্চলের কম্যান্ডার জগজিৎ সিং অরোরা নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, নিয়াজীর দুর্গগুলোর পাশ কাটিয়ে সামনে গিয়ে মিত্রবাহিনী যেন রাস্তাগুলো আটকে দেয়, যাতে পাকিস্তানীরা রাজধানীর দিকে সরে যেতে না-পারে। এটা উপলব্ধি করতে পাকিস্তানীদের কিছুটা সময় লেগেছিলো। ওদিকে, নিয়াজী সব সৈন্যই পাঠিয়েছিলেন সীমান্তের তথাকথিত দুর্গগুলোর দিকে। সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করার জন্যে ঢাকায় বলতে গেলে কোনো ব্যবস্থাই রাখেননি। ফলে ষোলোই ডিসেম্বর যখন নানা পথে মিত্রবাহিনী ঢাকায় প্রবেশ করে, তখন নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করা ছাড়া পাকিস্তানীদের কোনো উপায় ছিলো না।

বস্তুত, ন-দশ তারিখের দিকেই পাকিস্তানের ভাগ্য লেখা হয়ে গিয়েছিলো। ৯ই ডিসেম্বর দাউদকান্দি দখলের পর ১০ই ডিসেম্বর মিত্রবাহিনী আসে রায়পুরায়। তাঁরা নদী পার হয়েছিলেন হেলিকপ্টার আর জনগণের সাহায্য নিয়ে। তাঁদের উভচর ট্যাংকগুলোও বিশেষ কাজে লেগেছিলো। এই বিজয়ী বাহিনী এগিয়ে যেতে থাকে নরসিংদী এবং ডেমরার দিকে। ৯ই ডিসেম্বর দাউদকান্দির মতোই পতন ঘটে চাঁদপুরের। তখন সেখান থেকে পাকিস্তানীদের একজন নাম-করা সেনাপতি মেজর জেনারেল রহিম মরিয়া হয়ে পালিয়ে যান নারায়ণগঞ্জে। প্রাণে বেঁচে গেলেও পথে আহত হন তিনি। রায়পুরা থেকে মিত্রবাহিনী ডেমরায় পৌঁছে যায় ১৪ই ডিসেম্বর। ওদিকে, গভর্নর মালিক এবং তাঁর অন্যতম সেনাপতি রাও ফরমান আলি ততোক্ষণে পালানোর জন্যে পথ খুঁজতে আরম্ভ করেন। জাতিসংঘের ঢাকার প্রতিনিধিকে ফরমান আলি অনুরোধ করেন, জাতিসংঘের মাধ্যমে অবিলম্বে একটা যুদ্ধবিরতির ব্যবস্থা করতে।

দেশের অন্য কোণে—রংপুর এবং সৈয়দপুরে—অবস্থিত পাকবাহিনী ফুলছড়ি ফেরিঘাট হয়ে ঢাকার দিকে পালাতে চেষ্টা করছিলো। মিত্রবাহিনী তাড়া করে তাদের। সেই পথেই মিত্রবাহিনী গাইবান্ধা দখল করে। তারপর কয়েক ঘণ্টার

মধ্যে দখল করে ফুলছড়ি ঘাটও। ঘাটের উল্টো পাড়ও দখল করে মিত্রবাহিনীর অন্য-একটি দল। এখান থেকে অতঃপর তাঁরা যাত্রা করেন বগুড়ার দিকে। পথে গোবিন্দগঞ্জ তাদের দখলে আসে। এই গোবিন্দগঞ্জে নিহত হয়েছিলো এক শোরও বেশি পাকিস্তানী সৈন্য। মিত্রবাহিনীর এখানে আটক করে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলাবারুদ। ১১ তারিখ তাঁরা বগুড়া আক্রমণ করার জন্যে এগিয়ে যান উত্তর দিক থেকে। এ ছাড়া, তাঁদের অন্য একটি কলাম এগিয়ে আসে দক্ষিণ দিক থেকে। আর-একটি দল ততোদিনে পাঁচবিবি এবং জয়পুরহাট দখল করে ফেলেছিলো। সেই দলও এগিয়ে যায় বগুড়ার দিকে। ফলে ১৩ তারিখ ভোর রাতে মিত্রবাহিনী গোটা বগুড়াই ঘিরে ফেলে উত্তর, দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে। এখানকার সেনা-ছাউনি মিত্রবাহিনীর কব্জায় আসে ১৪ তারিখ দুপুর বেলায়। ফলে এখানে আত্মসমর্পণ করে পাকিস্তানের ৫ জন অফিসার, ৫৬ জন জেসিও আর ১৬১৩ জন জওয়ান। বগুড়া অধিকারের পরের দিন রাতের বেলা মিত্রবাহিনী আক্রমণ চালায় বগুড়ার উত্তরে পাকিস্তানের আর-একটি দুর্গ—রংপুরের ওপর।

এদিকে, উত্তর-পূর্ব বাংলাদেশেও সমান তালে চলছিলো মিত্রবাহিনীর অগ্রযাত্রা। ৭ই ডিসেম্বর বিকেলে কামালপুর থেকে আসা একটি বাহিনী পার হয় ব্রহ্মপুত্র। তারপর জামালপুরের দু মাইল দক্ষিণে এগিয়ে গিয়ে এই বাহিনী সেখানকার রাস্তা আটকে দেয়, যাতে পিছু হটে পাকিস্তানী সৈন্যরা ঢাকার দিকে যেতে না-পারে। এর দুদিন পরে মিত্রবাহিনীর আর-একটি দল উত্তর দিক থেকেও জামালপুর আক্রমণ করে। এই হামলার মুখে ১০ তারিখে পাকিস্তানী সৈন্যরা পালাতে চেষ্টা করে জামালপুর ছাউনি থেকে। কিন্তু অবরুদ্ধ সড়কের কাছে তাদের শতাধিক সৈন্য নিহত হয়। পরের দিন ভোর বেলায় বাকি পাকসেনারা আত্মসমর্পণ করে মিত্রবাহিনীর কাছে। এদের মধ্যে ছিলো ৬ জন অফিসার এবং ৫২২ জন জওয়ান।

এদিকে অবস্থা বেগতিক দেখে পাকিস্তানী সৈন্যরা আগেই ময়মনসিংহ ঘাঁটি থেকে পালিয়ে গিয়ে টাঙ্গাইলে অবস্থান নিয়েছিলো। এই সৈন্যদের মোকাবেলা করার উদ্দেশ্যে ভারতের সাত শো প্যারাসুট সৈন্য অবতরণ করে টাঙ্গাইলে কাদের-বাহিনীর মুক্তাঞ্চল—মধুপুরে। এই প্যারাসুট বাহিনীর সঙ্গে উত্তর দিক থেকে জামালপুরের বিজয়ী বাহিনীও এসে যোগ দেয়। এখানে নাগরার অধীনে ছিলো আটটি ব্যাটালিয়ন। কিন্তু তাদের প্রধান সমস্যা ছিলো পরিবহনের। এই মিলিত বাহিনী বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে এগুতে থাকে ঢাকার দিকে। তাদের মধ্যে একটি দল—প্যারাস্যুট বাহিনীও ছিলো যার মধ্যে—ব্রিগেডিয়ার ক্লের অধীনে তুরাগ নদীর ধারে পৌঁছে তারপর কাসিমপুরের কাছে নদী পার হতে চেষ্টা করে। কিন্তু পারেনি। পাকিস্তানীদের প্রবল বাধার মুখে টঙ্গীর দিকে তাদের অগ্রযাত্রা ব্যাহত হয়। শেষে মিত্রবাহিনীর অগ্রযাত্রায় বাধা দিতে পাকিস্তানীরা তুরাগ নদীর

সেতু উড়িয়ে দিয়ে ঢাকার দিকে সরে যায়। পাকসেনারা এখানে লড়াই করেছিলো ষোলো তারিখ আত্মসমর্পণের আগে পর্যন্ত।

নাগরা এবং তাঁর সহকারী সন্ত সিংয়ের অধীনে অন্য একটি দল ১৪ তারিখ রাত দশটার দিকে এগিয়ে যায় সাভার-মিরপুরের দিকে। এরা ধামরাই ফেরির পশ্চিম দিকের ফেরিঘাট দখল করে কয়েক ঘণ্টা পরে—ভোর রাতে (১৫ই)। বেতার সম্প্রচার ভবনের কাছে পাকিস্তানীরা তাদের বাধা দিতে চেষ্টা করলেও শেষ পর্যন্ত

উপরের ছবিতে মুক্ত এলাকায় লাঠিতে ভর দিয়ে গন্ধর্ব নাগরা ও তাঁর বাঁয়ে ব্রিগেডিয়ার ক্লের। নিচে উৎফুল্ল জনতার মধ্যে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা

পিছু হটে যায়। সন্ত সিং-এর এই দলই সবার আগে পৌঁছে যায় মিরপুর ব্রিজের কাছে। এদের সঙ্গে ছিলো কাদের বাহিনী।

তাড়াহুড়োতে পাকিস্তানীরা মিরপুরের ব্রিজ ধ্বংস করতে পারেনি। সেখানে লড়াই হয় ১৫ তারিখ রাতের বেলায়। এভাবে মেজর জেনারেল নাগরার অধীনে মিত্রবাহিনী পৌঁছে যায় একেবারে ঢাকার উপকণ্ঠে। ওদিকে, মিত্রবাহিনীর যে-দলটি নরসিংদী-ডেমরার দিকে অগ্রসর হচ্ছিলো, ১৫ তারিখে সেটি অবস্থান নেয় শীতলক্ষ্যার পুব তীরে। মোট কথা, ষোলো তারিখ মিত্রবাহিনী তিন দিক থেকে ঢাকায় পৌঁছে যায়।

ওদিকে, বৃদ্ধ গভর্নর মালিক ৮ তারিখ থেকেই প্রাণের ভয়ে আত্মসমর্পণ করার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন। এমন কি, আন্তর্জাতিক রেডক্রসের কাছে তিনি আশ্রয় চেয়েছিলেন হোটেল ইন্টারকনে। অপর পক্ষে, নিয়াজী 'প্রাণ থাকতে এক ইঞ্চি জায়গা না-দেওয়ার' নীতিতে অবিচল থাকায়, আত্মসমর্পণের বিষয়টি তখনই বেশি দূর এগোয়নি। কিন্তু ১৪ তারিখ নাগাদ তাঁর ভরসার পানি সবটুকুই ভাটার টানে বঙ্গোপসাগরে চলে গিয়েছিলো। এই পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করার জন্যে গভর্মেন্ট হাউজে সভা বসেছিলো গভর্নর মালিকের নেতৃত্বে। নিয়াজী, ফরমান আলি, জামশেদ—সবাই ছিলেন সেখানে। এই সভার খবর পেয়ে বাংলাদেশ সরকারের অনুমতি নিয়ে ভারত মাঝারি সাইজের একটি বোমা ফেলে গভমেন্ট হাউজের ওপর। তখন কর্তারা কে কোথায় পালাবেন, পথ পেলেন না। (ফরমান আলি লিখেছেন যে, সবাই পালালেও, তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন একটা গাছের তলায়।) কিন্তু ভারত সত্যি সত্যি তাঁদের প্রাণে মারতে চায়নি। তাই একটি বোমা ফেলেই যা জানাবার, তা জানিয়ে দিয়েছিলো।

পাকিস্তানের প্রতি ডক্টর মালিকের আনুগত্য কতোটা ছিলো, সে বিষয়ে আমার কোনো ধারণা নেই। কিন্তু বোমার ভয়ে তিনি ১৪ তারিখেই পদত্যাগ করেন। অন্যদিকে, নিয়াজী ছিলেন পাকিস্তানের অনুগত প্রেমিক। যুদ্ধ করতে জানতেন তিনি, ব্যস, আর কিছু নয়। আর, ফরমান আলি সৈন্য হিশেবে কেমন ছিলেন, তা জানা না-গেলেও, বাঙালিদের প্রতি তাঁর ছিলো সমুদ্র-প্রমাণ ঘৃণা। বাঙালি নিধনে তিনি তাই সবাইকে টেক্কা মেরেছিলেন। এ ছাড়া, পাঁচজন গভর্নরের উপদেষ্টা হিশেবে কাজ করেছিলেন তিনি। রাজনীতির হালচাল জানতেন। বাস্তবতার খবরও নিয়াজীর থেকে আর-একটু বেশি রাখতেন। এই ফরমান আলিই তাঁর ডায়রিতে লিখেছিলেন যে, বাংলার শ্যামল মাটি তিনি লাল করে দেবেন রক্ত দিয়ে। এই ফরমান আলিই 'বিবেকবান' 'দায়িত্বশীল' পাকসেনাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। ইনিই রাজাকারদের প্রশংসা করেছিলেন সত্যিকার দেশপ্রেমিক হিশেবে। ইনিই গঠন করেছিলেন আল বদর বাহিনী। (তাঁর কীর্তির কথা তিনি নিজেই লিখেছেন, তাঁর গ্রন্থ *হাউ পাকিস্তান গট ডিভাইডেড* গ্রন্থে [১৯৯২])।

ফিল্ড মার্শাল মানেকশ

আত্মসমর্পণের কদিন আগে থেকেই ফরমান আলি বুঝতে পেরেছিলেন যে, পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। তাই যুদ্ধের শেষ দিক থেকে তিনি 'পোড়া মাটির নীতি' অনুসরণ করছিলেন। ঠান্ডা মাথায় ভেবেছিলেন, পরাজিত হলেও কী করে শত্রুর যদ্দুর সম্ভব বেশি ক্ষতি করা যায়। তারই জন্যে তিনি পরিকল্পনা করেন, বিখ্যাত বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের যতোজনকে পাওয়া যায়, তাঁদের মেরে ফেলার। স্বাধীন হলেও বাংলাদেশ যাতে এই বিখ্যাত বুদ্ধিজীবীদের সেবা থেকে বঞ্চিত হয়। আল বদর বাহিনীকে তিনি ভার দিয়েছিলেন ১৪ তারিখের মধ্যে তাঁর তালিকাভুক্ত ব্যক্তিদের সবাইকে খুন করতে। মতিউর রহমান নিজামী, আলী আহসান মুজাহিদ, আশরাফুজ্জামান, কামারুজ্জামান, মঈনুদ্দীন প্রমুখ তখন আল বদর বাহিনীর প্রধান নেতা। ফরমান আলির তালিকা অনুযায়ী বুদ্ধিজীবীদের যতোজনকে খুঁজে পাওয়া যায়, আল বদর বাহিনী তাঁদের বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গিয়েছিলো। কাউকেই রেহাই দেয়নি। তারপর নির্যাতন করে মেরে ফেলে তাঁদের। এঁদের মধ্যে ছিলেন ডক্টর রাব্বি, ডক্টর আলীম, মুনীর চৌধুরী, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, সন্তোষ ভট্টাচার্য প্রমুখ বিখ্যাত ব্যক্তি। নিহতদের দশজন ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ২৬ জন ডাক্তার। (*একাত্তরের ঘাতক দালাল কে কোথায়?*, ১৯৮৭; ও ফখরুল আবেদীনের তথ্যচিত্র *আল-বদর* দ্রষ্টব্য।)

এই নৃশংস এবং পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড কেবল ঢাকাতেই সীমাবদ্ধ ছিলো না। ফরমান আলি অন্যান্য বড়ো শহরের জন্যেও তালিকা তৈরি করেছিলেন। কিন্তু

বিভিন্ন জায়গায় পাকসেনারা পরাজিত হয়েছিলো এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের আগেই। সে জন্যে, যতো বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করার লক্ষ্য ছিলো ফরমান আলির, ততোজনকে হত্যা করা সম্ভব হয়নি। তবে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে চল্লিশজন বিশিষ্ট শিক্ষিত ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়েছিলো।

১৫ তারিখে ঢাকার চারদিক থেকে মিত্রবাহিনীর অগ্রযাত্রা দেখে নিয়াজীর মতো আশাবাদীও বুঝতে পারলেন যে, ঢাকার পতন একেবারে আসন্ন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ইয়াহিয়ার অনুমতি নিয়ে জাতিসংঘকে তিনি অনুরোধ জানান আত্মসমর্পণের ব্যবস্থা করতে। ভারতের প্রধান সেনাপতি মানেক্‌শকেও জানালেন যে, সৈন্যদের নিয়ে তিনি আত্মসমর্পণ করতে রাজি আছেন। অতঃপর বাকি থাকে কেবল আত্মসমর্পণের শর্ত আর ভাষা নিয়ে বিতর্ক। একে কি 'আত্মসমর্পণ' বলা হবে, নাকি বলা হবে 'যুদ্ধবিরতি'। ভারতের তরফ থেকে জানানো হয় যে, একে যুদ্ধবিরতি নয়, সরাসরি বলতে হবে আত্মসমর্পণ। তখন কথা ওঠে, কার কাছে আত্মসমর্পণ। ভারতের কাছে, না মুক্তিবাহিনীর কাছে? মুক্তিবাহিনী অথবা বাংলাদেশ কোনোটাই নিয়াজী অথবা পাকিস্তানী কর্মকর্তারা বলতে চাইছিলেন না। কিন্তু পাকিস্তানকে শেষ পর্যন্ত রাজি হতে হয় 'ভারত এবং বাংলাদেশের যৌথ বাহিনী'র কাছে 'আত্মসমর্পণ' করতে। ভারতের প্রধান সেনাপতি, জেনারেল মানেক্‌শ তাই ১৫ তারিখ বিকেল পাঁচটা থেকে ১৬ তারিখ সকাল নটা পর্যন্ত

ঢাকা বিমানবন্দরে অরোরা ও তাঁর বাঁয়ে নিয়াজী

বিমান হামলা না-করার নির্দেশ দেন। যদিও অন্যান্য ফ্রন্টে—চট্টগ্রাম, সিলেট, রংপুর, নাটোর, খুলনা—প্রতিটি জায়গায় এ সময়ে যুদ্ধ চলতে থাকে। সেই সঙ্গে চলতে থাকে মিত্রবাহিনীর অগ্রযাত্রা।

ঢাকার অতো কাছাকাছি পৌঁছে গিয়ে আত্মসমর্পণের জন্যে মিত্রবাহিনী ঢাকার ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করেছিলো। কিন্তু তাই বলে বাংলাদেশের অনেক জায়গাই—বিশেষ করে মফস্বলের অনেক অঞ্চলই—তখনই শত্রুমুক্ত হয়নি। এ রকম একটি জায়গা ছিলো রাজশাহীর চাঁপাইনবাবগঞ্জ। এখানে ১৩ই ডিসেম্বর ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীর আর মেজর গিয়াস এক সঙ্গে দুদিক থেকে আক্রমণ করেছিলেন। পাকিস্তানের প্রায় এক ব্যাটালিয়ন সৈন্য ছিলো এখানে। অসাধারণ সাহস এবং বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে এ জায়গায় নিহত হন 'বীর শ্রেষ্ঠ' মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর। জাহাঙ্গীরের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন কাজী নূর-উজ জামান। তিনি লিখেছেন, 'ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন ছিল সত্যিকারের গণবাহিনীর অধিনায়ক, আদর্শবাদী সৈনিক। সে যুদ্ধের সময় সব রকম বিলাস-ব্যসন ত্যাগ করেছিলো। দুটি শস্তা লুঙ্গি ও গেঞ্জি ছিলো তার পোশাক। তার জন্যে বরাদ্দ বেতনও সে নিতো না। ওই টাকা দিয়ে এ্যাডভান্স ড্রেসিং সেক্টরে আহত সেনাদের ফলমূল কিনে দেওয়া হতো।' (কাজী নূর-উজ জামান [কবির, ২০০৫]) আর-একটি অঞ্চল হলো চট্টগ্রাম। রফিকুল ইসলাম তাঁর বাহিনী নিয়ে চট্টগ্রামে প্রবেশ করেন ১৬ তারিখে। বস্তুত, আত্মসমর্পণের পরও কোনো কোনো জায়গায় এদিন যুদ্ধ চলতে থাকে। খুলনায় যেমন। নাটোরে যেমন। এসব মফস্বলের যুদ্ধে প্রধান ভূমিকা রেখেছিলেন মুক্তিবাহিনীর বীরযোদ্ধারা আর স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধারা।

পাকিস্তান যে ঢাকার কোনো জায়গায় সামান্যতম বাধা দেবে মিত্রবাহিনীকে, তার জন্যে তাদের যথেষ্ট সৈন্য ছিলো না। কী অসহায় হয়ে পড়েছিলো পাকিস্তান, তার জীবন্ত বর্ণনা দিয়েছেন সিদ্দিক সালিক তাঁর গ্রন্থে। তিনি তখনকার পরিস্থিতির বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে: কুর্মিটোলা বিমানক্ষেত্রে একজন ব্রিগেডিয়ার (নাম কী, লেখেননি) তাঁর মেজরকে প্রতিরক্ষার অবস্থা কেমন, সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। উত্তরে মেজর বললেন, আমি ঠিক আছি। কিন্তু একটি মাত্র মর্টার ও দুটি মেশিনগান দিয়ে বড়ো রকমের ভারতীয় আক্রমণ ঠেকাতে পারবে বলে সৈনিকরা তেমন ভরসা পাচ্ছে না। তখন মেজরকে ব্রিগেডিয়ার বললেন, সৈন্যদের উৎসাহ দিতে। আর পূর্বাঞ্চলীয় সদর দপ্তরে ব্রিগেডিয়ার বকর পরামর্শ দিলেন ঢাকায় পথ-যুদ্ধ সংগঠন করতে। তার উত্তরে একজন বললেন, যে-শহরের বাসিন্দারা শত্রুভাবাপন্ন সেখানে পথ-যুদ্ধ করা যায় না। 'একদিক থেকে ভারতীয়রা এবং অন্যদিক থেকে মুক্তিবাহিনী আপনাকে বেপথো কুকুরের মতো তাড়িয়ে তাড়িয়ে শিকার করবে।' (সালিক, ১৯৮৮)

নিয়াজী তাই অগত্যা আত্মসমর্পণের প্রস্তাব মেনে নিলেন। কিন্তু শর্ত দিলেন যে, তাঁর সৈন্যদের মুক্তিবাহিনী এবং বাঙালিদের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। রাত দুটোয় তিনি বেতারের মাধ্যমে বাংলাদেশের সর্বত্র তাঁর বাহিনীকে আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ দিলেন। তবে আত্মসমর্পণের পুরোপুরি আয়োজন করার জন্যে বেলা দশটার বদলে যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বাড়িয়ে নিলেন বেলা তিনটে পর্যন্ত।

পরের দিন—ষোলোই ডিসেম্বর—সকাল সাড়ে আটটায় জেনারেল গন্ধর্ব নাগরা মিরপুর ব্রিজের কাছ থেকে একটি বার্তাসহ তাঁর এডিসি মেজর শেঠি এবং অন্য দুজন অফিসারকে জীপে করে পাঠালেন ঢাকা শহরে। জীপের ওপর উড়ছে শাদা পতাকা। নিয়াজীর সঙ্গে আগে থেকেই নাগরার পরিচয় ছিলো। তাই বেশ বন্ধুত্বপূর্ণ ভাষাতেই লিখেছিলেন, 'প্রিয় আবদুল্লাহ, আমি এখানে এসে গেছি। তোমার খেলা শেষ। আমার পরামর্শ হচ্ছে তুমি আত্মসমর্পণ করো এবং আমি তোমার দেখাশোনা করবো। গন্ধর্ব।' (লছমন সিংহ, ১৯৮১) কিন্তু পাকিস্তানী মেজর সিদ্দিক সালিক এই চিরকুটের কথা লিখেছেন একটু ভিন্নভাবে। এতে নাগরা নাকি লিখেছিলেন, 'প্রিয় আবদুল্লাহ, আমি এখন মিরপুর সেতুর কাছে। আপনার প্রতিনিধি পাঠান।' নিয়াজী এই বার্তাটি পেয়েছিলেন নটার দিকে। (সালিক, ১৯৭৮)

বার্তাটি নিয়াজী দেখালেন তাঁর সহকারীদের। রাও ফরমান আলি খুব অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন এ বার্তা দেখে। আত্মসমর্পণের জন্যে সকল দোষ তিনি চাপিয়েছিলেন নিয়াজীর ওপর। (ফরমান আলি, ১৯৯২) তারপর মেজর জেনারেল নাগরাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে মেজর জেনারেল জামশেদকে পাঠালেন মিরপুরে। মিরপুরে এই গাড়ি পৌঁছানোর পর সঙ্গে সঙ্গে এই গাড়িতে উঠে বসেন মেহতা। অন্যরা ওঠেন একটা জীপে। একজনের হাতে ছিলো একটা শাদা পতাকা। এই জীপ যখন মিরপুর ব্রিজের ওপরে তখন হঠাৎ পাশ থেকে মেশিন গানের এক ঝাঁক গুলি এসে আঘাত করে এই জীপটিকে। এতে গুরুতরভাবে আহত হন মেজর শেঠি। তাঁর একটি পা কেটে ফেলতে হয়েছিলো এই আঘাতের দরুন। মেহতা এবং একজন পাকিস্তানী অফিসারকে পাঠানো হয় টঙ্গীতে। তাঁদেরও হাতে ছিলো শাদা পতাকা। কিন্তু একটা ট্যাংকের গোলা এসে আঘাত করে তাঁদের জীপ। ফলে জীপের চারজন আরোহীর সবাই নিহত হন সেখানেই। (লছমন, ১৯৮১) এ কি মিরপুর ব্রিজ এবং টঙ্গীতে অবস্থিত পাকসেনাদের ভুলে, না তারা কিছুতেই আত্মসমর্পণ মেনে নিতে পারছিলো না বলে, তা জানার উপায় নেই। কিন্তু পাকবাহিনী শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ এবং ভারতের প্রতি তাদের আন্তরিক ঘৃণার পরিচয় দিয়েছিলো। টঙ্গীতে যুদ্ধ শেষ হয়েছিলো বিকেল চারটার দিকে।

সে যাই হোক, দশটা চল্লিশের সময়ে কয়েকজন সৈন্য আর কাদের সিদ্দিকী এবং তাঁর কিছু মুক্তিযোদ্ধাকে নিয়ে জেনারেল নাগরা প্রবেশ করলেন ঢাকায়।

আত্মসমর্পণ : অরোরার পেছনে এ কে খন্দকার

'প্রবেশ করলেন গৌরবের শিরোপা ধারণ করে। এটা ছিলো ঢাকার পতন। পতন ঘটলো নীরবে—একজন হৃদরোগীর মতো। কোনো অঙ্গচ্ছেদ হলো না অথবা দেহও দ্বিখণ্ডিত হলো না।' (সালিক, ১৯৮৮) সালিক তাঁর দৃষ্টিকোণ থেকে এটাকে পতন বললেও, বাঙালিদের দৃষ্টিতে এ ছিলো ঢাকা বিজয়। এ ছিলো ন মাসের মুক্তিযুদ্ধের অবসান। স্বাধীন বাংলাদেশের সত্যিকার অভ্যুদয়।

নাগরাকে অভ্যর্থনা জানালেন নিয়াজী। পুরোনো বন্ধুকে পেয়ে তিনি নাকি তাঁর কাঁধে মুখ রেখে কেঁদেছিলেন। (তালুকদার, ১৯৯১) তারপর উর্দু বয়াত আবৃত্তি করতে আরম্ভ করেন তিনি। কিন্তু নাগরা কি উর্দু বোঝেন? নিয়াজী তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন। নাগরা উত্তরে বলেছিলেন যে, তিনি লাহোর থেকে ফার্সি ভাষা ও সাহিত্য এমএ পাশ করেছিলেন। নাগরা তাঁর চেয়ে বেশি শিক্ষিত দেখে নিয়াজী কবিতা আবৃত্তি না-করে রসিকতা করতে আরম্ভ করেন। (ফরমান আলি, ১৯৯২; সালিক, ১৯৮৮) এই রসিকতা নাকি এতোই স্থুল ছিলো যে, তা ছাপা যায় না। (সালিক, ১৯৮৮) সে যা-ই হোক, এর পর নাগরা আর নিয়াজীর আলোচনা হলো। সে আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন বাঘা সিদ্দিকীও। সেটাও ফরমান আলিদের গাত্রদাহ সৃষ্টি করেছিলো। (ফরমান আলি, ১৯৯২) আলোচনার পর

সর্বশেষ পরিস্থিতির কথা নাগরা জানালেন ঈস্টার্ন কম্যান্ডের প্রধান জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার কাছে।

অরোরার নির্দেশে তাঁর চীফ অব স্টাফ মেজর জেনারেল জ্যাকব তখন আত্মসমর্পণের দলিল নিয়ে ঢাকায় এলেন দুপুরের পর। তাতে লেখা ছিলো :

> পাকিস্তানের ঈস্টার্ন কম্যান্ড বাংলাদেশে তার সমস্ত সশস্ত্র বাহিনীকে পূর্বাঞ্চলের ভারতীয় বাহিনী এবং বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর জেনারেল অফিসার্স কম্যান্ডিং ইন চীফের কাছে আত্মসমর্পণ করতে রাজি হচ্ছে। পাকিস্তানের স্থল, বিমান ও নৌবাহিনী এবং তার তাবৎ প্যারা-মিলিটারি ও বেসামরিক সশস্ত্র বাহিনী এই আত্মসমর্পণের অন্তর্ভুক্ত। এরা জগজিৎ সিং অরোরার নির্দেশাধীন সবচেয়ে নিকটবর্তী বাহিনীর কাছে তাদের অস্ত্রশস্ত্রসহ আত্মসমর্পণ করবে।

'আত্মসমর্পণ' এবং 'বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী' কথা কটি তখনো নিয়াজীর সহকারীরা ঠিক মেনে নিতে চাইছিলেন না। বিশেষ করে ফরমান আলি। কিন্তু মেজর জেনারেল জ্যাকব বলেন যে, দলিলটি এভাবেই দিল্লি থেকে এসেছে। ইচ্ছে করলে তাঁরা এভাবেই একে গ্রহণ করতে পারেন, অথবা অগ্রাহ্য করতে পারেন। (ফরমান আলি, ১৯৯২) মৌন থেকে নিয়াজী তখন তাঁর সম্মতি জানালেন। তিনি নিজে অবশ্য তাঁর বইতে ঘটনাটা ঠিক এভাবে বর্ণনা করেননি। তিনি লিখেছেন যে, জেনারেল জ্যাকব তাঁকে এই বলে ভয় দেখিয়েছিলেন যে, শর্ত পুরোপুরি মেনে না-নিলে পাকিস্তানের অনুগত লোকেদের তিনি তুলে দেবেন মুক্তিবাহিনীর হাতে। আর-তুলে দেবেন হোটেল ইন্টারকনে যে-বেসামরিক লোকেরা আশ্রয় নিয়েছিলেন, তাঁদের। এই হুমকির মুখে তিনি বাধ্য হয়ে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের শর্তে রাজি হন। (নিয়াজী, ২০০৮)

অপরাহ্নে নিয়াজী যান বিমানবন্দরে—লেফটেনেন্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরাকে অভ্যর্থনা জানাতে। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে জেনারেল অরোরার সঙ্গে ছিলেন বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর এ কে খন্দকার। সালিক এই দৃশ্যের ভালো বর্ণনা দিয়েছেন।

> তিনি (অরোরা) পত্নীকে সঙ্গে নিয়ে হেলিকপ্টারে করে এলেন। এক বিরাট সংখ্যক বাঙালি জনতা ছুটে গেলো তাদের 'মুক্তিদাতা' ও তাঁর পত্নীকে মাল্য ভূষিত করতে। নিয়াজি তাঁকে স্যালুট দিলেন এবং করমর্দন করলেন। একটি মর্মস্পর্শী দৃশ্য। বিজয়ী এবং বিজিত দাঁড়িয়ে আছেন প্রকাশ্যে, বাঙালিদের সামনে। আর বাঙালিরা অরোরার জন্যে তাদের ভালোবাসা এবং নিয়াজীর জন্যে তীব্র ঘৃণা প্রকাশে কোনো রকম গোপনীয়তার আশ্রয় নিচ্ছে না।
>
> উচ্চকণ্ঠে চিৎকার ও স্লোগানের মধ্য দিয়ে তাঁদের গাড়ি রমনা রেসকোর্সে এলো। আত্মসমর্পণের অনুষ্ঠানের জন্যে মঞ্চ তৈরি করা হয়। বিশাল ময়দানটি বাঙালি জনতার উদ্বেল আবেগে ভাসছিলো। তারা প্রকাশ্যে একজন পশ্চিম পাকিস্তানী জেনারেলের দর্পচূর্ণের দৃশ্য দেখবার জন্যে উদ্গ্রীব হয়ে উঠেছিলো। ...
>
> পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটি সুসজ্জিত দলকে হাজির করা হলো বিজয়ীকে গার্ড
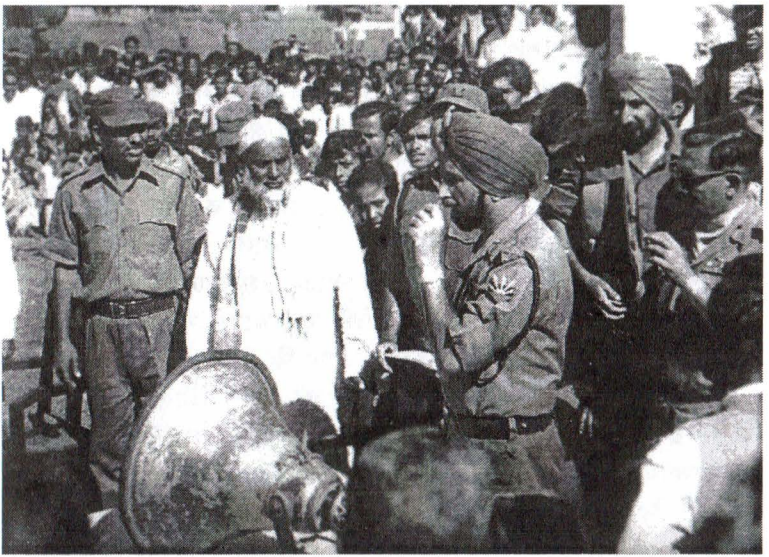
জনগণের উদ্দেশে ভাষণরত জে. অরোরা

> অব অনার দেওয়ার জন্যে। অন্যদিকে একটি ভারতীয় সেনাদল বিজিতের প্রহরায় নিযুক্ত হলো। প্রায় দশ লাখ বাঙালি এবং কয়েক কুড়ি বিদেশী সংবাদপত্র ও সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের সামনে লেফটেনেন্ট জেনারেল অরোরা ও লেফটেনেন্ট জেনারেল নিয়াজি আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করলেন। আত্মসমর্পণের নিদর্শন স্বরূপ জেনারেল নিয়াজি তাঁর রিভলবার বের করে অরোরার হাতে তুলে দিলেন। (সালিক, ১৯৮৮)

এই পরাজয়ে নিয়াজীর মনের অবস্থা তখন কেমন ছিলো? নিয়াজী নিজেই তার বর্ণনা দিয়েছেন :

> আমি কাঁপা হাতে আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করি। তখন আমার অন্তরে উত্থিত আবেগের ঢেউ দু চোখ বেয়ে অশ্রু হয়ে গড়িয়ে পড়ে। অনুষ্ঠানের একটু আগে একজন ফরাসি সাংবাদিক এগিয়ে এসে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন আপনার অনুভূতি কী, টাইগার?' জবাবে আমি বললাম, 'আমি অবসন্ন।' (নিয়াজী, ২০০৮)

সালিক এবং নিয়াজী—দুজনই আত্মসমর্পণের বিস্তারিত বর্ণনা দিলেও, একটা জিনিশ উল্লেখ করেননি। ইচ্ছে করেই করেননি। এটা হলো : কেবল অরোরার ভারতীয় বাহিনীর কাছে নিয়াজী আত্মসমর্পণ করেননি, সেখানে সাক্ষী হিশেবে বাংলাদেশ বাহিনীর পক্ষ থেকে এ কে খন্দকারও ছিলেন। অর্থাৎ পাকিস্তান কেবল ভারতীয় বাহিনীর কাছে নয়, আত্মসমর্পণ করেছিলো যৌথ বাহিনীর কাছে।

যুদ্ধে মিত্রবাহিনী এতো দ্রুত জয়ী হওয়ার কারণ এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা যেতে পারে। গেরিলারা ছ মাসেরও বেশি সময় ধরে চোরাগোপ্তা হামলা

চালিয়ে পাকিস্তানীদের ব্যতিব্যস্ত রেখেছিলো। তাদের মনোবল পুরোপুরি ভেঙে দিয়েছিলো। বাংলাদেশের নিয়মিত বাহিনীও বিরাট ভূমিকা পালন করেছিলো সীমান্তবর্তী এলাকায় প্রায় ন মাস ধরে যুদ্ধ করে। এর ফলে পাকসেনারা কোনো বিরাম অথবা বিশ্রাম পায়নি, বরং ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে আশ্রয় নিয়েছিলো নিজেদের ঘাঁটিগুলোর মধ্যে। বস্তুত, তারা আগে থেকেই পরাজিতের মনোভাব নিয়ে বসেছিলো। মিত্রবাহিনী প্রতিটি সীমান্ত দিয়ে প্রবেশ করেছিলো একযোগে। বাংলাদেশ বাহিনীই তাঁদের সোজা পথ দেখিয়েছিলো। সেই পথ ধরে এবং জনগণের সহযোগিতায় ভারতীয় বাহিনী অতো সহজে ঢাকার দিকে এগিয়ে যেতে পেরেছিলো। বিমান বাহিনীর প্রতিটি আক্রমণেও সহ-পাইলট হিশেবে সঙ্গে থাকতেন একজন বাঙালি পাইলট। এমন কি, পয়লা ডিসেম্বর চট্টগ্রামের জ্বালানী ডিপোর ওপর আক্রমণও করেছিলেন শুধু দুজন বাঙালি পাইলট মিলে—ফ্লাইট লেফটেনেন্ট শামসুল আলম আর ক্যাপ্টেন আকরাম। (মনিরুজ্জামান, ১৯৮০) ভারতীয় এবং পাকিস্তানী জেনারেলরা তাঁদের গ্রন্থে মুক্তিবাহিনীর ভূমিকাকে অতো গুরুত্ব দেননি। কিন্তু এটা তাঁদের ওপর চরম অবিচার এবং তাঁদের ভূমিকার অবমূল্যায়ন।

মুক্তিযুদ্ধের মাশুল

বিদ্রোহ এবং বিপ্লব ছাড়া দেশে অথবা সমাজে বিরাট কোনো পরিবর্তন আসে না। একাত্তরের যুদ্ধ ছাড়া পাকিস্তানী কায়েমী স্বার্থের শক্ত মুঠি থেকে বেরিয়ে এসে গণতান্ত্রিক পন্থায় বাংলাদেশ স্বাধীন হতে পারতো না। তার জন্যে বিপ্লব আবশ্যিক ছিলো। কিন্তু সব বিপ্লবেরই মূল্য দিতে হয়। বাংলাদেশও চরম মূল্য দিয়েছিলো। এই মূল্য ছিলো নানা ধরনের। সবচেয়ে বড়ো মূল্য জীবনহানির। মুক্তিযুদ্ধের সময় ঠিক কতো লোক প্রাণ দিয়েছিলেন, তার কোনো সঠিক হদিস মেলে না। বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে প্রথম কদিনেই পাকিস্তানীরা হত্যা করেছিলো হাজার হাজার মানুষ। কোনো কোনো বিদেশী পর্যবেক্ষকের মতে, ২৭শে মার্চের মধ্যেই চল্লিশ হাজার। (*ডেইলি এক্সপ্রেস*, ২৮. ৩. ১৯৭১) তারপর যুদ্ধের ন মাস ধরে হত্যা করেছিলো তার থেকেও অনেক বেশি। এই হত্যাযজ্ঞে কেবল পাকসেনারা অংশ নেয়নি। পাকসেনাদের হাতে নিহত হয়েছিলেন প্রধানত শহরের লোকেরা। কিন্তু ব্যাপক জরিপ চালিয়ে স্বরোচিষ সরকার যা দেখতে পান, তা হলো : বাগেরহাট অঞ্চলের গ্রামেগঞ্জে বেশির ভাগ লোককে হত্যাই করেছিলো রাজাকারেরা। (সরকার, ২০০৬) বাগেরহাটে যা ঘটেছিলো, অন্যান্য আঞ্চলিক মুক্তিযুদ্ধের ওপর যেসব গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, তা থেকেও এর সমর্থন মেলে। এমন কি, এম এ হাসানের *যুদ্ধ ও নারী* গ্রন্থ থেকেও তার প্রমাণ মেলে। (হাসান, ২০০৮) পাকসেনা এবং রাজাকারেরা সত্যিকার মুক্তিযোদ্ধা—তাদের ভাষায়—'দেশদ্রোহী' হত্যা করতে পেরেছিলো সামান্যই, মেরেছিলো সাধারণ মানুষ—নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ-তরুণ—সব বয়সের। সে তুলনায় যুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন অনেক কম। কিন্তু, আগেই বলেছি, সঠিক সংখ্যা কোনো দিন জানা যাবে না।

তবে মনে হয়, তিরিশ লাখ লোকের জীবনহানি হয়েছিলো বলে যে-দাবি করা হয়, তা কিংবদন্তী মাত্র। বাংলাদেশে ফিরে এসে শেখ মুজিব রেসকোর্সের ভাষণে

তিরিশ লাখের কথা বলেছিলেন। তিনি অনুমান করেই বলে থাকবেন। তার কারণ, তিনি বন্দী ছিলেন পাকিস্তানের জেলে। সেখানে খবরাখবর জানার উপায় ছিলো না। আর দেশে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে যাঁরা ছিলেন, অথবা যুদ্ধকালীন বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে তিনি কোনো সুনির্দিষ্ট অথবা আনুমানিক তথ্যও জানতে পারেননি। অথবা এমনও হতে পারে, তিনি ভুল তথ্য পেয়েছিলেন।

যুদ্ধে পরাজয়ের কারণ নির্ধারণের জন্যে পাকিস্তান একটি কমিশন করেছিলো। তার নাম ছিলো হামুদুর রহমান কমিশন। এই কমিশনের মতে, মৃতের সংখ্যা মাত্র ৪০ হাজার। (নিয়াজী, ২০০৮) বলা বাহুল্য, এটা ছিলো ডাহা মিথ্যা। এর চেয়ে মিথ্যা বলেছেন রাও ফরমান আলি। তিনি লিখেছেন, পাকসেনারা চেয়েছিলো দেশবাসীর মন জয় করতে, অস্ত্র দিয়ে তাদের বশীভূত করা তাদের লক্ষ্য ছিলো না। তবে কোনো কোনো সৈন্য ঠিক জাতীয় সেনাবাহিনীর সদস্যের মতো নিয়মমাফিক আচরণ করেনি। কোথাও কোথাও তারা খানিকটা অনিয়ম করেছিলো। (ফরমান আলি, ১৯৯২) সিদ্দিকী সালিক সেনাবাহিনীর সদস্য হলেও তাঁর খানিকটা ইতিহাস বোধ ছিলো এবং কোথাও কোথাও বেশ নিরপেক্ষ বিবরণ দিয়েছেন। তিনি সৈন্যদের ত্রাস-সৃষ্টিকারী অভিযানের কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন,

> করটিয়া একটি ছোটোখাটো বাজার। ... এক সারি দোকান নিয়ে এই বাজার। লোকজন আগেই ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়েছিলো। ... সেনাদলটি সেখানে থামলো। বাজারটি ভালো করে খুঁজে দেখলো। তারপর জ্বালিয়ে দিলো বাজারটি। কয়েটি কেরোসিনের টিনে আগুন লাগানো হলো। দ্রুত বাজারটি পরিণত হলো একটি অগ্নিকুণ্ডে। ধূম্রকুণ্ডলীসহ আগুন লকলকিয়ে সবুজ গাছ-গাছালি ছাড়িয়ে উপরে উঠলো। (সালিক, ১৯৭৮)

পাকিস্তানীরা এ রকম নির্বিচারে ধ্বংস করেছিলো গ্রামগঞ্জ। অক্টোবরে তারা বরিশালের ধামুরা বাজারে যায়। সেখানে দু সারিতে ছিলো দু শতাধিক দোকান। প্রথমে তারা লুটপাট করলো এসব দোকান। তারপর এক দোকানে যখন দেখা পেলো একজন বৃদ্ধ হিন্দু ডাক্তারের। তখন একেবারে কাছ থেকে গুলি করলো তাঁকে। কিন্তু হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভেদাভেদ ছিলো না। বাজারের এক প্রান্তে পৌঁছে তারা পেলো মসজিদের খাদিম দুই ভাইকে। দড়ি দিয়ে তাদের বাঁধলো একজনের সঙ্গে অন্য জনকে। দুজনের পিঠে পিঠ লাগানো। তারপর তাদের ফেলে দিলো আগুনের মধ্যে। পুড়ে ধনুকের মতো বেঁকে গেলো দুটো দেহ। ঐ একটি মাত্র দোকানে নয়, তারা আগুন লাগিয়ে দিলো অন্য সব দোকানেও। মোট কথা, এভাবে তারা ধ্বংস করেছে নির্বিচারে, হত্যা করেছে অকাতরে। ফলে লাখ লাখ লোক নিহত হয়েছিলেন তাদের হাতে। রুডলফ রামেলের অনুমান পাকিস্তান দশ লাখের চেয়েও বেশি লোককে হত্যা করেছিলো। (আর. জে, রামেল, ১৯৯৬) যদি তিরিশ লাখ অথবা দশ লাখের বেশির অনুমানে অতিরঞ্জনও থাকে, তা হলে অন্তত তিন/চার লাখ লোক যে নিহত হয়েছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ করার কারণ নেই।

এঁদের চোদ্দো আনাই নিহত হয়েছিলেন দেশের ভেতরে। গোলাগুলিতে, বেয়োনেটে, নির্যাতনে, আগুনে পুড়ে, ধর্ষণের ফলে। পাকিস্তানীরা যেভাবে নির্বিচারে হত্যা করতো, তাতে মনে হয় বিবেক নামক কোনো বস্তু তাদের ছিলো না। তারা ছিলো পশুর চেয়েও অধম। বিশেষ করে যেভাবে তারা শিশু এবং নারীদের হত্যা করেছে, তা রীতিমতো অকল্পনীয়। একজন মায়ের জবানি থেকে জানা যায়, তার দুধের শিশুকে ফোটানো পানিতে ফেলে দিয়ে মেরেছিলো পাকসেনারা। (হাসান, ২০০৮) বস্তুত, হত্যা করে অনেক ক্ষেত্রে তারা আনন্দিত হতো। এ রকমের অকারণে হত্যা করতে উদ্যত দুটি ঘটনা দেখেছিলেন ম্যাসকারেনহ্যাস। (*সানডে টাইমস*, ১৩. ৬. ৭১) হাতের তাক ঠিক আছে কিনা, তা পরীক্ষা করে দেখার জন্যেও তারা হত্যা করতো। এ রকমের একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে কুষ্টিয়ার। মার্চ মাসে পাকিস্তানীরা এখানে তাদের সমস্ত সৈন্য হারিয়েছিলো মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে। তাই এই এলাকার ওপর তাদের আক্রোশ কিছু বেশিই ছিলো। কুষ্টিয়া দখলের পরে সেখানে সে কারণে তারা অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছিলো। এক বাড়ির দোতলায় উঠে তারা এমনি হত্যাযজ্ঞ আরম্ভ করে। তখন দশ বছরের একটি ছেলে প্রাণের ভয়ে দোতলা থেকে লাফিয়ে নিচে পড়ে। কিন্তু এক পাকিস্তানী সেপাই শূন্যে থাকতেই তাকে গুলিতে বিঁধে ফেলে। এ খবর প্রকাশিত হয়েছিলো বিদেশী একটি পত্রিকায়। নাম মনে করতে পারছি না। জুন মাসের *টাইম* অথবা *নিউজউইকে* সম্ভবত।

ধর্ষিতা অর্ধমৃত নারী

দেশের বহু বুদ্ধিজীবী এবং বিশিষ্টজনকেও হত্যা করেছিলো পাকসেনারা। ২৫শে মার্চ রাতের বেলা থেকে আরম্ভ করে আত্মসমর্পণের সময় পর্যন্ত তারা শিক্ষিত লোকেদের হত্যা করে দেশের অপূরণীয় ক্ষতি করেছিলো। বিশেষ করে ফরমান আলির নীল নক্সা অনুযায়ী কিভাবে আল বদরের সদস্যরা ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করেছিলো যুদ্ধ শেষ হবার আগ মুহূর্তে, আগেই তা লক্ষ করেছি। বহু নিরীহ সমাজসেবককেও তারা যুদ্ধের সময়ে অকারণে হত্যা করেছিলো। এ রকমের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন টাঙ্গাইলের দানবীর রণদাপ্রসাদ সাহা। তিনি প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েও বেঁচে গিয়েছিলেন। কিন্তু পাকিস্তানী দানবদের হাত থেকে রেহাই পাননি। রেহাই পাননি সাধনা ঔষধালয়ের প্রতিষ্ঠাতা একান্ত নিরীহ অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র ঘোষও।

কেবল পাকিস্তানীদের হাতে নয়, অনেকের, বিশেষ করে শিশু এবং বৃদ্ধদের, মৃত্যু হয়েছিলো বাস্তুহারা হওয়ার কারণে। দেশের প্রায় বিশ লাখ লোককে নিজেদের বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র পালিয়ে যেতে হয়েছিলো। এই গৃহহারা লোকেদের অনেকে মারা যান না-খেয়ে, বিনা চিকিৎসায়, রোগে ভুগে অথবা পালানোর পথে। ভারতে যে এক কোটি শরণার্থী পালিয়ে গিয়েছিলেন, কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া, তাঁরা পালিয়ে গিয়ে বেঁচে গিয়েছিলেন। খাবার জুটুক অথবা না-জুটুক, অন্তত সারাক্ষণ পাকসেনাদের হাতে নিহত হওয়ার আতঙ্ক তাঁদের তাড়িয়ে বেড়াতো না। তবে শরণার্থী শিবিরে অনেকে খাদ্যের অভাব, কলেরা, পেটের পীড়া ইত্যাদিতে মারা গিয়েছিলেন। বিশেষ করে শিশু এবং বৃদ্ধরা। এ ছাড়া, যারা দেশের ভেতরে স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিলো, সে রকমের অনেক দালালও নিহত হয়েছিলো। এদের মধ্যে ছিলো রাজাকার, আল শামস, শান্তি কমিটির সদস্য ইত্যাদি। নিহত হয়েছিলো অনেক বিহারীও। এই অবাঙালিদের মধ্যে নিরীহ নির্দোষ ব্যক্তিও ছিলেন অনেকে। নিহত অবাঙালিদেরও সংখ্যা জানা যায় না। বেশ কয়েক হাজার হওয়া সম্ভব।

দেশের মধ্যে অসংখ্য লোক শারীরিক নির্যাতনেরও শিকার হয়েছিলেন। তাঁরা প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন—এই পর্যন্ত। কিন্তু তাঁরা জীবিত থেকে কোনো কালে এই নির্যাতনের কথা ভুলতে পারেননি। এ রকমের নির্যাতিত বহু লোক মানসিক ভারসাম্যও হারিয়ে ফেলেছিলেন। যেমন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের অধ্যাপক, মুজিবুর রহমান। রাজনীতির কোনো ধার ধারতেন না তিনি। তা সত্ত্বেও, হয়তো তাঁর নাম মুজিবুর রহমান বলেই, তাঁকে সৈন্যরা ধরে নিয়ে এতোই শারীরিক নির্যাতন করেছিলো যে, তিনি যুদ্ধের শেষ দিকে ছাড়া পেয়ে নিজের মুসলমানী নাম ত্যাগ করে 'দেবদাস' নাম গ্রহণ করেন। ইসলাম ধর্মের ওপরই বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন তিনি। তাঁর মানসিক ভারসাম্য আর কোনো দিন ফিরে আসেনি। ছাদের সঙ্গে পা বেঁধে ঝুলিয়ে মারা, নখ তুলে ফেলা, এক-একটা অঙ্গ
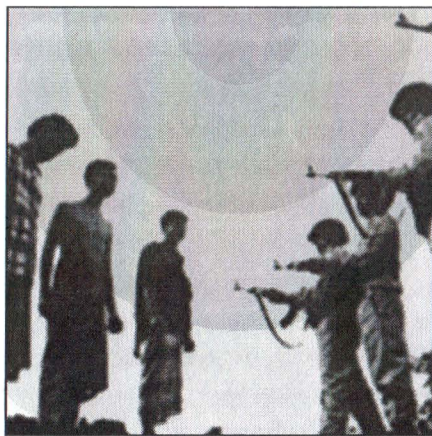
পাকসেনারা কাছ থেকে গুলি করছে তিন নিরীহ ব্যক্তিকে

কেটে নিয়ে নির্যাতন করা, ইলেকট্রিক শক দেওয়া—যতো রকমের নিষ্ঠুর অত্যাচারের কথা কল্পনা করা যায়, পাকিস্তানীরা সবই করেছিলো। এ রকমের কিছু নির্যাতনের কথা জাহানারা ইমামও বর্ণনা করেছেন। (ইমাম, ১৯৮৬)

যুদ্ধের ফলে ব্যাপক হারে এবং দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত আর-একটা শ্রেণী ছিলেন নারীরা। কারণ, নারীরা তো কেবল মানুষ নন, তাঁদের বাড়তি একটা আকর্ষণ আছে—যৌন আকর্ষণ। 'ধর্মপ্রাণ' পাকিস্তানীরা তাঁদের দেখেছিলো ভোগের বস্তু হিশেবে। 'জেহাদের মাল' হিশেবে তাঁদের ধর্ষণ করতে পাকিস্তানীদের মনেও কোনো দ্বিধা হয়নি। বিবেকের কোনো দংশনও অনুভব করেনি তারা। কারণ, ইসলাম ধর্মমতেই, তাঁদের উপভোগ করা জায়েজ—যদিও গণধর্ষণ এবং ধর্ষণ করে মেরে ফেলার অনুমতি ইসলাম ধর্ম দেয় কিনা, আমার জানা নেই। কিন্তু বালিকা, কিশোরী, যুবতী, মধ্যবয়সী—কোনো নারীই পাকিস্তানীদের থাবা থেকে রক্ষা পাননি। পরিবারের সামনে স্ত্রী এবং কন্যাদের ধর্ষণ করা-সহ এমন কোনো রকমের ধর্ষণ বাকি ছিলো না, যার আশ্রয় নেয়নি পাকিস্তানীরা। কিশোরীর যোনিপথ ছোটো থাকায় বেয়োনেট দিয়ে কেটে বড়ো করে নিয়ে ধর্ষণ করার ঘটনাও জানা যায়। (হাসান, ২০০৮) একজন ব্রিটিশ ব্যবসায়ী হোটেল ইন্টারকনে ছিলেন যুদ্ধের গোড়ার দিকে। বোম্বাইতে এসে তিনি ধর্ষণের বর্ণনা দিয়ে বলেছিলেন যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক হলে এক-একটি মেয়েকে ১০/১২ জন মিলে ধর্ষণ করেও পাকসেনাদের খাহেশ মেটেনি। তারপর পাঠান সৈন্যরা তাদের সঙ্গে শুরু করে পায়ু-সঙ্গম। (জগমোহন, ১৯৭১)

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে মুক্তিযোদ্ধা বিপ্লব এক চিঠিতে মায়ের কাছে এক ধর্ষিতার কথা লিখেছিলেন :

'... আমার এক ধর্ষিতা বোনকে দেখেছিলাম নিজের চোখে। ডেকেছিলাম বোনকে। সাড়া দেয়নি। সে মৃত। সম্পূর্ণ বিবস্ত্র দেহে পাশবিক অত্যাচারের চিহ্ন শরীরের প্রতিটি ভাঁজে ভাঁজে। বাংলার শিশু ছিলো তার গর্ভে। কিন্তু তবু পাঞ্জাবি পশুর হায়না কামদৃষ্টি থেকে সে রেহাই পায়নি।' (*একাত্তরের চিঠি*, ২০০৯)

ডিসেম্বর মাসে মাকে লেখা এ রকমের আর-একটি চিঠি :

... একটি গ্রামের পাশ দিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ বেদনাক্লিষ্ট একটি নারীকণ্ঠ ভেসে এলো। কালবিলম্ব না করে সেদিকে দৌড়ে গেলাম। একটা গুলি আমার মাথার ওপর দিয়ে চলে গেল—আবার একটা। ... বাড়িটার পেছনে একটা বাঁশঝাড়ের আড়ালে পজিশন নিলাম। দেখলাম, বিবস্ত্র একটি নারীর দেহ নিয়ে কয়েকজন পৈশাচিক খেলায় মেতে উঠেছে। আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না, মা। ... শত্রুকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লাম। ওরাও অনবরত গুলিবর্ষণ শুরু করল। জ্ঞান ফিরে দেখি আমি হাসপাতালে। (*একাত্তরের চিঠি*, ২০০৯)

বিদেশী নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকদের মতে, অন্তত দু/তিন লাখ নারী ধর্ষিত হয়েছিলেন। কিন্তু আসল সংখ্যা আরও বেশি বলে মনে হয়। কারণ, অনেক ক্ষেত্রেই ধর্ষণের কথা পরিবার গোপন করেছে, বিশেষ করে 'ভদ্রলোকেরা'। (হাসান, ২০০৮) কোনো কোনো স্বামী আবার স্ত্রীকে ধর্ষণের জন্যে এগিয়ে দিয়ে নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন। এ রকমের একজন পত্রিকা সম্পাদকের কথা উল্লেখ করেছেন সিদ্দিক সালিক। তবে সালিক এ উপহার গ্রহণ করেননি। (সালিক, ১৯৮৮) কোনো কোনো সামরিক কর্মকর্তা আবার নির্দিষ্ট রক্ষিতা রেখেছিলেন। এই রক্ষিতারা একটু ভালো অবস্থায় ছিলেন।

যুদ্ধের সময়কার নারী নির্যাতনের সবচেয়ে বিস্তৃত গবেষণা করেছেন এম এ হাসান। তিনি ব্যাপক জরিপ চালিয়ে তার ওপর ভিত্তি করে ধর্ষিত নারীদের সংখ্যা বের করেছেন সাড়ে চার লাখ। এঁদের মধ্যে দেশের অভ্যন্তরে থাকা নারী দু লাখ দু হাজার পাঁচ শো সাতাশ। আর শরণার্থীদের মধ্যে এঁদের সংখ্যা এক লাখ একত্রিশ হাজার দুশো পঞ্চাশ। ধর্ষিতাদের মধ্যে তিন ভাগের দু ভাগ বিবাহিতা, বাকি এক ভাগ কুমারী। তখন হিন্দুরা ছিলেন মোট জনসংখ্যার দশ ভাগের চেয়ে সামান্য বেশি। কিন্তু ধর্ষিতাদের মধ্যে শতকরা ৪২ ভাগ ছিলেন হিন্দু। এই হিন্দু নারীদের শতকরা ৪৪ ভাগ আবার অবিবাহিত। তার অর্থ : কুমারী হিন্দু নারীরাই ছিলেন ধর্ষিত হওয়ার সবচেয়ে আকর্ষণীয় প্রার্থী। বহু ধর্ষিতার কাহিনী আছে এই বইয়ে। অনেক ধর্ষিতার জবানবন্দীও আছে। (হাসান, ২০০৮, পৃ. ৭৭-২১৪)

স্বরোচিষ সরকারের জরিপ থেকেও দেখা যায় যে, বাগেরহাট জেলায় ধর্ষিতাদের বেশির ভাগই ছিলেন হিন্দু। রাজাকারেরা তাঁদের ধরে নিয়ে যেতো। অনেক সময়ে সাধ মিটে গেলে, কয়েক দিন পরে তাঁদের ফিরিয়ে দিতো। কিশোরীদের প্রতি রাজাকারদের আকর্ষণ কিছু বেশি ছিলো বলে মনে হয়। লেখক এমন দুটি কিশোরীর কথা উল্লেখ করেছেন, যাঁরা দুজনই ছিলেন শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত

রায়ের বাজারের বধ্যভূমিতে পড়ে থাকা বুদ্ধিজীবীদের গলিত লাশ

হিন্দু পরিবারের সদস্য। একজন নবম শ্রেণীতে পড়তেন। এখন একটা স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা। কিন্তু ধর্ষিত হওয়ার কারণে তাঁর বিয়ে হয়নি। আর-একজন অধ্যাপক পরিবারের—আরও কম বয়সী। তাঁর পরিবারের সবাইকে হত্যা করে তাঁকে রাজাকাররা নিয়ে উপহার হিশেবে দিয়েছিলো এক দারোগার কাছে। ধর্মান্তর করে দারোগা তাঁকে ইসলামী মতে বিয়ে করে। তারপর তাঁকে নিয়ে যায় খুলনায়। সেখান থেকে এই কিশোরী কোনো দিন আর ফিরে আসেননি। (সরকার, ২০০৬)

যেসব মহিলা সাহস করে এবং লজ্জা কাটিয়ে প্রকাশ্যে উপর্যুপরি ধর্ষিত হওয়ার কথা স্বীকার করেছেন অথবা সে বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন, তাঁদের বিবরণ থেকেই অন্যদের প্রতি পাকিসেনা এবং রাজাকাররা কেমন ব্যবহার করেছিলো, তার আভাস পাওয়া যায়। একজন সাহসী নারী প্রকাশ্যে স্বীকার করেছেন যে, দশ-বারোজনের এক পাকসেনার দল তাঁকে গণধর্ষণের জন্যে অপহরণ করতে এলে, জীবন বাঁচানোর জন্যে তিনি তাঁদের বলেন যে, প্রতিদিন তাদের তিনজন যেন পালা করে তাঁকে নিয়ে যায়। এভাবে আত্মসম্মান বাঁচাতে না-পারলেও, তিনি নিজের

খুলনার চুকনগরের গণকবর থেকে তোলা মাথার খুলি

জীবন বাঁচিয়েছিলেন। যুদ্ধের পরেও তাঁর আর কোনো দিন বিয়ে হয়নি। কেউই তাঁকে গ্রহণ করেনি—আত্মীয় অথবা সমাজ।

গণধর্ষণের পর বেয়োনেট দিয়ে যোনিপথ কেটে হত্যা করা, স্তন কেটে ফেলা, ধর্ষণ করে মেরে ফেলা, অর্ধমৃত অবস্থায় রাস্তায় ফেলে রাখা—এমন কোনো অত্যাচারের কথা ভাবা যায় না, যার আশ্রয় নেয়নি পাকসেনারা। মফস্বলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ধর্ষণ করতো রাজাকাররা। যখন সৈন্যরা রীতিমতো যুদ্ধে লিপ্ত, তখনো তারা বিনোদন হিশেবে বাংকারে-বাংকারে নারী সম্ভোগ করতো। তার প্রমাণ পাওয়া যায়—বাংকারে পড়ে থাকা ধর্ষিতাদের মৃতদেহ থেকে। (জামিল, ২০০৯)

হত্যা এবং ধর্ষণ ছাড়া, দেশের মধ্যে যাঁরা পালিয়ে বেড়ান অথবা যাঁরা পালিয়ে যান ভারতে—সবারই নানা ধরনের ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছিলো। অনেকের বাড়িঘর পুড়িয়ে দিয়েছিলো পাকিস্তানীরা। দেশে ফিরে এসে অনেকে নিজের ভিটে কোথায় ছিলো, তা সহজে খুঁজে পাননি। এমনভাবে পুড়িয়ে সব কিছু মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিলো পাকিস্তানীরা, অথবা তাদের দোসর রাজাকারেরা। হিন্দুদের বাড়িঘর পোড়ানো এবং ভেঙে দেওয়ার ব্যাপারে রাজাকার এবং স্থানীয় ধনীদের বিশেষ আগ্রহ ছিলো। কারণ, এই হিন্দুরা চলে গেলে তাঁদের সম্পত্তি দখল করা যাবে। যুদ্ধের পরে যেসব ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িঘর মেরামত করতে হয়েছিলো তার সংখ্যা ছিলো পনেরো লাখ। (ম্যাসকারেনহ্যাস, ১৯৮৬)

তা ছাড়া, টাকাপয়সা এবং সম্পত্তির ক্ষতিও হয়েছিলো প্রচুর। গরু-ছাগল নিয়ে রান্না করে খেয়ে ফেলতো রাজাকারেরা। লুট করা ছিলো তাদের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। এমন কি, পালানোর পথেও শরণার্থীদের টাকাপয়সা, অলঙ্কার কেড়ে নেওয়া ছিলো রুটিনমাফিক কাজ। যুদ্ধের আগে বাঙালি বড়ো ব্যবসায়ী কমই ছিলেন। কিন্তু ছোটো ব্যবসায়ীরা সবাই কমবেশি ক্ষতির মুখোমুখি হয়েছিলেন। গ্রামেগঞ্জে দোকানপাট বন্ধ করে অনেকেই সরে পড়েছিলেন।

হিন্দুদের ধর্মান্তর করে মুসলমান করা হয়েছিলো বহু জায়গায়। স্বরোচিষ সরকারের জরিপ থেকে দেখা যায়, বাগেরহাট জেলায় এ রকমের প্রচুর ধর্মান্তর হয়েছিলো। এই ধর্মান্তরিত হিন্দুদের গরুর মাংস খাইয়ে তাঁদের মুসলমানত্বকে পাকা করা হতো। মরে গেলে পোড়ানোর বদলে তাদের কবর দেওয়া হতো। দেশে ফিরে এই কবর দেওয়া একটি মৃতদেহকে তাঁর আত্মীয়রা আবার চিতায় দাহ করেছিলো—এমন একটি কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনার উল্লেখ দেখা যায় লেখকের গ্রন্থে। হিন্দু বাড়ির মন্দিরকে মসজিদে পরিণত করার ঘটনাও জানা যায়। (সরকার, ২০০৬)

যুদ্ধের ফলে সামাজিক মূল্যও দিতে হয়েছিলো অনেক। ছাত্রদের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। অনেকে যুদ্ধের পরেও লেখাপড়ায় আর ফিরে যেতে পারেননি। অন্য কাজে যোগ দিয়েছিলেন। যাঁরা চাকরি-বাকরি করতেন, অথবা কোনো পেশায় নিয়োজিত ছিলেন, তাঁরাও ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন। কেউ কেউ আবার লুটের টাকা দিয়ে ব্যবসা করে রাতারাতি ধনীও সেজেছিলো।

কিন্তু সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলো মানুষের মূল্যবোধ। সামাজিক মূল্যবোধ এবং আইনের শৃঙ্খলা একেবারে ভেঙে পড়েছিলো। কোনো বিপ্লবের পর সেটা অস্বাভাবিকও নয়। ফরাসি বিপ্লব হয়েছিলো সাম্য, মৈত্রী, ভ্রাতৃত্বের আদর্শে। কিন্তু সে বিপ্লবের পর কয়েক বছর ধরে সেখানে চলেছিলো সন্ত্রাসের রাজত্ব। রাশিয়া, চীন, ক্যাম্বোডিয়া— সর্বত্র দেখা যায় একই ধরনের নৈরাজ্য। বাংলাদেশও কোনো ব্যতিক্রম ছিলো না। এবং তা শুরু হয়েছিলো বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে।

যাদের ক্ষমতা ছিলো, যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা আইন নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছিলো। অনেকে দেশে ফিরে প্রথমেই পূর্বশত্রুতার শোধ নিয়েছিলো। এমন কি, যে-বীর মুক্তিযোদ্ধারা প্রাণ দিয়ে এবং প্রাণের মায়া ত্যাগ করে যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছিলেন, তাঁরাও অনেকে এ সময়ে উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করতে আরম্ভ করেন। ষোলো তারিখ নিয়াজীর আত্মসমর্পণ পর থেকেই শুরু হয়েছিলো বহু মুক্তিযোদ্ধার উন্মত্ত আচরণ। মুক্তিযোদ্ধারা বাজি পেড়ানোর বদলে রাইফেল অথবা স্টেনগানের গুলি ছুঁড়ে আনন্দ-উল্লাস প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন। সেই সঙ্গে যাঁরা কোনো দিন মুক্তিযুদ্ধের ধারে-কাছে যাননি, তাঁরাও অনেকে বন্ধু অথবা আত্মীয়দের কাছ থেকে স্টেনগান জোগাড় করে ১৭ তারিখ রাস্তায় বের হন দর্পভরে, কেউ পায়ে
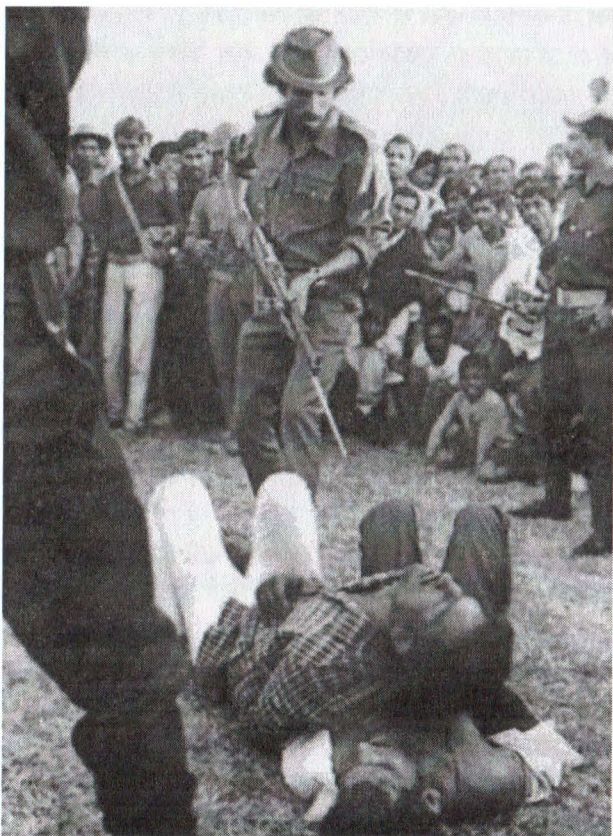
কাদের সিদ্দিকী বেয়োনেট দিয়ে এক দালালকে হত্যা করতে যাচ্ছেন

হেঁটে, কেউ গাড়িতে। এদের কেউ কেউ অবাঙালিদের সম্পত্তি লুটপাট করতে শুরু করে। অন্যদের ওপর চড়াও হয়। এদের তখন নাম হয় 'সিক্সটিন্থ ডিভিশন'—ষোড়শ বাহিনী। (ম্যাসকারেনহ্যাস, ১৯৮৬; জাহানারা ইমামের সাক্ষাৎকার, ২০০৯) কারণ এর সূচনা হয় ষোলো তারিখ। অবাঙালিদের সম্পত্তি লুটপাট করায় যে-উৎসাহ দেখা গিয়েছিলো, এই সিক্সটিন্থ ডিভিশনের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ ছিলো না। ভদ্রলোকরাও তাতে সমান উৎসাহী এবং সমান বিবেকবর্জিত ছিলেন। দৃষ্টান্ত দিতে পারি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রবীণ অধ্যাপকের। ইনি ঢাকায় একটি রাজসিক বাড়ি দখল করেন ধানমন্ডিতে। বাড়িটি ছিলো এক অবাঙালি শিল্পপতির। পরে অবশ্য এই বাড়ি তাঁকে ফেরত দিতে হয়েছিলো।

আইন হাতে তুলে নেওয়ার একটি বড়ো রকমের দৃষ্টান্ত দেখা যায় ১৮ তারিখ মুক্তিযোদ্ধাদের এক সমাবেশে। এই সমাবেশে দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধারা দেশ

গড়ার ব্যাপারে সবাইকে উৎসাহ দেন। নিজেরাও প্রতিজ্ঞা করেন দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করার। বস্তুত, এ সময়ে দেশের জন্যে আরও ত্যাগ স্বীকার করতে তৈরি ছিলেন লাখ লাখ মানুষ। এক রিক্সাওয়ালাকেও এই কথা বলতে শুনেছিলাম। কিন্তু এই সমাবেশের পরেই হঠাৎ মুক্তিযোদ্ধারা চারজন 'দালাল'কে পেটাতে আরম্ভ করেন। বেসামরিক মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন কাদের সিদ্দিকী। তাঁকে নিয়ে গর্ব করতাম আমরা সবাই। সত্যিকার অর্থে তিনি যেভাবে নিজে একটি বিশাল মুক্তিবাহিনী গড়ে তোলেন, তা বিস্ময়ের ব্যাপার। যেভাবে যুদ্ধ করে তিনি টাঙ্গাইল অঞ্চল দখল করে রাখেন, তাও অবিশ্বাস্য। বস্তুত, তিনি সবারই শ্রদ্ধা অর্জন করেন। কিন্তু ১৮ তারিখে 'দালাল' পেটানোর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিনিই। শেষ পর্যন্ত তিনি বিদেশী টেলিভিশনের সামনে বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে এই দালালদের হত্যা করেন। (মঈদুল, ১৯৯২) বলা বাহুল্য, আইন হাতে তুলে নেওয়ার এই দৃষ্টান্ত শ্রদ্ধার বস্তু ছিলো না। বহু দেশেই এই ঘটনার ছবি দেখানো হয়। ফলে যুদ্ধের সময়ে বাংলাদেশের প্রতি বিশ্ব-সমাজের যে-শুভেচ্ছা ও সহানুভূতি তৈরি হয়েছিলো, তখন থেকেই তাতে ভাটা পড়তে আরম্ভ করে।

১৯৭০-এর নির্বাচনে পূর্ববাংলার স্বাধিকার ছাড়া, আওয়ামী লীগের নেতাদের মনে আর কী লক্ষ্য ছিলো, জানা যায় না। এমন কি, মার্চের শেষে দেশের নেতারা স্বাধীনতা ছাড়া, আর কী চেয়েছিলেন, তাও জানা যায় না। কিন্তু সাধারণ মানুষ চেয়েছিলেন এমন একটা বাংলাদেশ, যেখানে থাকবে সংবিধানের প্রতি আনুগত্য, আইনের শাসন, বাকস্বাধীনতা, ভিন্নমত পোষণের স্বাধীনতা, স্বাধীনভাবে নিজের ধর্ম পালনের অধিকার, সবার জন্যে সমান সুযোগ, দুবেলা খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার ন্যূনতম ব্যবস্থা। বাংলাদেশের কাছে অন্য দেশগুলোর প্রত্যাশাও ছিলো এই। (অ্যান্টনি, ১৯৮৬) কিন্তু পাকিস্তানের আত্মসমর্পণের কিছুকাল পর থেকেই বাংলাদেশ যে-পথে যেতে আরম্ভ করে, তাতে এই প্রত্যাশা অনেকটাই ভেঙে পড়ে।

স্বাধীন বাংলাদেশ : স্বপ্ন ও বাস্তবতা

কলকাতা থেকে নির্বাসিত সরকারের মুখ্য সচিব রুহুল কুদ্দুস ঢাকায় আসেন পাকসেনাদের আত্মসমর্পণের দুদিন পরে—১৮ই ডিসেম্বর। সামান্য সংখ্যক কর্মচারী নিয়ে সচিবালয়ের কাজ শুরু করেন তিনি। আর, নির্বাসিত সরকারের মন্ত্রীরা ফিরে আসেন কদিন পরে—২২শে ডিসেম্বর। নভেম্বর থেকেই অবশ্য তাঁরা দেশের প্রশাসনের জন্যে নিয়োগ এবং পরিকল্পনার কাজ অনেকটা গুছিয়ে নিয়েছিলেন। (এইচ টি ইমাম, ২০০৪) যেমন, জেলা প্রশাসন কিভাবে গড়ে তোলা হবে; কারা দায়িত্ব নেবেন এই প্রশাসনের। যেমন, বিধ্বস্ত দেশের অর্থনীতিকে কিভাবে আবার চালু করা হবে; ত্রাণ পরিকল্পনা ইত্যাদি। মোট কথা, সীমাবদ্ধতার মধ্যে থেকেও বেসামরিক প্রশাসন ব্যবস্থা নির্মাণের কাজ কলকাতা থেকেই সরকার আরম্ভ করেছিলো। ঢাকায় এসে সেই কাজই এগিয়ে নেন তাঁরা। ওদিকে, ডিসেম্বর মাস শেষ হওয়ার আগেই অর্ধেকের বেশি ভারতীয় সৈন্য স্বদেশে ফিরে যান। অন্যরা যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে থাকেন।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইয়াহিয়া খান প্রেসিডেন্ট পদ ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। ২০শে ডিসেম্বর ভুট্টো হন প্রেসিডেন্ট। ২১শে ডিসেম্বর তিনি ঘোষণা করেন যে, শেখ মুজিবকে জেল থেকে মুক্তি দিয়ে গৃহবন্দী করা হবে। জেলারের দয়ায় তিনি যে-চাশমা ব্যারেজ কলোনিতে ছিলেন, সেখান থেকে ২৬ তারিখ তাঁকে সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টারে করে নিয়ে যাওয়া হয় রাওয়ালপিন্ডির বাইরে সিহালা অতিথি ভবনে। পরের দিন এই ভবনে সবার অজ্ঞাতে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন স্বয়ং জুলফিকার আলি ভুট্টো। তাঁর সঙ্গে কী আলোচনা হয়, জানা যায় না। কিন্তু তাঁর আসন্ন মুক্তির কথা ভুট্টো নিশ্চয় তাঁকে জানিয়েছিলেন। কামাল হোসেনও বন্দী আছেন—এ কথা জানালে, ভুট্টোকে মুজিব অনুরোধ করেন, তাঁকে সেখানে নিয়ে আসতে। পরের দিন কামাল হোসেন এলেন সেখানে। (সালিম,

১৯৯৭; কামাল হোসেনের সাক্ষাৎকার, ১৮. ৯. ২০০৯)

বাংলাদেশের লোকেরা তখনো জানতেন না, জাতির জনককে ছেড়ে দেওয়া হবে কিনা, অথবা ছেড়ে দিলে কবে তিনি ফিরে আসবেন। ইতিমধ্যে তাঁর অনুপস্থিতিতে, তাজউদ্দীনের নেতৃত্বে দেশ চলতে থাকে। কিন্তু নেতা হিশেবে তাজউদ্দীন এমন প্রভাবশালী অথবা এমন জনপ্রিয় ছিলেন না, যাতে তিনি একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত জাতিকে নেতৃত্ব দিতে পারতেন। অত্যন্ত সৎ এবং আত্মত্যাগী নেতা হলেও, বহু-বিভক্ত এবং বিপ্লব-পরবর্তী বিশৃঙ্খল সমাজের নেতৃত্ব দেওয়ার মতো ক্ষমতা তাঁর ছিলো না। আমরা আগেই বলেছি, তাঁর বিরুদ্ধে কলকাতাতেও মুজিব বাহিনী এবং নির্বাচিত সদস্যদের একটা অংশ সোচ্চার ছিলো। খোদ মন্ত্রিসভার ভেতরেও তাঁর নেতৃত্ব সবাই মেনে নিতে চাননি।

এ ছাড়া, দুই ন্যাপ এবং মস্কোপন্থী কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধিতাও ছিলো। এই দলগুলোর দাবি ছিলো একটা জাতীয় ঐক্যের সরকার গঠন করার। তাদের দাবি অযৌক্তিক ছিলো না। কারণ, মুক্তিযুদ্ধে কেবল আওয়ামী লীগের কর্মী এবং সমর্থকরা অংশ গ্রহণ করেননি, বরং এতে অংশ নিয়েছিলেন সবাই—দলমত নির্বিশেষে। ছাত্র ইউনিয়ন কিভাবে মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলো এবং তাতে যে-কারও মতোই সাফল্য লাভ করেছিলো, তার প্রমাণ মেলে রণাঙ্গন থেকে লেখা মুজাহিদুল ইসলাম সেলিমের একটি চিঠি থেকে। (*একাত্তরের চিঠি*, ২০০৯) যে-গেরিলাদের নিয়ে আমরা গর্ব করি, তাঁদেরও একটা বড়ো অংশ ছিলেন, যাঁরা আওয়ামী লীগের সদস্য ছিলেন না।

প্রকৃত পক্ষে, মোজাফফর ন্যাপ, ভাসানী ন্যাপ, মস্কোপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি ও ছাত্র ইউনিয়নের সমর্থক, এমন কি, নিদর্লীয় তরুণরাও যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। যোগ দিয়েছিলেন গ্রামের অনেক চাষী এবং শ্রমিক। যাঁদের কোনো দল ছিলো না। সৈন্যবাহিনী, ইপিআর এবং পুলিশের সদস্যরাও এতে অংশ নেন ব্যাপক সংখ্যায়। তাঁরাও বেশির ভাগ কোনো দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। সুতরাং যুদ্ধের পরে যদি একটি সর্বদলীয় সরকার গঠিত হতো, তা হলে সেটাই ন্যায্য হতো। তার বদলে ১৯৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের যে-সদস্যরা জাতীয় সংসদ অথবা প্রাদেশিক পরিষদের জন্যে নির্বাচিত হয়েছিলেন, কেবল তাঁদের নিয়ে সরকার গঠন করা সমীচীন অথবা ন্যায্য হয়নি। এমন কি, ঠিক আইনসম্মত হয়েছিলো কিনা, সে বিষয়েও সন্দেহ আছে। ১৯৭০ সালে জনগণ আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়েছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের জন্যে স্বাধিকার অর্জনের দল হিশেবে, স্বাধীন বাংলাদেশের পার্লামেন্ট অথবা মন্ত্রিসভা গঠনের জন্যে নয়।

যুদ্ধের শেষে দেশে যে-বিশৃঙ্খলা এবং আইনের প্রতি অবজ্ঞা দেখা দেয়, তাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে নেওয়ার মতো ক্ষমতা তাজউদ্দীনের মন্ত্রিসভার ছিলো না। সত্যি সত্যি দরকার ছিলো হয় একটি জাতীয় ঐক্যের সরকার গঠনের অথবা

শেখ মুজিবের মতো একজন প্রভাবশালী নেতা এবং 'ফাদার ফিগারে'র। অর্থাৎ এমন একজন নেতার, যাঁকে সবাই পিতার মতো মেনে নেবে।

সেই জাতির জনক শেখ মুজিব পাকিস্তান থেকে ছাড়া পান ৭ই জানুয়ারি ভোর রাতে—অর্থাৎ ইংরেজি হিশেব মতে, ৮ই খুব ভোরে। রাত তিনটের সময়ে কামাল হোসেন এবং তাঁকে ভুটো বিমানে তুলে দেন। সকাল সাড়ে ছটায় তাঁরা এসে নামেন লন্ডনের হীথরো বিমানবন্দরে। বেলা দশটার পর থেকে তিনি টেলিফোনে কথা বলেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথ, তাজউদ্দীন এবং ইন্দিরা গান্ধী-সহ অনেকের সঙ্গে। তিনি ঘণ্টাখানেক ঘরোয়া বৈঠকেও আলোচনা করেন হীথের সঙ্গে (মতিন, ১৯৮৯; অ্যান্টনি, ১৯৮৬)। তারপর ব্রিটেনের বিমানবাহিনীর একটি বিমানে করে তিনি পরের দিন দেশের পথে যাত্রা করেন।

লন্ডনে শেখ মুজিবের সংবাদ সম্মেলন : ৮ই জানুয়ারি ১৯৭২

দশ তারিখ সকালে তিনি নামেন দিল্লিতে। সেখানে ভারতের রাষ্ট্রপতি ভি ভি গিরি, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, সমগ্র মন্ত্রিসভা, প্রধান নেতৃবৃন্দ, তিন বাহিনীর প্রধানরা এবং অন্যান্য সম্মানিত অতিথিদের কাছ থেকে উষ্ণ সংবর্ধনা লাভ করেন সদ্য-স্বাধীন বাংলাদেশের জনক, শেখ মুজিবুর রহমান। ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে তাঁর বৈঠকও হয়। ভারতের নেতৃবৃন্দ এবং জনগণের কাছে তাঁদের অকৃপণ সাহায্যের

১০ই জানুয়ারি ১৯৭২ : জাতির পিতার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

জন্যে তিনি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানান। নিজের সম্পর্কে তিনি বলেন যে, তিনি আলো থেকে অন্ধকারে বেরিয়ে এসেছেন।

তারপর ঢাকায় এসে তিনি পৌছান সেদিনই অপরাহ্নে। আনন্দে আত্মহারা লাখ লাখ লোক বিমানবন্দর থেকে রেসকোর্স ময়দান পর্যন্ত তাঁকে স্বতঃস্ফূর্ত সংবর্ধনা জানান। বিকেল পাঁচটায় রেসকোর্স ময়দানে প্রায় দশ লাখ লোকের সামনে ভাষণ দেন তিনি। কাঁদতে কাঁদতে তিনি সবার ত্যাগের কথা স্মরণ করেন। দেশ গড়ার কাজে উদ্বুদ্ধ করেন সবাইকে। দেশে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনে দেশ শাসনের জন্যে যে-নেতার প্রয়োজন ছিলো, সেই শূন্য স্থান তিনি পূরণ করলেন দেশে ফিরে। তাঁর জন্যেই সমগ্র জাতি প্রতীক্ষা করে ছিলো। পরের দিন তাঁর আগমন উপলক্ষে ছিলো সরকারী ছুটি। এদিন তাজউদ্দীনের সঙ্গে তাঁর সংক্ষিপ্ত আলাপ হয় সরকার গঠন সম্পর্কে। কিন্তু তিনি তাজউদ্দীনের কাছে একবারও জানতে চাননি, ন মাস মুক্তিযুদ্ধ কিভাবে চলেছিলো। জানতে চাননি নির্বাসিত সরকারের কথা এবং মুক্তিযোদ্ধাদের ভূমিকার কথা। ('জোহরা তাজউদ্দীনের সাক্ষাৎকার', মতিউরি রহমান, ২০০৪) তিনি দীর্ঘদিন কারারুদ্ধ এবং সব সংবাদ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার পর হঠাৎ জেগে উঠেছিলেন বাস্তবতার আলোতে। কিন্তু ন মাস কী ঘটেছিলো,

নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে তিনি তা শুনতে চাননি। শুনেছিলেন হয়তো তাঁর স্বজনদের কাছ থেকে। তা ছাড়া, তিনি সম্ভবত এক ধরনের কমপ্লেক্সে ভুগতে আরম্ভ করেন। ভাবেন যে, বোধহয় যাঁরা যুদ্ধে সরাসরি অংশ নিয়েছিলেন, তাঁরা সমস্তটা কৃতিত্ব নিজেরাই দাবি করছেন। (দীক্ষিত, ২০০১) এ ছিলো তাঁর ভ্রান্ত ধারণা। কারণ, যোদ্ধারা একত্রিত হয়েছিলেন তাঁরই নামে, তাঁরই আহ্বানে।

প্রসঙ্গত একটা জিনিশ লক্ষ করার মতো। তিনি বাংলাদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা আন্দোলনের সময়েও সশরীরে উপস্থিত ছিলেন না—অর্থাৎ উপস্থিত থাকতে পারেননি। ভাষা আন্দোলনের সময়ে তিনি ছিলেন ফরিদপুরে কারারুদ্ধ। '৬৯-এর আন্দোলনের সময়ে ছিলেন ঢাকা এবং অন্যান্য জায়গায়। '৭১-এ ছিলেন পাকিস্তানে। এই অনুপস্থিতির কারণে তাঁর মনে একটা কমপ্লেক্স তৈরি হয়ে থাকলে অবাক হওয়ার কারণ নেই।

মুজিব ন্যায়তই রাষ্ট্রপতি এবং রাষ্ট্রপ্রধান হতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি চেয়েছিলেন প্রেসিডেনশিয়াল পদ্ধতির সরকার প্রবর্তন করতে। কিন্তু তাজউদ্দীন তাঁকে মনে করিয়ে দেন যে, আওয়ামী লীগ পূর্ববর্তী দু দশক ধরে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রচলনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলো। তাই রাষ্ট্রপতি না-হয়ে শেখ মুজিব প্রধানমন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রপতি যতোই কম ক্ষমতার অধিকারী হন না কেন, মুজিব কোনো রাজনৈতিক নেতার 'অধীনে' প্রধানমন্ত্রী হতে রাজি ছিলেন না। এ জন্যে ১২ই জানুয়ারি নতুন রাষ্ট্রপতি হিশেবে তিনি মনোনীত করেন অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে, যিনি পশ্চিমা দেশগুলোতে বাংলাদেশের পক্ষে যুদ্ধের পুরো সময়টাই প্রচার চালিয়েছিলেন। তাজউদ্দীন হলেন অর্থমন্ত্রী। পুরোদমে যাত্রা শুরু করে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার। মুজিব দেশে ফেরার আগেই তাজউদ্দীন মন্ত্রিসভার আয়তন বাড়িয়েছিলেন। এবং মোশতাককে না-জানিয়েই তাঁর সহকারী আবদুস সালাম আজাদকে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব দিয়েছিলেন। পরের ঘটনা থেকে মনে হয়, মোশতাক এই অপমানের কথা কখনো ভুলে যাননি। বরং প্রথম সুযোগেই তাজউদ্দীনকে ঠেলে দিয়েছিলেন মৃত্যুর মুখে। মুজিবও আওয়ামী লীগ সরকার বহাল রাখলেন—জাতীয় ঐক্য সরকার গঠন করে তাঁর ঔদার্য প্রমাণ করলেন না। এ সম্পর্কে রাজনীতি সচেতন একজন সাধারণ গৃহবধূ যা লিখেছেন, তা এখানে উল্লেখ করতে পারি :

> মনে হলো, তিনি (শেখ মুজিব) ভাবলেন, আওয়ামী লীগ যেহেতু '৭০ সালে নির্বাচনে জিতেছিলো, অতএব আওয়ামী লীগই সরকার গঠন করবে। অথচ মুক্তিযুদ্ধ করেছিলো সবাই, কেমন? ... সেই সব মুক্তিযোদ্ধাকে কিন্তু আওয়ামী সরকার সন্দেহের চোখে দেখে তাদের সরিয়ে রাখলো। আমার মনে হয়, যে মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধের প্রয়োজনে পুল ভেঙেছিলো, রাস্তা ভেঙেছিলো, উচিত ছিলো স্বাধীনতার পর তাদের দিয়েই ভাঙা রাস্তা ভাঙা পুল মেরামত করানো, একটা বছর তাদের দিয়ে দেশ গড়ার কাজ করিয়ে নেওয়া। ... ওইটা যদি করা যেতো বা সরকার গঠনে যদি সবার প্রতিনিধিত্ব থাকতো,

তা হলে বোধহয় তার ফলটা ধীরে ধীরে ভালো হতো। (সরদার ফজলুল করিমের সঙ্গে জাহানারা ইমামের সাক্ষাৎকার, *প্রথম আলো*, ঈদসংখ্যা, ২০০৯)

স্বাধীনতার আনন্দ এবং উচ্ছ্বাস কেটে যেতে সময় লাগেনি। তারপর কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হয় বাংলাদেশ সরকার। যুদ্ধের সময়ে দেশের পুরো অর্থনৈতিক অবকাঠামো বিধ্বস্ত হয়েছিলো। এমন কি, প্রশাসনিক অবকাঠামোও লোপ পেয়েছিলো। কলকারখানা, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, আমদানি-রফতানি, রাস্তাঘাট, সড়ক-সেতু ও রেলসেতু-সহ যোগাযোগ ব্যবস্থা, পরিবহন ব্যবস্থা, শিক্ষা, উৎপাদন এবং বণ্টন ব্যবস্থা—সবই কমবেশি অচল হয়ে পড়েছিলো। কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিলেই বোঝা যাবে কী ব্যাপক এবং কঠিন সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিলো নতুন সরকার। যুদ্ধের আগে বাংলাদেশে ট্রাক ছিলো আট হাজার। যুদ্ধের পরে তার মধ্যে চালু ছিলো মাত্র হাজার খানেক। তিন শতাধিক ছোটোবড়ো রেল-সেতু ভেঙে পড়েছিলো মুক্তিযোদ্ধা এবং পাকসেনাদের হাতে। প্রায় তিন শোটি সড়ক-সেতুও বিধ্বস্ত হয়েছিলো। চট্টগ্রাম বন্দরে ঢোকার মুখ বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো ২৯টি বিধ্বস্ত জাহাজের ধ্বংসাবশেষে। (অ্যান্টনি, ১৯৮৬)

বাংলাদেশ তখন যে-অনটনের মধ্যে ছিলো, সমগ্র বিশ্ব চেষ্টা করলেও, তা থেকে তাকে রক্ষা করা সহজ ছিলো না। যেমন, ত্রাণ। ত্রাণ সামগ্রী দেশে এলেও, তা গ্রামে গ্রামে পৌঁছে দেওয়া প্রায় অসম্ভব ছিলো। কারণ, তার জন্যে যে-অবকাঠামো দরকার, বাংলাদেশের আগেই তা ভেঙে পড়েছিলো। বন্ধ কলকারখানাগুলো চালু করাও সহজ ছিলো না। তার জন্যে যে-প্রকৌশলী এবং যন্ত্রাংশ প্রয়োজন ছিলো, তার কোনো ব্যবস্থা ছিলো না। এমন কি, একটা শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্যে যে-কারিগরি জ্ঞান এবং দক্ষতাসম্পন্ন পরিচালক প্রয়োজন, বাঙালিদের মধ্যে তা খুব কমই ছিলেন। কারণ, যুদ্ধের আগে বাঙালিদের মধ্যে শিল্প-মালিক গড়ে ওঠেননি। আমদানি-রফতানির সমস্ত যোগাযোগও হারিয়ে গিয়েছিলো। মোট কথা, উৎপাদন এবং বণ্টন ব্যবস্থা—উভয়ই ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলো।

এ সময়ে বাংলাদেশকে গড়ে তোলার জন্যে জাতিসংঘ এগিয়ে আসে 'আনরড' নামে একটি পরিকল্পনা নিয়ে। এর পক্ষ থেকে সাহায্য করতে আসে অনেকগুলো দেশ। ডুবে থাকা জাহাজগুলো এবং মাইন সরিয়ে চট্টগ্রাম এবং চালনা বন্দর দুটিকে ব্যবহারের উপযোগী করে তোলে সোভিয়েত এবং ভারতের নৌবাহিনী। ব্রিটেনের সেনাবাহিনী মেরামত করে বেশির ভাগ বড়ো রেলসেতু। ভারতের প্রকৌশলীরা রেলওয়েকে চলাচলের উপযোগী করেন। স্ক্যান্ডিনেভিয়ার দেশগুলো থেকে ডাক্তার এবং নার্সরা আসেন মহামারী ঠেকানোর জন্যে। ফরাসি এবং জাপানী প্রকৌশলীরা সাহায্য করেন মিলগুলো চালু করতে। কিন্তু 'আনরড' বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা গড়ে তুলতে চাইলেও, বাংলাদেশ

তেমন উৎসাহের সঙ্গে এর সাহায্য কাজে লাগায়নি। (অ্যান্টনি, ১৯৮৬) সম্ভবত সরকার এবং প্রভাবশালী লোকেদের মধ্যে ক্ষমতার যে-দ্বন্দ্ব চলছিলো, তা নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন তাঁরা।

কার্যকর প্রশাসন চালনার ব্যাপারেও সত্যিকার সমস্যা ছিলো। স্বয়ং শেখ মুজিব-সহ মন্ত্রীদের কারওই দেশ পরিচালনার অভিজ্ঞতা ছিলো। অথবা তাঁদের যেটুকু অভিজ্ঞতা ছিলো, তা যথেষ্ট ছিলো না। মুজিব পঞ্চাশের দশকে মোট বছরখানেক মন্ত্রিত্ব করেছিলেন। সরকার পরিচালনার কাজটা আরও কঠিন হয় দুভাবে—এক. প্রশাসনকে দলীয়করণের চেষ্টায়; এবং দুই. ভুল লোক নিয়োগ দেওয়ায়। মুজিব বাংলাদেশের বিতর্কাতীত জন্মদাতা। কিন্তু জাতির পিতা হলেও তিনি দেশের তাবৎ লোককে সমান দৃষ্টিতে দেখতে পারেননি। সমগ্র জাতির নেতা তিনি হতে পারেননি, অথবা হতে চাননি। যেমন, গান্ধীজী হয়েছিলেন। অথবা তাঁর থেকেও বড়ো দৃষ্টান্ত: যেমন দু দশক পরে নেলসন ম্যান্ডেলা হয়েছিলেন। মুজিব ছিলেন সাহসিকতার প্রতীক, আপোশহীন, দয়ালু, ক্ষমাশীল, বন্ধুত্বপূর্ণ মানুষ। *নিউজউইক* পত্রিকার ভাষায় 'রাজনীতির কবি।' (৫. ৪. ৭১) অর্থাৎ রূঢ় বাস্তবতার বদলে তাঁর পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠিত ছিলো কল্পনা-বিলাসের ওপর। গণতন্ত্রের জন্যে তাঁর মতো ত্যাগ কোনো বাঙালি কোনো দিন স্বীকার করেননি। তাঁর দ্বিতীয় বাসস্থান ছিলো জেলখানা। তা সত্ত্বেও, 'বঙ্গবন্ধু' এক অর্থে আওয়ামী লীগেরই বন্ধু থেকে যান, তাবৎ বাঙালির বন্ধু হতে পারেননি।

প্রশাসনের জন্যে তিনি কেবল যোগ্য লোক অথবা রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত লোকই বেছে নেননি। তিনি যাঁদের বেছে নিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন বহু স্বজন, বহু মোশায়েব এবং বহু দালাল। এমন কি, নিয়েছিলেন বহু লোক—বাংলাদেশ অথবা তাঁর প্রতি যাঁদের আন্তরিক কোনো আনুগত্য ছিলো না। সাংবাদিক অ্যান্টনি ম্যাসকারেনহ্যাস ছিলেন তাঁর দীর্ঘদিনের পরিচিত এবং বন্ধুস্থানীয়। পঞ্চাশের দশক থেকে তাঁদের পরিচয়। একই হোটেলে একই ঘরে তাঁরা ছিলেন এক সময়ে। ব্যক্তি মুজিব এবং বাংলাদেশের প্রতি ম্যাসকারেনহ্যাসের ছিলো সত্যিকার ভালোবাসা। '৭১-এর জুন মাসে *সানডে টাইমসে* প্রকাশিত তাঁর প্রতিবেদন (১৩ জুন) থেকেই বিশ্বসম্প্রদায় প্রথম বাংলাদেশে গণহত্যার সত্যিকার ব্যাপকতা ও ভয়াবহতা জানতে পায়। কয়েক মাস পরে—সেপ্টেম্বরে—প্রকাশিত হয় তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *দ্য রেইপ অব বাংলাদেশ।* এ গ্রন্থও বাংলাদেশের প্রতি বিশ্ববিবেককে জাগ্রত করেছিলো। এই ম্যাসকারেনহ্যাসই লিখেছেন মুজিব কিভাবে নিজেই নিজের সর্বনাশ ডেকে এনেছিলেন দালালদের অথবা অযোগ্য লোকেদের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে বসিয়ে। তিনি সুনির্দিষ্ট দৃষ্টান্তও দিয়েছেন। (*আ লেগাসি অব ব্লাড,* ১৯৮৬) যাঁদের বিশ্বাস করা উচিত হয়নি, যাঁদের ভরসা করা উচিত হয়নি—জাতির জনক বেছে নিয়েছিলেন এমন বহু লোককেই। তা ছাড়া, তিনি এঁদেরই তাঁর চক্ষু-

কর্ণে পরিণত করেন—অর্থাৎ এঁদের কথাই তিনি বিশ্বাস করতেন; এবং সেই বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে তিনি সিদ্ধান্ত নিতেন। এঁদের চোখ দিয়েই তিনি বাংলাদেশকে দেখতেন। তাঁর এই বিশ্বস্ত আপনজনেরাই তাঁর পতনের জন্যে সবচেয়ে দায়ী।

দু-একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। যে-তাজউদ্দীন যোগ্যতার সঙ্গে ন মাস নির্বাসিত সরকারকে পরিচালনা করেন এবং মুজিবের প্রতি যাঁর ছিলো ষোলো আনা আনুগত্য ও ভালোবাসা, সেই তাজউদ্দীনের কাছ থেকে তিনি একদিনও শোনেননি, ন মাস ধরে তিনি কিভাবে দেশকে স্বাধীনতার পথে এগিয়ে দিয়েছিলেন। মুজিব এই বিবরণ শুনেছিলেন তাজউদ্দীন-বিরোধী তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে। তাই তাঁর 'ভালো খাতা' থেকে তাজউদ্দীন বাদ পড়েন। এমন কি, এক সময়ে বাদ পড়েন মন্ত্রিসভা থেকেও। তাঁর বদলে তাঁর 'ভালো খাতা'র অন্তর্ভুক্ত হন খন্দকার মোশতাক, যে-মোশতাক যুদ্ধের সময়ে পাকিস্তান আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দালালি করেছেন; এবং যে-মোশতাক পরে ষড়যন্ত্রে নেতৃত্ব দিয়ে মুজিবকে নিষ্করুণভাবে হত্যা করেছিলেন সপরিবারে। হত্যা করে তারপর ক্ষমতা দখল করেছিলেন। কামাল হোসেন নিজের কানে একদিন শুনেছেন, কিভাবে বেগম মুজিবের কাছে মোশতাক নিন্দা করছিলেন তাজউদ্দীনের। (কামাল হোসেনের সাক্ষাৎকার, ১৮. ৯. ২০০৯) এ হলো বিশ্বাসঘাতক এবং দালালদের ক্ষমতায়নের একটি কালো দৃষ্টান্ত।

এবারে দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক ভুল লোক নির্বাচনের। সম্প্রতি মুজিব-হত্যার বিচার প্রসঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বাংলাদেশের তখনকার প্রধান সেনাপতি জেনারেল সফিউল্লাহকে 'মিথ্যাবাদী এবং কাপুরুষ' বলে উল্লেখ করেছেন। মিথ্যাবাদী এবং কাপুরুষ কিনা, আমার জানা নেই। কিন্তু তিনি যে তাঁর পদের যোগ্য ছিলেন না, এ বিষয়ে তেমন সন্দেহ নেই। কারণ, তিনি প্রধান সেনাপতি হয়েও, দেশের রাষ্ট্রপতিকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তিনি তাঁর বাহিনীর ভেতরে যে-ষড়যন্ত্র চলছিলো, তার খবরও রাখেননি। তিনি যে ঢাকার উপকণ্ঠে—জয়দেবপুরে অবস্থান করেও, '৭১-এ বিদ্রোহ করেছিলেন ২৮শে মার্চ, এ-ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাঁর দ্বিধা এবং অক্ষমতাই প্রকাশ করে। দিনাজপুরের এক প্রত্যন্ত এলাকায় বসেও ভুলু মিয়া ২৫শে মার্চ রাতে বিদ্রোহ করেছিলেন। মেহেরপুরে সুবেদার মুজিবুর রহমানও বিদ্রোহ করেছিলেন ২৫শের রাতে। রফিকুল ইসলাম চট্টগ্রামে যুদ্ধ শুরু করেছিলেন ২৫শে মার্চ রাত পৌনে নটায়। জিয়াউর রহমান বিদ্রোহ করেন ২৫শে মার্চ রাত বারোটার পরে। কুষ্টিয়ায় আবু ওসমান করেন ২৬শে; সিলেটে খালেদ মোশাররফ এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় শাফায়াত জামিল করেন ২৭শে। ঢাকার অতো কাছে থেকেও সফিউল্লাহ কেন ২৮ তারিখ পূর্বাহ্ণে বিদ্রোহ করলেন, ঠিক বোঝা যায় না। অথচ শেখ মুজিব সিনিয়রিটি ভেঙে প্রধান সেনাপতি নিয়োগ করেছিলেন এই

সফিউল্লাকে। জিয়াউর রহমান ছিলেন তাঁর থেকে সিনিয়র। স্বয়ং সফিউল্লাহ এক সাক্ষাৎকারে স্বীকার করেছেন যে, জিয়ারই সেনাধ্যক্ষের পদ পাওয়া উচিত ছিলো। (মানবজমিন, ডিসেম্বর ২০০৯)। ১৯৭৪ সালে যখন সফিউল্লাহর সেনাধ্যক্ষ পদের মেয়াদ ফুরিয়ে যায়, তখন মুজিব দ্বিতীয়বারের জন্যে সফিউল্লাহকে নিয়োগ দান করেন, জিয়াকে নয়। জিয়া এতে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন।

ন মাস পাকিস্তানের দালালি করেছেন অথবা পাকিস্তানের পক্ষে প্রচার চালিয়েছেন, এমন ব্যক্তিদেরও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিলো। এ রকমের একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন ম্যাসকারেনহ্যাস। পশ্চিম পাকিস্তানে একজন বাঙালি সাংবাদিক ছিলেন। যুদ্ধের সময় রেডিও পাকিস্তানের জন্যে তিনি মুক্তিযুদ্ধ-বিরোধী একটি প্রোপ্যাগান্ডা অনুষ্ঠান করতেন। এর নাম 'দ্য প্লেইন ট্রুথ'। প্রতিটি কথিকার জন্যে পেতেন ৩০ থেকে ৫০ টাকা। ইনি বাংলাদেশে ফিরে আসার পর মুজিব এঁকে পুরস্কৃত করেন তাঁর প্রেস অফিসার করে। (অ্যান্টনি, ১৯৮৬) অন্য একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন খলিলুর রহমান। এ দৃষ্টান্ত রিয়াজ রহমান সম্পর্কে। দিল্লিতে পাকিস্তানের হাই কমিশনে তিনি ছিলেন দ্বিতীয় সচিব। অন্য বাঙালি কর্মচারীরা বাংলাদেশের পক্ষে আনুগত্য ঘোষণা করলেও, রিয়াজ রহমান পশ্চিম পাকিস্তানে পালিয়ে গিয়ে তাঁর দেশপ্রেমের পরিচয় দেন। পাকিস্তানের পত্রিকায় রিয়াজের দেশপ্রেমের খবর ফলাও করে প্রচারিত হয়। পুরস্কারস্বরূপ তাঁকে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দ্বিতীয় সচিব করা হয়। পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশে ফেরার পর তাঁকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ পদে বসান শেখ মুজিব। আরও পরে তিনি পররাষ্ট্রসচিব ও রাষ্ট্রদূত হয়েছিলেন। (খলিলুর, ২০০৯) বর্তমানে বিএনপির নেতা। প্রতিমন্ত্রীও হয়েছিলেন বিএনপির।

এমনি, আর-একটি দৃষ্টান্ত মাহবুবুল আলম 'চাষী'। 'চাষী' নামটি তিনি ভালোই বেছে নিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর মতো বিশ্বাসঘাতকতা এবং কূটবুদ্ধি চাষীদের থাকে না, এই যা। চাষীরা সারল্যের প্রতীক। এই নকল 'চাষী' কলকাতায় মোশতাকের যোগ্য সহচর ছিলেন পাকিস্তান এবং মার্কিন দালালীতে। তিনিই আবার মুক্তিযোদ্ধা সেজে বাংলাদেশে এসে বসলেন গুরুত্বপূর্ণ পদে। মুজিব হত্যায় তিনি ছিলেন মোশতাকের যোগ্য এবং অনুগত সহচর। মোশতাকের আর-এক অনুচর ছিলেন তাহের উদ্দীন ঠাকুর। কলকাতায়ও এঁরা তিনজন একাট্টা ছিলেন।

পুরস্কৃত হওয়ার আরও একজন দৃষ্টান্ত হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে আটকা পড়েছিলেন—এটা মাত্র আংশিক সত্য। কারণ, তিনি যুদ্ধের সময়ে বাংলাদেশে বেড়াতে এসেছিলেন। রংপুরে গিয়েছিলেন। ইচ্ছে করলে অনায়াসে তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে পারতেন। কিন্তু সে রকমের ইচ্ছে তিনি করেননি। বরং পূর্ব-পর বিবেচনা করেই মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেননি। অথচ পাকিস্তান থেকে ফিরে তিনি সেনাবাহিনীতে বেশ ঊর্ধ্বতন পদ লাভ করেছিলেন।

যাঁরা পশ্চিম পাকিস্তানে আটকা পড়েছিলেন, তাঁরা সেখানে সুখে সময় কাটিয়েছেন, মনে করার কারণ নেই। বরং অনেকে দুঃসহ যন্ত্রণার মধ্যেই ছিলেন। খলিলুর রহমানের বই থেকে এই আটকা-পড়া বাঙালিদের অবস্থা সম্পর্কে খানিকটা সংবাদ পাওয়া যায়। তাহের অথবা মঞ্জুরের মতো যাঁরা পালিয়ে এসে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে পেরেছিলেন, তাঁরা ভাগ্যবান। তাঁদের অনেকে যুদ্ধে বড়ো রকমের অবদানও রেখেছিলেন। কিন্তু যাঁরা পালিয়ে আসতে পারেননি, তাঁদেরও বেশির ভাগের মনে দেশপ্রেম কিছু কম ছিলো না। আবার, যাঁরা বাংলাদেশ থেকে ভারতে পালিয়ে গিয়ে 'মুক্তিযোদ্ধা'র লেবাস পরে এসেছিলেন, মোশতাক এবং মাহবুব আলম চাষীর মতো, তাঁদের অনেকে ছিলেন ঘরের শত্রু বিভীষণের মতো। মোট কথা, পাকিস্তান-ফেরত অথবা ভারত-ফেরত বলে ঢালাওভাবে কারো ওপর ভালো-মন্দের লেবেল এঁটে দেওয়া যায় না। কিন্তু কার্যকালে ভারত-ফেরতরা অনেকেই অকারণে উন্নতির পথে এগিয়ে গিয়েছিলেন। আবার পাকিস্তান থেকে ফিরে-আসা অনেক সত্যিকার দেশপ্রেমিককে যথাযথ কাজে লাগানো হয়নি।

সত্য বটে, ঠিক লোককে চিনে নেওয়া সহজ ছিলো না। তার ওপর, শেখ মুজিবের পক্ষে চেনা আরও শক্ত হয়েছিলো দুটো কারণে। এক. তিনি যুদ্ধের সময় বাইরের জগতের কোনো খবরই জানতেন না। মুক্তির পর রিপ ভ্যান উইঙ্কেলের মতো জেগে উঠে তিনি হঠাৎ স্বাধীন বাংলাদেশ দেখতে পান। আর, দ্বিতীয় কারণ, তাঁর উপদেষ্টারা। এমন কি, তিনি যে খুব দয়ালু এবং ক্ষমাশীল ছিলেন—তাও তাঁকে শক্ত হাতে লোক বাছাই করার ব্যাপারে বাধা দিয়েছিলো। যেমন, তিনি একাধিক দালালকে জেলে পুরে রেখেছিলেন; আবার সেই সঙ্গে তাঁদের পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে অর্থ অথবা বাসস্থানও দিয়েছিলেন। অ্যান্টনি ম্যাসকারেনহ্যাস লিখেছেন যে, মুজিব দেশ শাসন করেছিলেন গ্রামের মোড়লের মতো। (১৯৮৬) সব কিছুই নিজে করতে চাইতেন তিনি। কাউকে নিয়োগ দিতে হলে বিভাগীয় প্রধানের মতামত না-নিয়ে নিজেই দিতেন। কাউকে বরখাস্ত করতে হলেও অনেক সময় বিভাগীয় প্রধানের মতামতের ধার ধারতেন না। একজন রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষে সব কিছুতে হস্তক্ষেপ করা সম্ভব নয়, অথবা কার্যকর শাসনের জন্যেও তা সহায়তা করে না।

টিটোর দূত '৭২-এর জানুয়ারি মাসেই মুজিবকে হুঁশিয়ার করে বলে দিয়েছিলেন যে, শত্রুকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব না-দিয়ে বরং মুক্তিযোদ্ধাদের দেওয়া ভালো, কারণ তাঁরা অন্তত দেশকে ভালোবাসেন। যে-সিভিল সার্ভেন্টরা যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন, তাঁদের উন্নতি হয়েছিলো; কিন্তু কেবল মুক্তিযোদ্ধা হিশেবে মুজিব কাউকে সচিবালয়ে কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করেননি। বছর দুয়েক পরে জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনে টিটোর মতো ফিডেল ক্যাস্ট্রোও মুজিবকে একই হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। কিন্তু ততোদিনে বড্ডো দেরি হয়ে গিয়েছিলো।

যুদ্ধের আগে বাংলাদেশের লোকেরা ভেবেছিলেন যে, বাংলাদেশ হবে তাঁদের সব-পেয়েছির দেশ। সেখানে খাওয়া-পরা থেকে আরম্ভ করে সবকিছুই পাওয়া যাবে সহজে, শস্তায়, পর্যাপ্ত পরিমাণে। আওয়ামী লীগের বিখ্যাত পোস্টার 'সোনার বাংলা শ্মশান কেন?' থেকে তাঁদের মনে হয়েছিলো, স্বাধীন বাংলাদেশ হবে ছোটোখাটো স্বর্গের মতো। যুদ্ধের সময়ে মানুষের যে-অকথ্য ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছিলো, তার জন্যে কারো অভিযোগ ছিলো বলে মনে হয় না। এমন কি, যুদ্ধ শেষে তাঁরা আরও ত্যাগ স্বীকার করতেও তৈরি ছিলেন। কিন্তু '৭২-এর জানুয়ারি থেকে দেশে আইনের শাসন বলতে গেলে লোপ পায়। দারুণ বৃদ্ধি পায় জিনিশপত্রের দামও। এমন কি, রোজকার ব্যবহার্য ভোগ্যপণ্য বাজার থেকে উধাও হতে থাকে। চাল-ডাল-তেল-নুন, কাপড়চোপড়, সাবান, টুথপেস্ট—সবই। দুতিন মাসের মধ্যেই দোকানের তাকগুলো শূন্য হয়ে যায়। তখন আগেকার আমদানি-করা বিদেশী পণ্যের বদলে ভারত থেকে আসে নিকৃষ্ট মানের পণ্য। জিনিশপত্রের দামও বেড়ে যায় অনেক। '৭২ সালের জুন মাসে ধানের দাম হয় ১২০ টাকা। অথচ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে অঙ্গীকার ছিলো ২০ টাকা মণ দরে চাল খাওয়ানোর।

কোনো সরকারই বাজার-দর নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। বাজার-দর নির্ভর করে চাহিদা আর সরবরাহের ওপর। তা সত্ত্বেও বাংলাদেশ সরকার যদ্দুর সম্ভব চেষ্টা করেছিলো বাজার-দর নিয়ন্ত্রণ করতে। বহু ন্যায্য মূল্যের দোকানও খুলেছিলো। তা ছাড়া, মজুদকারীদের বিরুদ্ধে শেখ মুজিব রক্ষী বাহিনীর অভিযান শুরু করেন। কিন্তু এ ছিলো ব্যর্থ চেষ্টা।

বস্তুত, পাচারকারী, চোরাকারবারি এবং মজুদদাররা বিরাট ভূমিকা পালন করেছিলো বাজার নিয়ন্ত্রণে। পাচারকারী আর চোরাকারবারিরা বেপরোয়া পাচার বাণিজ্য আরম্ভ করেছিলো ভারতীয় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে। বাংলাদেশ থেকে খাদ্যদ্রব্য, বিশেষ করে চাল আর পাট যেতো ভারতে; আর ভারত থেকে তার বিনিময়ে আসতো নিম্নমানের পণ্য সামগ্রী। ফলে, ভারতে পাচার করে এরা এক দফা লাভ করতো, আর ভারত থেকে পাচার করে পণ্য এনে দ্বিতীয় দফা লাভ করতো। রফতানির চেয়ে আমদানিতেই হতো বেশি লাভ। যারা পাচারকারী এবং চোরাকারবারি তারা বিবেকহীন ব্যবসায়ী। কিন্তু যা জনগণের কাছে অসহ্য ছিলো, তা হলো এরা অনেকেই এসব ব্যবসা করতো আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য অথবা কোনো স্থানীয় নেতার ছত্রচ্ছায়ায়। '৭২-এর ৬ই এপ্রিল শেখ মুজিব এ রকমের ১৬ জন নির্বাচিত সদস্যকে আওয়ামী লীগ থেকে বহিষ্কার করেন। তিন দিন পরে বহিষ্কার করেন আরও ৭ জনকে। এখানেই শেষ নয়, সেপ্টেম্বর মাসে তিনি বহিষ্কার করেন আরও ১৯ জনকে। বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের কয়েকজন বড়ো কর্তাকেও পদচ্যুত করেন। যেমন, আদমজী জুট মিলের প্রধান প্রশাসক,

বাওয়ানী মিলের প্রধান ব্যবস্থাপক, ওয়াসার চেয়ারম্যান এবং আভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন সংস্থার চেয়ারম্যান। (হাবিবুর, ২০০৮) কিন্তু তিনি যা করেছিলেন, তা ছিলো বড্ডো কম এবং বড্ডো দেরি করে।

তদুপরি, এই কঠোর মনোভাব তিনি আগাগোড়া বজায়ও রাখতে পারেননি; সবার সঙ্গে সমানভাবেও পারেননি। তাই তাঁর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কোনো কোনো স্বজন এবং দলের প্রভাবশালী সদস্য দুর্নীতিতে ব্যাপকভাবে জড়িয়ে পড়েন। তাঁদেরও তিনি বশ করতে পারেননি। বশ করতে পারেননি দলের বিভিন্ন বাহিনীকে। মুজিব বাহিনী, লাল বাহিনী, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী, রক্ষী বাহিনী, ছাত্র লীগ, যুব লীগ—সব কিছুই ধীরে ধীরে তাঁর শাসনের বাইরে চলে যায়। হালুয়া-রুটির লোভে দ্বন্দ্ব শুরু হয় তাঁর বিশ্বস্ত লোকেদের মধ্যেও। এমন কি, ছাত্র লীগ বিভক্ত হয়ে পড়ে। '৭২ সালেই ছাত্র লীগের দুই গোষ্ঠী দুই জায়গাতে সম্মেলন করেছিলো। এ ছিলো ভাগ-বাঁটোয়ারা আর ক্ষমতার লড়াই।

স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টিতে ছাত্রদের অবদান ছিলো অসামান্য। বিশেষ করে '৬৯ থেকে '৭১-এর মার্চ পর্যন্ত ছাত্র লীগ দেশের রাজনীতিকে স্বাধীনতার দিকে এগিয়ে দিয়েছিলো। এমন কি, মুক্তিযুদ্ধেও দলনির্বিশেষে আত্মত্যাগী বহু সাধারণ ছাত্র অংশ নিয়েছিলেন। সমাজের কাছে ছাত্ররা ছিলেন রীতিমতো সম্মানের পাত্র। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর থেকে ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র শাখা—অর্থাৎ ছাত্র লীগের নেতারা ক্ষমতা এবং ভাগ-বাঁটোয়ারার কারবারে জড়িয়ে পড়েন। তাঁরা দলের কর্তাব্যক্তিদের কাছ থেকে পণ্য আমদানি অথবা বন্টনের পারমিট এবং লাইসেন্স আদায় করেন, তাঁদের আনুগত্য এবং কাজের পুরস্কার হিশেবে। এই পারমিট এবং লাইসেন্স দিয়ে তাঁরা যদি নিজেরা ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন, তা হলে বলার তেমন কিছু থাকতো না। কিন্তু তাঁরা এসব পারমিট-লাইসেন্স চড়া দরে বিক্রি করতে আরম্ভ করলেন ব্যবসায়ীদের কাছে। ব্যবসায়ীরা সে টাকা আবার তুলে নিতেন ক্রেতাদের কাছে থেকে। এভাবে পণ্যের দাম বৃদ্ধি পেতো। এই পারমিট এবং লাইসেন্স-ভোগীরা পরিণত হন দলের ক্যাডারে। অথবা বলা যায়, দলের ক্যাডার পরিণত হয় লাইসেন্স-ব্যবসায়ীতে।

এই লাইসেন্স-ব্যবসা এবং ক্ষমতা নিয়েই ছাত্র লীগের ভেতরে একাধিক গোষ্ঠী তৈরি হয়। '৭২ সালের সেপ্টেম্বরে তার জলজ্যান্ত প্রমাণ পাওয়া যায় পল্টন ময়দানে আ স ম আবদুর রবের মুজিব-বিরোধী জনসভা থেকে। এর ফলে জনগণের কাছে দলের অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকাশ পায় এবং ছাত্রদের ভাবমূর্তি ম্লান হয়ে যায়। সেই সঙ্গে সরকারও পড়ে যায় বেকায়দায়। এই পরিস্থিতিতেই '৭২ সালের ডাকসু নির্বাচনে ছাত্র লীগ নয়, জয়ী হয়েছিলো ছাত্র ইউনিয়ন। অথচ দেশকে স্বাধীন করেছিলো মূলত আওয়ামী লীগ। এ থেকে এটাই বোঝা যায় যে, আওয়ামী লীগ ছাত্র সমাজে জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেলছিলো। হারিয়ে ফেলছিলো জনগণের

মধ্যেও। পরের দু বছরে ছাত্র লীগের বিভিন্ন উপদলের মধ্যে অনেকবার মারামারি হয়। অনেক ছাত্রনেতা পেশী ফোলানোর রাজনীতি আরম্ভ করেন। এমন কি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরোধী ছাত্রদের লাইন করে দাঁড় করিয়ে তাঁদের ওপর ব্রাশ ফায়ার করার ঘটনার সঙ্গেও এঁদের কারো কারো যোগাযোগ ছিলো বলে শোনা যায়। অন্তত জনগণ বিষয়টাকে সেভাবেই দেখেছেন।

আওয়ামী লীগের ক্যাডার এ সময়ে বিরোধী দলের ওপরও একাধিক হামলা করেছিলো। যেমন, '৭২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে চট্টগ্রামের লালদিঘি ময়দানে ন্যাপ-কমিউনিস্ট পার্টির সর্বদলীয় সভায় অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিরা বোমা ছুঁড়ে দেয়। এর ফলে আহত হন প্রায় বিশজন। এই অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিরা আওয়ামী লীগের ক্যাডার বলেই মনে করা হয়েছিলো। পরের বছর ৫ই জানুয়ারি ঢাকায় মোজাফ্ফর ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়নের কার্যালয়ে অজ্ঞাতনামা লোকেরা আগুন লাগিয়ে দেয়। ভিয়েতনাম যুদ্ধের প্রতিবাদে '৭৩ সালের পয়লা জানুয়ারি বিরোধী দলের আহ্বানে যে-বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়, তার ওপর পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। দুজন নিহত এবং ছজন আহত হন এই গুলিবর্ষণের ফলে। এই ঘটনা আগেকার ঔপনিবেশিক আমলের স্বৈরশাসনকেই মনে করিয়ে দেয়। পরের দিন সারা দেশের প্রধান শহরগুলোতে ছাত্রহত্যার প্রতিবাদে হরতাল পালিত হয়।

বস্তুত, সরকারের অদক্ষতা এবং ব্যর্থতায় সাধারণ মানুষ এতোই হতাশ বোধ করেন যে, সেই সুযোগ নিয়ে একটি নতুন বিরোধী দল গঠিত হয় '৭২ সালের অক্টোবর মাসে। এই দলের নাম দেওয়া হয়, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল—সংক্ষেপে জাসদ। অনেকে বলেন, এই দল গঠনে গোপনে সাহায্য করেছিলো ভারত। কিন্তু এ কথার মধ্যে সত্যতা আছে কিনা, তা যথার্থভাবে কেউ বিচার করে দেখেননি। অথবা তার কোনো সুনির্দিষ্ট প্রমাণও পাওয়া যায়নি। তবে জাসদ তার সরকার-বিরোধী ভূমিকার জন্যে দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করে। পরের বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ইউনিয়ন—ডাকসুর—যে-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তাতে জাসদের জনপ্রিয়তা লক্ষ করা যায়। এই নির্বাচনে একদিকে ছিলো ছাত্রলীগ এবং ছাত্র ইউনিয়ন; অন্যদিকে জাসদ-পন্থী ছাত্ররা। কিন্তু ভোট গণনার সময়ে দেখা যায় যে, জাসদ এগিয়ে যাচ্ছে বিপুল ভোটে। তাই দেখে ছাত্রলীগের নেতারা ব্যালট বাক্সো ছিনতাই করে পুড়িয়ে দেন। (মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, সাক্ষাৎকার, ২৮. ৯. ২০০৯) এই পেশী ফোলানোর রাজনীতিকে সাধারণ মানুষ ভালো চোখে দেখেননি।

অভাব এবং অব্যবস্থাপনার ফলে আর-একটা শ্রেণীর মধ্যে '৭২ সালেই বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিলো—এঁরা হলেন শ্রমিক গোষ্ঠী। স্বাধীনতা লাভের মাস তিনেকের মধ্যে খালিশপুরে শ্রমিকদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। এ সংঘর্ষ এমন তীব্র রূপ নেয় যে, সেখানে সান্ধ্য আইন জারি করতে হয়। মাদারীপুরেও সান্ধ্য আইন

জারি করতে হয় মার্চের শেষ দিকে। এপ্রিল মাসে গোড়ার দিকে ধর্মঘট করেন ঢাকার বিদ্যুৎ শ্রমিকরা। টঙ্গীতেও শ্রমিকদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। সচকিত হয়ে সরকার কদিন পরে বিনা নোটিসে ঘেরাও, ধর্মঘট ইত্যাদি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। তা সত্ত্বেও মে মাসে টঙ্গীতে এবং বহু রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানে, জুন-জুলাই মাসে আদমজীতে, জুলাই মাসে আবার টঙ্গীতে, অগস্ট-সেপ্টেম্বরে দুবার করে আদমজীতে, ঢাকায় সিনেমা শ্রমিকদের মধ্যে এবং নভেম্বরে মঙ্গলা বন্দরে শ্রমিকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। আদমজীতে একবার একনাগাড়ে ষোলো দিন কার্ফিউ বলবত রাখতে হয়।

মুজিবকে এক সময়ে বাংলার মানুষ প্রায় দেবতার মতো গণ্য করতেন। প্রত্যাশা করতেন যে, তিনি অসাধ্য সাধন করতে পারবেন। কিন্তু বাস্তবে তিনি তাঁদের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেননি। কেউই পারতেন না। সাধারণ মানুষ অবশ্য তাঁর ব্যর্থতার কারণগুলো বিবেচনা করেননি। আন্তর্জাতিক কূটনীতির কথা ভাবেননি। খরা আর বন্যার কথাও ভুলে গেছেন। তাঁর ব্যর্থতাকেই তাঁরা বড়ো করে দেখেছেন। এ কথায়, জনগণের কাছে তাঁর ভাবমূর্তি মলিন হয়ে যায়। মুজিব তাঁদের বিশ্বাস এবং ভালোবাসা হারাতে আরম্ভ করেন। আসলে, ঈশ্বর ততোক্ষণই থাকেন, যতোদিন তাঁর পূজারী থাকে। ভক্ত না থাকলে ঈশ্বরেরও কোনো অস্তিত্ব থাকে না। মুজিবও জনগণের চোখে দেবতার আসন থেকে ধীরে ধীরে সরে যেতে থাকেন।

চিরদিন তিনি জনগণের মুখোমুখি এবং জনগণের ভেতরে থেকে রাজনীতি করেছেন। কিন্তু এ সময়ে জনগণ থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। ব্যর্থ হন জনগণের নাড়ীর গতি অনুভব করতে। তিনি ভুল করে নির্ভর করতে থাকেন 'কাল্ট' তৈরির ওপর। তখন ভালোবাসা নয়, 'মুজিববাদ', মুজিব বাহিনী, লাল বাহিনী, রক্ষী বাহিনী, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী, আওয়ামী যুব লীগ ইত্যাদির জোড়াতালি দিয়ে তিনি তাঁর ইমেজ টিকিয়ে রাখতে চান। যেমন, শিল্প কারখানাগুলোতে শ্রমিকরা যখন ধর্মঘট করতে আরম্ভ করেন, তখন তাঁদের সমস্যার সমাধান না-করে, তিনি তাঁদের বাগে আনতে চেষ্টা করেন লাল বাহিনী দিয়ে। আসলে, তখনও তিনি রবীন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত কথাটি উপলব্ধি করতে পারেননি—'গায়ের জোরে গুরু হওয়া যায় না। যে-মানুষ গৌরব পায়, সেই গুরু হয়।' জাতির পিতার প্রতি তাঁর ভক্ত জনগণের শ্রদ্ধা এবং আস্থা যে লোপ পাচ্ছিলো, মোশায়েব পরিবেষ্টিত অবস্থায় তিনি তা অনুভব করতে পারছিলেন না।

মুজিবের দুর্ভাগ্য, কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদনও তাঁর আমলে ব্যাহত হয়েছিলো। কেবল কৃষি সরঞ্জাম এবং সারের অভাব তার কারণ নয়। তার থেকেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিলো খরা এবং বন্যা। যেমন, '৭২ সালের ভয়াবহ খরায় আউস ধানের ব্যাপক ক্ষতি হয়। '৭২-এর জুন মাসে সিলেটে,

জুলাই-অগস্ট মাসে সিরাজগঞ্জে, তারপর চাঁদপুরে ব্যাপক বন্যা হয়। এপ্রিলে ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ ও ঢাকায় এবং জুন মাসে লাকসামে প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ে কেবল মানুষ এবং গবাদি পশুর ক্ষতি হয়নি, সেই সঙ্গে প্রচুর ক্ষতি হয়েছিলো ফসলের। '৭৩ সালেও প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটে। এ বছরের ডিসেম্বরে বরিশাল, পটুয়াখালী এবং খুলনা জেলায় উপকূলীয় জলোচ্ছ্বাসে ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগ সবচেয়ে প্রবল হয়ে দেখা দেয় '৭৪ সালে। এ বছরের আগস্টে যে-অসাধারণ বন্যা হয়, তাতে তলিয়ে যায় দেশের এক-তৃতীয়াংশ জায়গা। এর ফলে প্রায় এক কোটি টন ফসল নষ্ট হয়ে যায়। তা ছাড়া, ভুক্তভোগী তিন কোটি লোকের মধ্যে বহু লোক প্রাণ হারান। এমন কি, অসংখ্য গবাদি পশুও মরে যায়। (মওদুদ, ১৯৮৭)

মোট কথা, স্বাধীনতার পর থেকেই কৃষি উৎপাদন বারবার খুব ব্যাহত হয়। প্রতিবারেই যতো খাদ্যশস্য উৎপাদিত হবে বলে সরকার হিশেব করে, তার থেকে বহু লাখ টন কম উৎপাদিত হয়। বাংলাদেশকে বিভিন্ন দেশ খাদ্যশস্য দান করেছিলো ঠিকই, কিন্তু তা দিয়ে মানুষকে দু বেলা খাওয়ানো যায়নি।

বস্তুত, '৭২ সাল থেকেই দুর্ভিক্ষ হতে পারে বলে অনেকে আশঙ্কা করেন। মওলানা ভাসানী জনসভায় এ বিষয়ে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। ভুখা মিছিলও করেছিলেন। '৭৩ সাল থেকে অনেক 'মধ্যবিত্ত'ও দু বেলা ভাত খাওয়ার বিলাসিতা ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। আর গ্রামের সাধারণ মানুষ এবং কৃষক-শ্রমিকদের তো কথাই নেই। শেষ পর্যন্ত '৭৪ সালের অগস্ট-সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে দেখা দেয় এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। ১৯৪৩ সালের পর এমন ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ বাংলায় আর কখনো হয়নি। জাতিসংঘের আহ্বানে অনেক দেশই এগিয়ে আসে খাদ্য সাহায্য নিয়ে, কিন্তু সে সাহায্য পর্যাপ্ত ছিলো না। অথবা তা ঠিক সময়ে এসে পৌঁছেনি। এর মধ্যে আবার বাংলাদেশকে 'শিক্ষা দেওয়ার জন্যে' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রতিশ্রুত সাহায্য ইচ্ছে করে দেরিতে পাঠায়। যে-জাহাজ দুটি এই শস্য নিয়ে আসছিলো, দুর্ভিক্ষ একেবারে দোরের গোড়ায় দেখতে পেয়ে, মার্কিন সরকার তা অন্যদিকে পাঠিয়ে দেয়। এর কারণ, বাংলাদেশ কিছু পণ্য রফতানি করেছিলো কিউবার কাছে, এবং কিউবার কাছ থেকেও কিছু পণ্য আমদানি করেছিলো। শত্রুর সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে দেখে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে এই শিক্ষা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো।

এ ছাড়া, মজুদকারীরাও দুর্ভিক্ষের জন্যে কম দায়ী ছিলো না। অনেকে বাজারে যথাসময়ে চাল ছাড়েনি। অনেকে নুনের দাম বাড়িয়ে দিয়েছিলো। অনেকে অভাব সৃষ্টি করেছিলো মরিচের। নিচের তালিকা থেকে দেখা যাবে দেশে কিভাবে খাদ্যদ্রব্যের দাম হু হু করে বাড়ছিলো। কিন্তু চোরাকারবারি, পাচারকারী, মজুদদার, দুর্নীতিবাজ কর্মচারী, পারমিট-ব্যবসায়ী ছাড়া সাধারণ মানুষের আয়

বাড়ছিলো না। বরং অনেকের সাজানো ব্যবসা এবং কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায়, আয় আগের তুলনায় কমে যায়।

জিনিশপত্রের দাম বৃদ্ধির তালিকা		
পণ্য	৭১-৭২ সালে	৭৪-৭৫ সালে
চাল	৫৭.১০ টাকা	২৪৪.৪০ টাকা
ডাল	১.৬২ টাকা	৪.৭৫ টাকা
আলু	০.৯৫ টাকা	২.৬২ টাকা
সর্ষের তেল	৬.৮৭ টাকা	৩১.১৭ টাকা
মরিচ	৫.২৩ টাকা	৪৬.৬৬ টাকা
লবণ	০.৪৭ টাকা	৩.৮৩ টাকা
পিঁয়াজ	০.৭৮ টাকা	২.৫৭ টাকা

উৎস : *বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষপত্র* (মওদুদ থেকে উদ্ধৃত)

পরিসংখ্যান বর্ষপত্রে যে সর্বত্র সঠিক দাম লেখা হয়েছে, তাও নয়। হাবিবুর রহমান সংবাদপত্রে ওপর ভিত্তি করে লিখেছেন যে, ’৭৪ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর ঢাকার দ্রব্যমূল্য খানিকটা নিম্নগামী ছিলো এবং চালের সের ছিলো ৭ টাকা। তার অর্থ দাম কমে চালের দাম এ সময় দাঁড়ায় মণ প্রতি ২৮০ টাকায়। (হাবিবুর, ২০০৮) আমাদের অভিজ্ঞতায় ৩০০ টাকায়।

দুর্ভিক্ষ হতে পারে, এ হুঁশিয়ারি জাতিসংঘ থেকে আগেই দিয়েছিলো। আগের বছরই জাতিসংঘের মহাসচিব বাংলাদেশকে খাদ্য সাহায্য দেওয়ার জন্যে ৮৬টি সদস্য-দেশের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার এই দুর্ভিক্ষের জন্যে কতোটা প্রস্তুতি নিয়েছিলো, তা সন্দেহের বিষয়। বাজারদরের অনুরূপ দাম দিয়ে সরকার চাষীদের কাছ থেকে চাল সংগ্রহ করেনি। কিন্তু একবার যখন দুর্ভিক্ষ শুরু হয়ে যায়, তখন ৫,৮৬২টি লঙ্গরখানা খুলে সরকার লাখ লাখ লোককে খেতে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলো। অবশ্য তা দিয়ে হাজার হাজার লোকের মৃত্যু ঠেকানো যায়নি। ২২শে নভেম্বর খাদ্যমন্ত্রী জাতীয় সংসদে যে-বিবৃতি দেন, তা থেকে জানা যায় যে, ততোদিনে সাড়ে সাতাশ হাজার লোক অনাহারে মারা গিয়েছিলেন। অপর পক্ষে, বেসরকারী হিশেবে মৃতদের সংখ্যা ছিলো এক লাখেরও বেশি। তবে ’৪৩-এর দুর্ভিক্ষ যেমন মূলত মানুষের সৃষ্টি বলে মনে করা হয়, তেমনি ’৭৪-এর দুর্ভিক্ষও ছিলো অংশত মানুষের সৃষ্টি। সত্যি সত্যি ’৭৪ সালে যে-ধরনের বণ্টন পদ্ধতি এবং বৈদেশিক সাহায্যের ব্যবস্থা ছিলো, তাতে এতো ব্যাপক হারে মৃত্যুর কোনো কারণ ছিলো না। মনে হয়, এর জন্যে সরকারী অদক্ষতা এবং অদূরদর্শিতাই দায়ী ছিলো।

দেশের অর্থনৈতিক সংকট এবং ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ মুজিব শাসনের একটা বিরাট কলঙ্ক। জনগণের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ছিলো আন্তরিক, চিরদিন রাজনীতিও

করেছেন জনগণকে নিয়েই। কিন্তু অর্থনৈতিক সংকট, দুর্নীতি এবং দলীয় কোন্দলের ফলে তিনি জনগণ থেকে ক্রমাগত দূরে সরে যান। যে-জনগণকে তিনি অমন করে উদ্বুদ্ধ করতে পারতেন, সেই মুজিব তাঁদের সামনে হাজির হওয়ার মুখও হারিয়ে ফেলেছিলেন। (কামাল হোসেনের সাক্ষাৎকার, ১৮. ৯. ২০০৯) ১৯৭৪-এর জুলাই মাস থেকে '৭৫-এর ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে তিনি কোনো জনসভায় ভাষণ পর্যন্ত দেননি।

আরও একটা কারণে মুজিবের প্রতি জনগণ আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলেন, সে হলো: আইন-শৃঙ্খলার অভাব এবং জানমালের নিরাপত্তাহীনতা। পাকিস্তানী আমলে ঔপনিবেশিক শোষণ ছিলো ঠিকই, কিন্তু এক ধরনের আইনের শাসনও, অন্তত সাধারণ মানুষের পর্যায়ে, বহাল ছিলো। অপর পক্ষে, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর একদিকে আইনের প্রতি এক শ্রেণীর লোকেদের শ্রদ্ধা চলে যায়; অন্যদিকে আইন বলবত করার ব্যবস্থাও দুর্বল হয়ে যায়। যুদ্ধের ফলে পুলিশ বাহিনীর বহু সদস্য নিহত হয়েছিলেন। থানা-পুলিশ ইত্যাদি নতুন করে সংগঠন করা সহজ ছিলো না। তা ছাড়া, আগের তুলনায় পুলিশের ওপর রাজনৈতিক হস্তক্ষেপও এ সময়ে বৃদ্ধি পায়। অনেক ক্ষেত্রেই ক্ষমতাসীন দলের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের চাপে পুলিশের পক্ষে স্বাধীনভাবে কাজ করার পরিবেশ নষ্ট হয়। দুর্নীতিও বৃদ্ধি পায় পুলিশদের মধ্যে। তাঁদের যে-বেতন দেওয়া হতো, জিনিশপত্রের ক্রমবর্ধমান দামের মুখে তা নিতান্ত নগণ্য বলে বিবেচিত হয়। এই দুর্বল পুলিশ বাহিনীর ওপর অস্ত্রধারীরা বহু জায়গায় সশস্ত্র হামলাও চালায়। '৭৩ সালের জুন থেকে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় কমপক্ষে ৪৪টি পুলিশ ফাঁড়ি ও থানা লুটের ঘটনা ঘটে। (হাবিবুর, ২০০৮) থানার নিরাপত্তা বাড়ানোর জন্যে এ সময় পুলিশ আর যথেষ্ট বলে বিবেচিত হয়নি, তাই সেপ্টেম্বর মাসে দেড় শো থানায় রক্ষী বাহিনী মোতায়েন করা হয়।

রক্ষী বাহিনী মুজিব গড়ে তুলেছিলেন '৭২ সালেই। এতে ঠাঁই পেয়েছিলেন আট হাজার মুক্তিযোদ্ধা। কিন্তু এরা সবাই সত্যিকার মুক্তিযোদ্ধা কিনা, তা জানা যায় না। অথবা জানা যায় না, বিভিন্ন ধরনের নিরাপত্তা কর্মী থাকা সত্ত্বেও এ বাহিনী কেন গড়ে তোলা হয়েছিলো। কিন্তু জাতির পিতা এই বাহিনীকে বিশেষ করে কাজে লাগিয়েছিলেন তাঁর প্রাইভেট আর্মি হিশেবে। এই বাহিনীর কোনো আচরণ-বিধি ছিলো না। সম্ভবত মুজিব ছাড়া আর কারো কাছে এর কোনো জবাবদিহিতাও ছিলো না। ভালো কাজ এ বাহিনী হয়তো কিছু করেছিলো, কিন্তু এর দুর্নাম হয় স্বেচ্ছাচারী নির্যাতনকারী বাহিনী হিশেবে। শহর এবং গ্রামের লোকেরা আতঙ্কিত থাকতো এই বাহিনীর নামে। সেনাবাহিনী একে আবার দেখতো তাদের প্রতিপক্ষ হিশেবে। মোট কথা, রক্ষী বাহিনী গঠন করে যতোটা লাভ হয়েছিলো, বদনাম হয়েছিলো তার চেয়ে অনেক বেশি। তদুপরি, এই

বাহিনীর মধ্যে কোনো স্বচ্ছতা না-থাকায় অনেক ভুল বোঝাবুঝিও তৈরি হয়েছিলো। এই বাহিনীর হাতেই '৭৫ সালের জানুয়ারি মাসে বিনা বিচারে নিহত হয়েছিলেন কট্টরপন্থী বামপন্থী নেতা, সিরাজ সিকদার। এই হত্যার আগে পর্যন্ত আইন-বহির্ভূত সরকারী হত্যার ঘটনা হয়তো দু-একটা ঘটেছিলো, কিন্তু সেসব হত্যার ঘটনা খবর তৈরি করেনি। সিরাজ সিকদারের হত্যা দেশে রীতিমতো প্রধান খবরে পরিণত হয়েছিলো। পরবর্তী কালের জন্যেও এটা একটা খারাপ দৃষ্টান্ত হিশেবে কাজ করেছিলো।

আলোচ্য সময়ে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির কী রকম অবনতি হয়েছিলো, তা বোঝা যায় কয়েকটি তথ্য থেকে। যেমন, '৭৪ সালের পয়লা ফেব্রুয়ারি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান যে, ১৯৭৩ সালে সহিংসতায় ১৮৯৬ জন লোকের প্রাণহানি ঘটেছিলো। এ সম্পর্কে বেসরকারী অনুমান এবং ধারণা আরও বেশি। সাধারণ মানুষ, শ্রমিক, দলীয় ক্যাডার—এসবের মধ্যে তো সহিংসতা ছিলোই; এমন কি, সরকারী বাহিনীর মধ্যেও উচ্ছৃঙ্খলা দেখা দেয়। '৭২-এর ফেব্রুয়ারি মাসে যেমন পিলখানায় ইপিআর এবং গণবাহিনীর মধ্যে গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটে। এতে বেশ কয়েকজন আহত হন—মেজর নুরুজ্জামান-সহ। এপ্রিল মাসে দিনাজপুরে মারমুখী জনতার ওপর বাংলাদেশ বাহিনী গুলি বর্ষণ করে। ফলে ৮ জন নিহত এবং ১০ জন আহত হন। এক কথায় বলা যায়, যুদ্ধের পর থেকে মানুষের মধ্যে ব্যাপকভাবে দেখা দেয় আইন হাতে তুলে নেওয়ার মনোভাব এবং শৃঙ্খলার অভাবে।

এই অরাজকতার মধ্যে সাধারণ মানুষের জীবনের নিরাপত্তা তো ছিলোই না, এমন কি, প্রভাবশালী লোকেরাও নিরাপদ ছিলেন না। যেমন, '৭২ থেকে '৭৫ সালের মধ্যে আওয়ামী লীগের বেশ কয়েকজন সংসদ-সদস্য এবং প্রভাবশালী স্থানীয় নেতা নিহত হয়েছিলেন গুলির আঘাতে। তদুপরি, সহিংসতা দেখে এবং তার খবরাখবর ও গুজব শুনে, সাধারণ মানুষের মনে তার চেয়েও বেশি সহিংসতার ধারণা জন্মেছিলো। তাঁদের মনে নিরাপত্তাহীনতার ধারণাও জোরদার হয়েছিলো। এই মনোভাব সরকারের প্রতি জনগণের আস্থা রচনায় সহায়তা করেনি, বলাই বাহুল্য।

নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার এবং সহিংসতা দেখা দেওয়ার অনেক কারণ ছিলো। তার মধ্যে একটা হলো সহজলভ্য অস্ত্রশস্ত্র। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে ভারত মুক্তিযোদ্ধাদের দেড় লাখ অস্ত্রশস্ত্র দিয়েছিলো। তা ছাড়া, পাকিস্তানীদের কাছ থেকেও উদ্ধার হয়েছিলো অসংখ্য অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলাবারুদ। মোট সাড়ে তিন লাখ অস্ত্রশস্ত্র লোকেদের হাতে বেআইনিভাবে এসেছিলো। '৭২ সালের প্রথম দিকেই দশ দিনের মধ্যে অস্ত্রশস্ত্র আত্মসমর্পণের ডাক দিয়েছিলেন মুজিব। তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে অনেকে অস্ত্রশস্ত্র জমাও দিয়েছিলেন। যেমন, কাদের সিদ্দিকী

আনুষ্ঠানিকভাবে তিরিশ হাজার অস্ত্রশস্ত্র সমর্পণ করেছিলেন। যদিও তাঁর বাহিনীর কাছে এক লাখ অস্ত্রশস্ত্র ছিলো বলে মনে করা হয়। (অ্যান্টনি, ১৯৮৬) মুজিব বাহিনীও দিয়েছিলো। কিন্তু মুজিবের প্রতি ব্যক্তিগত আনুগত্য সত্ত্বেও মুজিব বাহিনীর প্রতিটি যোদ্ধা প্রতিটি অস্ত্র ফেরত দিয়েছিলো বলে মনে হয় না। আর যাঁরা গ্রাম-গঞ্জ থেকে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন, তাঁরা অনেকেই দুর্দিনের সম্বল হতে পারে—এই বিবেচনায় নিজের অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলাবারুদ লুকিয়ে রেখে দিয়েছিলেন। রাজাকারেরাও তাদের অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে রেখেছিলো।

ভারতে ট্রেনিং-পাওয়া এবং আঞ্চলিক বাহিনীর কাছে ট্রেনিং পাওয়া মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা তিন লাখের বেশি ছিলো না। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার মুক্তিযোদ্ধার সার্টিফিকেট দিয়েছিলো এগারো লাখ লোককে। তার মানে, আট লাখই ছিলো ভুয়ো মুক্তিযোদ্ধা। (অ্যান্টনি, ১৯৮৬) মুক্তিযোদ্ধাদের নির্বাচিত আট হাজার সদস্য রক্ষী বাহিনী এবং কিছু 'লাল বাহিনী'র সদস্যও হয়েছিলো। পুলিশ এবং আনসার বাহিনীতেও অনেকের জায়গা হয়। কিন্তু বাকি ভুয়ো এবং খাঁটি মুক্তিযোদ্ধাদের অনেকে ডাকাত ও ছিনতাইকারীতে পরিণত হয়। দেশের সীমিত সংখ্যক পুলিশ বাহিনীর পক্ষে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেওয়া সম্ভব ছিলো না।

তীব্র আর্থিক অনটনের মধ্যে পুলিশ কেন, বিচারকদের পক্ষেও সৎ থাকা সম্ভব ছিলো না। সত্যিকার অর্থে, আইন বলবত করার কোনো যোগ্য এবং নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠানই ছিলো না। সরকারের হস্তক্ষেপ এ ব্যাপারে একটা খুব নেতিবাচক ভূমিকা পালন করে। তা ছাড়া, সমাজের পরতে পরতে দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়েছিলো। রাজনীতিকরা যদি দুর্নীতির আশ্রয় নিতে পারেন, তবে অন্যরা নয় কেন? এমন কি, বিদেশে যে-কূটনীতিকরা ছিলেন বাংলাদেশের জন্যে কোনো জিনিশ কিনলে তাঁরা সরাসরি শতকরা পাঁচ ভাগ 'কমিশন' নিতেন বলে দাবি করেছেন ম্যাসকারেনহ্যাস। (১৯৮৬) শেখ মুজিবের ক্ষমতার লোভ ছিলো, অন্যদের কাছে পূজনীয় হওয়ারও লোভ ছিলো। কার না থাকে? কিন্তু টাকাপয়সার প্রতি তাঁর কোনো লোভ ছিলো বলে জানা যায় না। তাঁকে হত্যা করার পর তাঁর বাড়ি তল্লাশি করে যেসব মূল্যবান জিনিশপত্র পাওয়া যায়, তার দাম ছিলো মাত্র সাত লাখ টাকার কিছু বেশি।

অপর পক্ষে, তিনি নিজে সৎ থাকলেও, দুর্নীতিবাজরা তাঁকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছিলো। এদের মধ্যে তাঁর কোনো কোনো আত্মীয়, স্বজন এবং দলীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিদেরও অন্তর্ভুক্ত করা যায়। তাজউদ্দীন অথবা নজরুল ইসলামের মতো ব্যতিক্রম অবশ্যই ছিলেন। সেরনিয়াবাতও ব্যক্তিগতভাবে সৎ ছিলেন বলে শোনা যায়। কিন্তু সুযোগ থাকলে সংসদ-সদস্য, স্থানীয় নেতা এবং সচিবালয়ের সর্বোচ্চ কর্মকর্তা থেকে আরম্ভ করে গ্রামের চৌকিদার পর্যন্ত সবাই কমবেশি

দুর্নীতির আশ্রয় নিতেন। দরিদ্রদের দুর্নীতির আশ্রয় নেওয়ার কারণ আর্থিক অনটন এবং আইনের শাসনের অভাব। কিন্তু প্রভাবশালী ব্যক্তিরা দুর্নীতি করতেন লোভের বশবর্তী হয়ে।

ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের মিত্রতাও জটিলতা সৃষ্টি করেছিলো। বাংলাদেশের বেশির ভাগ লোকের কাছে ভারত আর হিন্দু ছিলো একই অর্থবোধক। হিন্দুদের প্রতি বাঙালি মুসলমানের অবিশ্বাস এবং ঘৃণা দীর্ঘকালের। পঞ্চাশ এবং ষাটের দশকে যখন পশ্চিম পাকিস্তানী মুসলমানদের সঙ্গে বাঙালি মুসলমানদের বিরোধ শুরু হয়, তখন কিছু কালের জন্যে হিন্দুদের চেয়ে পশ্চিমা মুসলমানরাই তাঁদের বড়ো শত্রুতে পরিণত হন। এই পরিবেশে হিন্দুদের প্রতি ঘৃণা এবং অবিশ্বাস হ্রাস পেয়েছিলো মাত্র, কিন্তু তা সত্যি সত্যি লোপ পায়নি। বাঙালি জাতীয়তাবাদ ছিলো আঞ্চলিক এবং ভাষাভিত্তিক—ধর্মভিত্তিক নয়। তাই পশ্চিমা শোষণ এবং শাসনের মুখে বাঙালি মুসলমানরা কিছু কালের জন্যে সবচেয়ে বড়ো শত্রু হিশেবে হিন্দুদের গণ্য করেননি। বরং হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এক ধরনের প্রীতির সম্পর্ক তৈরি হয়েছিলো। পশ্চিম বাংলা এবং ভারতের প্রতিও মনোভাবের পরিবর্তন দেখা দিয়েছিলো। নয়তো, হিন্দু-মুসলমান—উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই অবিশ্বাস এবং বিদ্বেষ অস্থিমজ্জায় মিশে ছিলো।

'৭২ সালে ক্রমবর্ধমান আর্থিক সংকটের কালে আবার সেই সাম্প্রদায়িক মনোভাবই ভারত-ভীতি এবং ভারতঘৃণার চেহারা নেয়। কারণ, সাধারণ মানুষ সমস্ত অভাব-অনটন এবং দুর্গতির জন্যে মনে মনে ভারতকেই দায়ী করেছিলেন। ভারতের প্রতি আওয়ামী লীগের আনুগত্য থাকায়, আওয়ামী লীগও দোষী সাব্যস্ত হয়। তা ছাড়া, আওয়ামী লীগের ব্যর্থতাকেও ভারতের দোষ বলে গণ্য করা হয়। ফলে মুসলমানরা তাঁদের মুসলিম পরিচয়কে বেশ জাহির করেই প্রচার করতে আরম্ভ করেন। হতাশ লোকজন বলতে আরম্ভ করেন 'পাকিস্তানের আমলেই ভালো ছিলাম।'

ভারতের প্রতি সাধারণ মানুষের বিদ্বেষের অনেক কারণ ছিলো। তার মধ্যে একটা হলো: অনেকেই মনে করতেন যে, বাংলাদেশকে ভারত তাদের একটা রাজ্যে পরিণত করবে। বাংলাদেশের অভাব-অভিযোগের কারণ হিশেবে মনে করতেন বাংলাদেশ থেকে ভারতে সম্পদ পাচার হয়ে যাওয়াকে। পাকিস্তানের ফেলে-যাওয়া অস্ত্রশস্ত্র যে ভারত নিয়ে গিয়েছিলো, তা বিশেষ করে চোখে পড়েছিলো সাধারণ মানুষের। বাংলাদেশের চাল আর পাট সত্যি সত্যি বিপুল পরিমাণে পাচার হচ্ছিলো ভারতে। এই পাচারকারীরা ছিলো বাংলাদেশের অসৎ ব্যবসায়ী, ভারতীয় নয়। কিন্তু সাধারণ মানুষ এর জন্যে দোষারোপ করে ভারতকে। ভারত থেকে যে-নিম্নমানের ভোগ্যপণ্য পাচার হয়ে আসতো, তার জন্যেও ভারতকে দায়ী করেন অনেকে। বাংলাদেশকে ভারত নিজের রাজ্যে

পরিণত করবে—এমনটা কোনো বিচক্ষণ ব্যক্তি মনে করবেন বলে মনে হয় না। কিন্তু বাংলাদেশের সঙ্গে ভারত 'বড়োভাই সুলভ' আচরণ করেছিলো—এতে সন্দেহ নেই। এও সাধারণ মানুষের মনে এই ধারণা তৈরিতে সাহায্য করেছিলো।

বাংলাদেশের যেসব ধনী এবং মধ্যবিত্ত লোকেরা পঞ্চাশ এবং ষাটের দশকে হিন্দুদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি দখল করেছিলেন, তাঁরাও স্বাধীনতা লাভের পর খানিকটা ভয় পেয়েছিলেন। কারণ, তাঁদের অনেকের মনে আশঙ্কা দেখা দিয়েছিলো যে, এসব জমি অথবা বাড়ির মালিকরা হয়তো ভারত থেকে এসে আবার তাঁদের সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি জানাতে পারেন।

মোট কথা, ভারত-ভীতির বাস্তব ভিত্তি ছিলো কিনা, তা গুরুত্বপূর্ণ নয়। বরং জনগণ কী ভেবেছিলেন, সেটাই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, শেষ পর্যন্ত জনপ্রিয়তা জিনিশটা পরিসংখ্যানের ওপর নির্ভর করে না, তা নির্ভর করে 'পার্সেপশন' অথবা বিষয়টাকে জনগণ কিভাবে দেখছেন, তার ওপর। এই দৃষ্টিভঙ্গি বেশির ভাগ সময়ই বাস্তবভিত্তিক হয় না, বরং হয় ধারণা থেকে।

ভারত-ভীতির পাশাপাশি উপমহাদেশ থেকে অনেক দূরে আরও একটা ঘটনা ঘটে, যা বাংলাদেশে দ্রুত সাম্প্রদায়িকতা জন্ম দিতে সাহায্য করেছিলো। সে হলো : ১৯৭৩ সালে ইসরায়েলের সঙ্গে আরব দেশগুলোর যুদ্ধ। এই যুদ্ধের পর পেট্রোল উৎপাদনকারী আরব দেশগুলো পেট্রোলের দাম হঠাৎ বহু গুণ বাড়িয়ে দেয়। এর ফলে দেখা দেয়, যাকে বলা হয় পেট্রো-ডলারের উত্থান। গরিব আরব দেশগুলো রাতারাতি ধনী হয়ে উঠলো। সেই অর্থ দিয়ে লিবিয়া, সৌদী আরব, কুয়েত, ইরান ইত্যাদি দেশ ধর্মীয় সাম্রাজ্যবাদ প্রচার করার সিদ্ধান্ত নিলো। মুসলমান-প্রধান দেশগুলোতে কাজটা বেশি কঠিনও ছিলো না। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো তবলিগের নাম করে কোটি কোটি ডলার ব্যয় করতে আরম্ভ করে। যাঁরা খাঁটি ইসলাম ধর্মের প্রচারক সাজলেন, তাঁদের অনেকেই দুই তরফা লাভের সম্ভাবনা দেখলেন। নগদে পেট্রো-ডলারের ছিটেফোঁটা ভাগ পাওয়ার, আর আখেরাতে আরও বেশি লোভনীয় প্রাপ্তির। ফলে ভারত তথা হিন্দু-বিরোধী মনোভাবের উর্বর জমিতে তবলিগের বাম্পার ফসল ফললো। আওয়ামী লীগকে সমর্থন না-করে অনেকে বরং রাজাকার, আল-বদর পরিপূর্ণ ইসলামী দলগুলোকে সমর্থন করে ইহকাল-পরকাল উভয়ের উন্নতি কামনা করলেন।

অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তার অভাব এবং সাম্প্রদায়িকতার উত্থানের মুখে জনগণ আওয়ামী লীগের ওপর হতাশ হতে থাকেন। এমন কি, হতাশ হতে থাকেন বঙ্গবন্ধুর প্রতি—যাঁকে এক সময় তাঁরা পূজনীয় ব্যক্তি হিশেবে বিবেচনা করতেন। মনে করতেন কল্পতরুর মতো। যিনি সব কিছু দিতে পারবেন। অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারবেন যিনি। কিন্তু সংকট ঘনীভূত হতে থাকায় জনগণের চোখের মণি সেই বঙ্গবন্ধু জনপ্রিয়তা হারাতে আরম্ভ করেন।

জনপ্রিয়তার ঘাটতি পূরণের জন্যে বঙ্গবন্ধু তখন নানা উপায় ঠাওরাতে আরম্ভ করেন। যেমন, শ্রমিকদের আন্দোলন দমন করার জন্যে গঠন করেন 'লাল বাহিনী'। কারা এর সদস্য ছিলো সঠিক জানা যায় না। তবে অনেকেই ছিলো মুজিব বাহিনীর লোক। '৭২-এর মার্চ মাসে খুলনায় এই লাল বাহিনী শ্রমিকদের আন্দোলন বন্ধ করতে গিয়ে রীতিমতো তাণ্ডব ঘটায়। তাদের গুলিতে সরকারী হিশেব মতো নিহত হন ৩৬ জন শ্রমিক, আহত হন ৮০ জন। কিন্তু বেসরকারী হিশেবে নিহত হয়েছিলেন দু হাজারের বেশি। (অ্যান্টনি, ১৯৮৬) যে-মুজিবকে জনগণ ভালোবাসতেন আন্তরিকভাবে, যাঁর আহ্বানে সবাই যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, সেই মুজিবই '৭২ সালের ডিসেম্বরে বিরাট জনসভায় 'লাল বাহিনী দাবড়ে দেওয়ার' ভয় দেখান জনগণকে। লাল বাহিনী ছিলো তাঁর নিজস্ব প্যারামিলিশিয়া। এ জাতীয় বাহিনী কেবল স্বৈরাচারই পুষ্ট করতে পারে, কোনো গঠনমূলক কাজে লাগে না।

রক্ষী বাহিনীও একই ভূমিকা পালন করেছিলো। তারা দেশে প্রভূত নির্যাতন চালিয়েছিলো দোষী এবং নির্দোষ—অনেকের ওপর। একে মনে করা হতো মুজিবের নিজস্ব বাহিনী বলে—যেমন এক সময়ে ছিলো হিটলারের গেস্টাপো বাহিনী। এই বাহিনী দেশের সত্যিকার কোনো উপকারে লাগেনি, বরং জনপ্রিয়তা হারাতে মুজিবকে দারুণ সাহায্য করেছিলো। রাষ্ট্রীয় অর্থের অপচয় হয়েছিলো; জনগণ অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন; এবং সেনাবাহিনী একে দেখেছিলো তাদের প্রতিপক্ষ হিশেবে। মুজিব যখন জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত ভালোবাসা হারিয়ে ফেলেন, তখন চোখ রাঙিয়ে তিনি তাঁদের ভালোবাসা আদায় করতে চেয়েছিলেন।

মুজিব সরকার আর-একটা ভুল করেছিলো, দালালদের ব্যাপারে। পাকিস্তানের প্রতি দালালদের ভালোবাসা এবং পাকিস্তানী আদর্শের প্রতি আস্থা ছিলো, সেটা কোনো অপরাধ নয়। কিন্তু শান্তি কমিটি, আল-বদর ও আল-শামস এবং রাজাকার বাহিনীর সদস্য হিশেবে তারা পাকবাহিনীকে তথ্য দিতো, পথ দেখাতো। এ দিয়েই পাকসেনারা সাধারণ মানুষের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছিলো। বাগেরহাট এলাকায় রাজাকারদের সম্পর্কে খুব বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় স্বরোচিষ সরকারের গ্রন্থ্ থেকে। এ থেকে পরিষ্কার দেখা যায় যে, সেনাবাহিনী শহরে তাণ্ডব সৃষ্টি করলেও, মফস্বলে হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নি সংযোগ, ধর্ষণ এবং ধর্মান্তরের কাজ করেছিলো রাজাকারেরা। (সরকার, ২০০৬) এই রাজাকারেরা কেউ কেউ আবার স্বাধীনতার পরে মুক্তিযোদ্ধা সাজে, আনসার বাহিনী অথবা বিডিআরে যোগ দেয়। তারপর তাদের দেশবিরোধী ভূমিকা পালন করতে থাকে। সুতরাং দালালদের ন্যায্য বিচার হওয়া উচিত ছিলো।

এ রকম একজন রাজাকার-শিরোমণির উল্লেখ করেছেন শাফায়াত জামিল। তিনি লিখেছেন যে, বাঙালি সেনা-কর্মকর্তা লে. ক. ফিরোজ সালাহউদ্দীন

মুক্তিযুদ্ধে যোগ না-দিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন পাকিস্তানীদের পক্ষে। তিনি যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত কাজ করেছিলেন প্রধান রাজাকার রিক্রুটিং অফিসার হিশেবে। কিন্তু তিনি ছিলেন কর্নেল ওসমানীর খুব প্রিয়পাত্র। সুতরাং তাঁর নেক নজরবশত দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও পুনর্বাসিত হয়েছিলেন। (জামিল, ২০০৯) এ রকম দালালদের বিচার করতে ব্যর্থ হয়েছিলো সরকার।

তবে সরকার দালালদের কিছুই করেনি বললে, অসত্য বলা হবে। দেশ শত্রুমুক্ত হওয়ার মাস খানেক পরেই—২৪শে জানুয়ারি দালাল আদেশ জারি করা হয়েছিলো। এই আদেশ অনুসারে হাজার হাজার দালাল গ্রেফতার হয়। তাতে তাদের ভালোই হয়েছিলো। কারণ বাইরে থাকলে, তারা হয়তো বিপদে পড়তো। জেলে গিয়ে সরকারী খরচে নিরাপদে থাকে। ৩রা অক্টোবর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন যে, তখন পর্যন্ত ৪১ হাজার ৮ শো দালাল এই আইনের অধীনে আটক করা হয়েছে। (হাবিবুর, ২০০৮) এদের মধ্যে এমন অনেককে ধরা হয়েছিলো যারা সত্যিকার রাজাকার ছিলো না। কিন্তু সত্যিকার দালালদেরও বেশির ভাগের কোনো বিচার হয়নি। বিচার পরিণত হয়েছিলো প্রহসনে।

এ রকমের একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন এম আর আখতার মুকুল তাঁর *মুজিবের রক্ত লাল* গ্রন্থে। একজন রাজাকারের বিচার হচ্ছিলো এক আদালতে। বিচারে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর বিচারক জিজ্ঞেস করেন, সে দোষী কিনা। রাজাকার চুপ করে থাকে। তখন বিচারক চিৎকার করে জিজ্ঞেস করেন, সে চুপ করে আছে কেন? রাজাকার তার উত্তরে বলে যে, সে ভাবছে, কী বলবে। কারণ যে তাকে রাজাকার বাহিনীর জন্যে বেছে নিয়েছিলো, সেই লোকটি এখন বিচারকের আসনে বসে আছে, আর তাকে দাঁড়াতে হয়েছে আসামীর কাঠগড়ায়। (উদ্ধৃত, অ্যান্টনি, ১৯৮৬) এ রকমের কিছু সাধারণ রাজাকার থেকে আরম্ভ করে গভর্নর আবদুল মালিকের মতো কিছু অসাধারণ রাজাকারেরও বিচার হয়েছিলো। কিন্তু যে-দালালদের বিচার হয়েছিলো, তারাও পরের বছর মে মাসে সাধারণ ক্ষমা লাভ করে।

পঞ্চাশ হাজার দালালের মধ্যে তখন যদি শখানেক দালালেরও যথার্থ বিচার এবং তাদের অমানবিক আচরণের জন্যে কঠোর শাস্তি হতো, তা হলে বাংলাদেশে অতো দ্রুত পাকিস্তান-প্রেম উথলে উঠতো বলে মনে হয় না। তা হলে কালে কালে দালালরা মুক্তিযোদ্ধা জিয়ার জাতীয়তাবাদী দলের উঁচু আসনে বসতে পারতো না; অথবা আল-বদর বাহিনীর কোনো সদস্যও দেশের মন্ত্রীর আসন পেতো না। জিয়াউর রহমান এঁদের ব্যাপক হারে পুনর্বাসন করলেও, পুনর্বাসনের কাজ মুজিবের আমল থেকেই আরম্ভ হয়েছিলো। যে-রাজাকারেরা লক্ষাধিক সাধারণ মানুষের হত্যা এবং লক্ষাধিক নারী ধর্ষণের জন্যে দায়ী ছিলো, তাদের একজনেরও ফাঁসি হলো না অথবা দীর্ঘমেয়াদী জেল হলো না, এর চেয়ে বড়ো

অবিচার আর কী হতে পারে? তবে কেবল শেখ মুজিব নিজেই এই দালালদের শাস্তি না-হওয়ার জন্যে দায়ী ছিলেন না। বাংলাদেশ যে ছোট্টো একটি দেশ এবং এখানে আত্মীয়তার বন্ধন জোরালো ভূমিকা পালন করে—তাও এর জন্যে দায়ী। সবাই সবার মুখ চেনা। সবাই সবার আত্মীয়—নিদেন পক্ষে—দূর সম্পর্কের আত্মীয়। এই প্রসঙ্গে স্বরোচিষ সরকারের গ্রন্থ থেকে একটি অসাধারণ দৃষ্টান্ত হাজির করতে পারি। বাগেরহাটের একজন মুসলিম লীগের সাবেক এমএনএ, শান্তি কমিটির প্রধান ও রাজাকার বাহিনীর সংগঠক ছিলেন আতাহার আলি খান। তাঁর পুত্র পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসে মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর বীরত্বের জন্যে 'বীর উত্তম' হয়েছিলেন। (সরকার, ২০০৬) এ ক্ষেত্রে তাঁর পিতা ধরা পড়লেও, তার বিচার হয়নি। আবার এ অঞ্চলের একজন রাজাকার বিডিআর-এ যোগ দিয়ে উঁচু পদে উঠেছিলেন। তাঁরও বিচার হলো না। শেখ মুজিব নিজে যাঁদের চিনতেন, তাঁদের প্রতি কঠোর তো হতেই পারেননি, এমন কি, আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের পরিচিত/স্বজনদেরও বিচারের আওতায় আনা যায়নি।

শেখ মুজিবের তর্কাতীত কৃতিত্ব হলো : তিনি বাংলাদেশে বিশ্বাসযোগ্য একটি সরকার স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তিনি না-এলে দেশ অরাজকতা এবং হানাহানির দিকে চলে যেতো। তাঁর আর-একটি প্রধান কৃতিত্ব '৭২ সাল শেষ হওয়ার আগেই দেশকে তিনি একটি চমৎকার সংবিধান দান করেছিলেন। বস্তুত, তিনি দেশকে এমন একটি সংবিধান দিয়েছিলেন, যা বাঙালিরা দীর্ঘকাল ধরে আশা করছিলেন।

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট-কেন্দ্রিক সরকার অথবা ফৌজী একনায়কত্বের বদলে বাংলাদেশে গৃহীত হয় সংসদীয় পদ্ধতি। তদুপরি, নিজে ধর্মভীরু মুসলমান হলেও, ধর্মনিরপেক্ষতাকে মুজিব দেশের অন্যতম আদর্শ করেছিলেন। তাঁর আমলে বঙ্গভবনে মিলাদ, মিলিটারি প্যারেডে কোরান তেলোয়াত, মিলিটারির অঙ্গীকার কোরান ছুঁয়ে—সবই চালু ছিলো। কিন্তু অমুসলমান বলে কারও প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়নি। সম্ভবত হিন্দুদের পক্ষে চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রেও বৈষম্য ছিলো না।

মুজিব নিজে আন্তরিকভাবে গরিবদের মুখে হাসি ফোটানোর স্বপ্ন দেখতেন। এ কেবল তাঁর নির্বাচনের প্রচার ছিলো না। (কামাল হোসেনের সাক্ষাৎকার, ১৮. ৯. ২০০৯) সত্যি সত্যি তিনি গরিবদের জন্যে কিছু করবেন বলে আশা করেছিলেন। কিন্তু তাই বলে তিনি সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করতেন—এমন কোনো প্রমাণ নেই। তা সত্ত্বেও, রাষ্ট্রের অন্যতম আদর্শ হিশেবে সমাজতন্ত্রকে গ্রহণ করেছিলেন। আদর্শ হিশেবে সমাজতন্ত্রকে গ্রহণ করাও অপেক্ষাকৃত সহজ হয়েছিলো। কারণ, বড়ো বড়ো সব শিল্প এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অবাঙালি মালিকরা দেশত্যাগ করায়,

সেসব এমনিতেই রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিলো। অর্থাৎ সমাজতন্ত্র স্থাপনের একটা বড়ো বাধাই তাঁর সামনে ছিলো না।

যে-গণতন্ত্রের জন্যে তিনি অতো বছর জেল খেটেছিলেন, সেই গণতন্ত্রও ছিলো সংবিধানের অন্যতম আদর্শ। কিন্তু তাঁর আমলের শেষ দিকে তিনি গণতন্ত্রের স্পিরিট হারিয়ে ফেলেছিলেন। নিজেই অগণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি যে দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতাশালী এবং প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন, তাও তাঁকে অগণতান্ত্রিক পথ বেছে নিতে উৎসাহিত করেছিলো। কারণ, শক্তি যতো নিরঙ্কুশ হয়, তা বিকার লাভের সম্ভাবনাও ততো বেশি থাকে। তিনি যে একদলীয় এবং প্রেসিডেন্ট-পদ্ধতি প্রবর্তন করেছিলেন, তার মতো অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপ আর কিছু হতে পারতো না। তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, চিরদিন গণতন্ত্রের জন্যে লড়াই করে, তিনি নিজেই সেই গণতন্ত্রের গোড়া কেটে ফেলেছিলেন।

সংবিধানের অন্য আদর্শ ছিলো জাতীয়তাবাদ। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিলো দীর্ঘ দু দশকের ভাষাভিত্তিক, ধর্মনিরপেক্ষ এবং আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের ফলে। তিনি গর্বের সঙ্গে বাঙালি বলে নিজের পরিচয় দিতেন। এই পরিচয়ের সঙ্গে ধর্মের কোনো যোগ তিনি দেখতে পাননি। তাই সংবিধানের অন্যতম আদর্শ হিশেবে গৃহীত হয়েছিলো জাতীয়তা। এবং তাঁর জাতীয়তা 'বাঙালি জাতীয়তা' অর্থাৎ ভাষাভিত্তিক জাতীয়তা, মানুষের জাতীয়তা। বাংলাদেশে তৈরি কোনো জড় পদার্থের রাষ্ট্রীয় পরিচয় নয়। তিনি দেশের মানুষকে সেই 'বাঙালি' নাগরিকত্ব দিতে চেয়েছিলেন।

বাংলাদেশ নামক একটা দেশের জন্ম দিয়ে মুজিব যে-ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিলেন, বাঙালি সংস্কৃতির ভাবী পথ নির্মাণের তা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এর ফলে বাঙালিরা চিরদিনের জন্যে দু ভাগে বিভক্ত হয়ে গেলেও ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশের অফুরন্ত সম্ভাবনা দেখা দেয় স্বাধীন দেশ—বাংলাদেশে। সেই পথ ধরে বাংলাদেশে বাংলা ভাষা, সাহিত্য, সঙ্গীত, তথা সমগ্র বাংলা সংস্কৃতির বিকাশ ঘটাই স্বাভাবিক। অপর পক্ষে, ভারতের একটা অঙ্গরাজ্য—পশ্চিম বাংলায় সেই পথ অতো প্রশস্ত কিনা, সন্দেহের বিষয়। এ দিক দিয়ে বিবেচনা করলে আধুনিক বাংলা সংস্কৃতির ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন শেখ মুজিব। তাঁর চেয়ে অনেক প্রতিভাবান বহু বিখ্যাত বাঙালি গত এক হাজার ধারায় অতো বড়ো মোড় পরিবর্তনে ভূমিকা রাখতে পারেননি। এ কারণে, তিনি সর্বকালের একজন শ্রেষ্ঠ বাঙালি।

নক্ষত্রের পতন

'৭২ সালের ডিসেম্বর মাসে দেশকে একটি আদর্শ সংবিধান দেওয়ার পর, মুজিব নির্বাচন আহ্বান করেন। নির্বাচনের তারিখ '৭৩-এর ৭ই মার্চ—দু বছর আগে যে-সাতই মার্চ তিনি মুক্তি এবং স্বাধীনতার আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাঁর আমলে দেশে ততোদিনে অনেক অব্যবস্থা দেখা দিয়েছিলো। তা সত্ত্বেও তখনো তিনি জনপ্রিয় নেতা ছিলেন। আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের অনেকে দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়লেও, দল হিশেবে আওয়ামী লীগের কোনো বিকল্প তখন ছিলো না। অন্য দলগুলো সমালোচনা করতে পারলেও, তাদের কারও পক্ষে দেশ পরিচালনা করা সম্ভব ছিলো না। সুতরাং ৭ই মার্চ কেন, অন্য যে-কোনো দিন নির্বাচন দিলেও তিনি বিপুল সংখ্যাধিক্যে জয়ী হতেন। সে যা-ই হোক, এই নির্বাচনে ৩০০টি আসনের মধ্যে তাঁর দল ২৯২টি আসনে জয়ী হয়েছিলো।

অনেকে বলেন যে, এই নির্বাচনে কারচুপি হয়েছিলো। ভোট দান অথবা ভোট গণনায় তিনি নিজে কোনো কারচুপি করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন কিনা, জানা যায় না। কিন্তু কারচুপি যে হয়েছিলো, এতে বিশেষ সন্দেহ নেই। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। এই নির্বাচনে উত্তর বরিশালের একটি আসন থেকে দাঁড়িয়েছিলেন মুক্তিযোদ্ধা মেজর জলিল—জাসদ থেকে। আওয়ামী লীগের প্রার্থী ছিলেন হরনাথ বাইন। জলিল বীর মুক্তিযোদ্ধা হিশেবে সর্বত্র সুপরিচিত ছিলেন। অপর পক্ষে, হরনাথ বাইন ছিলেন সামান্যই পরিচিত। ৮ই মার্চ সকাল আটটা-নটা পর্যন্ত বেতারে যে-ফলাফল ঘোষণা করা হয়, তাতে জলিল এগিয়ে ছিলেন চার হাজারেরও বেশি ভোটে। বাকি ছিলো মাত্র দুটি কেন্দ্রের ভোট গণনা। এই দুটি কেন্দ্র মিলে মোট ভোটদাতাদের সংখ্যা ছিলো চার হাজারের কাছাকাছি। সুতরাং জলিলেরই জেতার কথা। কিন্তু ফলাফল প্রকাশ কয়েক ঘণ্টা বন্ধ থাকার পর যখন তা আবার প্রকাশ করা হয়, তখন হরনাথ বাইন জয়ী হন। বাকি দুটি কেন্দ্রের মোট

ভোটদাতাদের চেয়েও বেশি ভোট পেয়েছিলেন হরনাথ। ময়মনসিংহের একটি আসনে আবদুল মান্নান ছিলেন আওয়ামী লীগের প্রার্থী। যখন ভোট গণনায় দেখা গেলো মান্নান ক্রমাগত পিছিয়ে পড়ছেন, তখন হঠাৎ ব্যালট বাক্সো আসতে আরম্ভ করলো যাতে শুধু মান্নানেরই ভোট। (অ্যান্টনি, ১৯৮৬) চট্টগ্রামেও কারচুপি হয়েছিলো বলে জানা যায়। (মনিরুজ্জামান, ১৯৮০)

এ রকমের কারচুপির ঘটনা খুব বেশি ছিলো বলে মনে হয় না। কারণ, তখন দেশের একটি প্রধান দল ছিলো মোজাফফর ন্যাপ। আওয়ামী লীগের পরে সবচেয়ে বেশি ভোট (প্রায় ৯%) পেয়েছিলো এই দল। কিন্তু একটি আসনেও জয়ী হতে পারেননি। নির্বাচনের পর মোজাফফর আহমদ দাবি করেন যে, নির্বাচনে কারচুপি না-হলে তাঁর দল ২৫টি আসনে জয়ী হতো। কোনো কোনো পর্যবেক্ষকের মতে, অবাধ নির্বাচন হলে বিরোধী দলগুলো হয়তো বড়োজোর ৩০/৪০টি আসনে জয়ী হতো। ৩০০ আসনের সংসদে তা নিতান্ত নগণ্য। কিন্তু বিরোধী দল যে মাত্র ৮টি আসনে জয়ী হলো, তার ফলে হিতে বিপরীত হয়েছিলো। প্রথমত, এই নির্বাচনের ফলাফল থেকে মুজিবের মনে ধারণা হলো যে, তিনি দারুণ জনপ্রিয়। তখনো তিনি জনপ্রিয় ছিলেন ঠিকই, কিন্তু যতোটা তাঁর ধারণা হয়েছিলো, অতোটা নয়। দ্বিতীয়ত, সংসদে বিরোধী দল কার্যত না-থাকায় তা পরিণত হলো রাবার স্ট্যাম্পে। মুজিবের ইচ্ছাই হতো, সংসদের ইচ্ছা।

গণতন্ত্রের কতোগুলো রক্ষা-কবচ থাকে। তা না-হলে, নির্বাচিত সরকার প্রধানও একনায়কের মতো আচরণ করতে পারেন। যেমন, হিটলারও নির্বাচিত চ্যান্সেলর ছিলেন। কিন্তু তার ফলে একনায়ক হতে তাঁর আটকায়নি। গণতন্ত্রের সবচেয়ে প্রধান রক্ষাকবচ হলো : পার্লামেন্ট। সেই পার্লামেন্ট নিতান্ত একদলীয় হওয়ায় এবং সেখানে কোনো বিরূপ সমালোচনা না-থাকায়, মুজিব যা খুশি তাই করার অধিকারী হয়েছিলেন। তাঁর অসীম ক্ষমতা যে দ্রুত গতিতে বিকারের পথে এগিয়ে যায়, তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণই ছিলো এটা।

গণতন্ত্রের আর-একটি রক্ষাকবচ বিচার বিভাগ। কিন্তু বিচার বিভাগও তার স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলেছিলো। ১৯৭৪ সালের মে মাসে যেমন, চারদিন ধরে রক্ষী বাহিনীর নির্যাতনের পর একটি তরুণ উধাও হয়ে গেছে বলে দাবি করা হয়। হাই কোর্টে যখন এ নিয়ে মামলা হয়, তখন হাই কোর্ট রক্ষী বাহিনীর কঠোর সমালোচনা করে। বলে যে, রক্ষী বাহিনীর কার্যপ্রণালীর কোনো নিয়মকানুন নেই। এই সমালোচনার পর কোর্টের ক্ষমতা কমিয়ে এ ধরনের মামলা তার এক্তিয়ারের বহির্ভূত করা হয়। (অ্যান্টনি, ১৯৮৬) অর্থাৎ আইনের সাহায্য নিয়েও সরকারের স্বেচ্ছাচারিতার কোনো প্রতিকার পাওয়ার উপায় ছিলো না।

গণতন্ত্রের আর-একটি শক্তিশালী রক্ষাকবচ হলো পত্রপত্রিকা—সংবাদমাধ্যম। কিন্তু তখনকার বাংলাদেশের পত্রপত্রিকার ভূমিকা ছিলো অত্যন্ত সীমিত। বেতার-

টেলিভিশন ছিলো পুরোপুরি সরকার-নিয়ন্ত্রিত। একদিকে, পত্রিকাগুলো সমালোচনা করতে ভয় পেতো। অন্যদিকে, যেসব পত্রিকা কিছু সমালোচনা করতো, তাদের আবার নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। যেমন, '৭৩ সালে *স্বদেশ* এবং *হক কথা*-সহ তিনটি পত্রিকা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। পত্রিকাগুলোকে আরও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখার জন্যে '৭৪ সালের ২০শে নভেম্বর প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনস আইন পাশ হয়। *গণকণ্ঠ* নিষিদ্ধ হয় পরের বছর ২৭শে জানুয়ারি। আর, ১৬ই জুন সরকারী আদেশ অনুযায়ী চালু রাখা হয় মাত্র চারটি জাতীয় পত্রিকা। অন্যগুলোর প্রকাশনা নিষিদ্ধ হয়। মোট কথা, সমালোচনার সকল দুয়ার খিল দিয়ে বন্ধ করেছিলো সরকার।

ওদিকে, দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি '৭৩ সালে সবচেয়ে খারাপ হয়। আগেই উল্লেখ করেছি, এ বছর বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় প্রায় পঞ্চাশটি পুলিশ ফাঁড়ি এবং থানা লুট হয়। তা ছাড়া, ব্যাপকভাবে দেখা দেয় শ্রমিক সংঘর্ষ। পুলিশ এবং রক্ষী বাহিনীর গুলিতেও বিভিন্ন জায়গায় বহু লোক হতাহত হন। আসলে এই বছরটার সূচনাই হয়েছিলো পুলিশের গুলি করার ঘটনা দিয়ে। '৭৪ সাল নাগাদ তিন/চার হাজার আওয়ামী লীগ সমর্থক-সহ ৫ জন সংসদ সদস্যসহ নিহত হয়েছিলেন বলে মুজিব নিজেই দাবি করেছিলেন। (মুজিব, ১৯৭৫)

আইন-শৃঙ্খলার চেয়েও বড়ো হয়ে দেখা দেয়, খাদ্যের অভাব। আগেই বলেছি, '৭৪ সালের দুর্ভিক্ষে লাখ খানেক লোক মারা গিয়েছিলেন। মানুষ মানুষের বমি কুড়িয়ে খেয়েছে। বেশি ভিক্ষা পাওয়া যাবে—এই আশায় ভিক্ষুকরা অন্যের কাছ

লঙ্গরখানার সামনে সারিবদ্ধ অভুক্ত শিশুরা
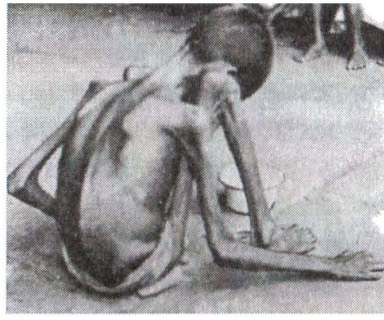
১৯৭৪ এর দুর্ভিক্ষ। কঙ্কালসার মানুষ

থেকে কিনে নিয়েছে শিশুর মৃতদেহ। এর পর জনপ্রিয়তা যখন ভাটার টানে একেবারে রসাতলে যাচ্ছিলো, তখন তিনি একদলীয় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা চিন্তা করেন। কামাল হোসেন বলেছেন যে, তিনিও জানতেন না, কার অথবা কাদের বুদ্ধিতে মুজিব এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। (কামাল হোসেনের সাক্ষাৎকার, ১৮. ৯. ২০০৯) অনেকে বলেন যে, ফিডেল ক্যাস্ট্রো তাঁকে এ বুদ্ধি দিয়েছিলেন। কেউ কেউ বলেন, তিনি এ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়নের বুদ্ধিতে। তিনি এবং তাঁর অতিঘনিষ্ঠ জনেরাই জানতেন সত্যিকার কারণটা। যা এখন আর জানার উপায় নেই। কিন্তু তিনি সারা জীবন বহুদলীয় সংসদীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতির জন্যে লড়াই করে একদলীয় ব্যক্তিকেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থার দিকে ঝুঁকে মস্ত ভুল করেছিলেন। অনেকে বলেন যে, তিনি দেশের সমস্যা দ্রুত এবং কার্যকরভাবে সমাধানের জন্যে এই ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। অপর পক্ষে, তাঁর সমালোচকরা বলেন যে, ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী এবং কুক্ষিগত করার উদ্দেশ্যে তিনি একদলীয় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন।

তিনি '৭৫ সালের ২৬শে মার্চ এক ভাষণে যা বলেছিলেন, তা থেকে বোঝা যায়, বাকশাল করার পেছনে তাঁর চারটি লক্ষ্য ছিলো। এগুলো হলো: দুর্নীতি দমন, উৎপাদন বৃদ্ধি, জন্মনিয়ন্ত্রণ এবং জাতীয় ঐক্য রচনা। তিনি ব্যাখ্যা করে বলেন যে, উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে প্রতিটি গ্রামে কোঅপারেটিভ গড়তে হবে। জমি রাষ্ট্রায়ত্ত করা না-হলেও, ফসল পাবে সবাই। আর, জাতীয় ঐক্য গড়ার জন্যে দেশে একটি মাত্র দল থাকবে। তাঁর ভাষায়, তিনি চান 'শোষিতের গণতন্ত্র।' (মুজিব, ১৯৭৫) বোঝা যায়, তিনি বাকশাল গঠন করেছিলেন সোভিয়েত আদর্শে। পার্থক্য এই যে, কমিউন না-করে তিনি কোঅপারেটিভ গড়ার কথা বলেছিলেন, জমির মালিকানা যেখানে ব্যক্তিগত। এবং সরকার যেখানে হবে কেবল পার্টির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের যন্ত্র।

একবার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলার পর, মুজিব একদলীয় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের পথে দ্রুত গতিতেই অগ্রসর হয়েছিলেন। তিনি সারা দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন '৭৪ সালের ২৮শে ডিসেম্বর। সেই সঙ্গে স্থগিত করেন জনগণের মৌলিক অধিকার। তার দু-তিন মাস আগে থেকেই দেশে কোনো ধর্মঘট, লক-আউট, বিক্ষোভও প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। আর দুর্ভিক্ষ শেষ হয়েছিলো নভেম্বরেই। মোট কথা, ডিসেম্বরের শেষে হঠাৎ করে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করার অব্যবহিত কোনো কারণ ছিলো না। জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না, এর ন দিন পরে—৬ই জানুয়ারি—আবার ঘোষণা করেন যে, সকল জন-সমাবেশ, জনসভা এবং ধর্মঘট নিষিদ্ধ হলো।

আওয়ামী লীগের ছোটোখাটো নেতা অনেকেই ছিলেন। কিন্তু তাঁদের তুলনায় মুজিবের অবস্থান ছিলো হিমালয় পর্বতের মতো অনেক উঁচুতে। সবকিছু চলতো, তাঁরই ইচ্ছায়। তা সত্ত্বেও, ২১শে জানুয়ারি আওয়ামী লীগের সংসদীয় কমিটি সব রকমের জাতীয় সমস্যা সমাধানের জন্যে যে-কোনো ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা প্রদান করেছিলো প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানকে। এর চারদিন পরে তাঁর ইচ্ছায় প্রেসিডেন্ট-পদ্ধতি এবং একটি মাত্র জাতীয় দল প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী গৃহীত হয়। এই সিদ্ধান্ত বিনা বিতর্কে সংসদে গৃহীত হওয়ার পর তিনি দেশের রাষ্ট্রপতি হন ২৫শে জানুয়ারি। কেবল রাষ্ট্রপতি নয়, সর্বশক্তিমান রাষ্ট্রপতি। (হাবিবুর, ২০০৮) সৈয়দ নজরুল ইসলাম হন ভাইস-প্রেসিডেন্ট আর মনসুর আলী রাবার-স্ট্যাম্প মন্ত্রিসভার প্রধানমন্ত্রী। ২০শে ফেব্রুয়ারি মন্ত্রিসভা নিয়ে রাষ্ট্রপতি সিদ্ধান্ত নেন যে, দেশের একমাত্র রাজনৈতিক দল হবে বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ—সংক্ষেপে বাকশাল। অমনি, সমস্ত মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা বাকশালে যোগ দিলেন। মন্ত্রী এবং সংসদ-সদস্যদের যোগ দেওয়ারও কোনো দরকার ছিলো না। তাঁরা সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সবাই বাকশালের সদস্য হয়ে গেলেন। কামাল হোসেন যেমন যোগ দিয়েছিলেন না।

কিন্তু ২০শে ফেব্রুয়ারি মন্ত্রিসভা যে-সিদ্ধান্ত নেয়, তাতে তিনিও বাকশালী বলে গণ্য হন। নামে খানিকটা পরিবর্তন এলেও, বাকশাল ছিলো আসলে পুরোনো আওয়ামী লীগই, নতুন লেবেল লাগানো।

রাজনীতি যাঁরা করতেন না, তাঁদেরও এ সময়ে বাকশালে যোগ দেওয়ার জন্যে চাপ দেওয়া হতে থাকে। যেমন, যাঁরা দলীয় রাজনীতি করতেন না, তেমন বুদ্ধিজীবীদের। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বাকশালে যোগ দানের জন্যে কেবল উৎসাহিত নয়, রীতিমতো ভয়ভীতি দেখানোর ঘটনাও ঘটে। প্রায় অবিশ্বাস্য হলেও, দলে যোগ দেওয়া জন্যে সেনাবাহিনীর সদস্যদেরও উৎসাহিত করা হয়। প্রধানমন্ত্রী মনসুর আলী এক সেনাসমাবেশে এ সময়ে বলেন যে, দেশে দ্বিতীয় বিপ্লব সফল করার জন্যে বাকশালে যোগ দিয়ে সেনাবাহিনীকেও সহযোগিতা করতে হবে।

বাংলাদেশের তখনকার বেশির ভাগ লোকের পেটে খিদে থাকলেও, অগণতান্ত্রিক বাকশাল পদ্ধতিকে মেনে নিতে পারেননি। এমন কি, নিহত হওয়ার মাত্র সাত দিন আগে মুজিব সংসদ সদস্যদের মতামত জানার জন্যে যে-গোপন ব্যালট করেছিলেন, তাতে ৩০৭ জন সাংসদের মধ্যে বাকশাল পদ্ধতিকে সমর্থন করেছিলেন মাত্র ১১৭ জন। (ফ্র্যান্ডা, ১৯৯২) স্বাধীন সংবাদমাধ্যমের অভাবে, তাঁদের প্রতিবাদ প্রকাশ পায় গুপ্ত হত্যা এবং বোমাবাজির মাধ্যমে। ফেব্রুয়ারি মাস থেকে আরম্ভ করে মে মাস পর্যন্ত আওয়ামী লীগের কয়েকজন নির্বাচিত সদস্য-সহ বাকশালের বহু স্থানীয় নেতা নিহত হন। নিহত হন যশোরে, নেত্রকোনায়, ফরিদপুরে, ঝিনাইদহে, গাইবান্ধায়, টাঙ্গাইলে, টুঙ্গিপাড়ায়—দেশের বিভিন্ন অংশে। তা ছাড়া, ১১ই ফেব্রুয়ারি জেনারেল ওসমানী এবং মঈনুল হোসেন সংসদের সদস্য পদ ইস্তফা দেন। আর এপ্রিল মাস পর্যন্ত আবদুল্লাহ সরকার এবং মঈনুদ্দীন আহমদ বাকশালে যোগ না-দেওয়ায়, সংসদে তাঁদের সদস্য পদ শূন্য বলে ঘোষণা করা হয়। (হাবিবুর, ২০০৮) এ ছাড়া, ঢাকায় একাধিক জায়গায় বোমা বিস্ফোরণ-সহ বহু জায়গায় দেখা দেয় অরাজকতা।

একদলীয় শাসন প্রবর্তন করে জাতির জনক হয়তো ব্যক্তিপূজারী একটি 'কাল্ট' গঠন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে দেশ ভেসে যেতে থাকে ফ্যাশিবাদের দিকে। তাঁর আসল উদ্দেশ্য যা-ই হোক, দেশ সে দিকে এগিয়ে যায়নি। অথবা সূচিত হয়নি দেশের কোনো লক্ষণীয় উন্নতিও। বরং আপাতদৃষ্টিতে এ থেকে উল্টো ফল ফলেছিলো। চিরদিনের জনগণের প্রিয় নেতা শেখ মুজিব জনগণের থেকে আরও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। বাস্তবতার মাটি থেকে তিনি সরে যান অনেক দূরে। এমন কি, তাঁর পায়ের তলা থেকে মাটি যে সরে যাচ্ছে, এ-ও তিনি অনুভব করতে পারেননি।

তাজউদ্দীনকে শেখ মুজিব মন্ত্রিসভা থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন '৭৪ সালের শেষ দিকে। সেই বরখাস্ত তাজউদ্দীন একদলীয় শাসন প্রবর্তনের উদ্যোগ দেখে

জাতির জনককে টেলিফোন করে বলেছিলেন, 'মুজিব ভাই, এর পর বুলেট ছাড়া তো আপনাকে সরানোর কোনো উপায় থাকলো না!' এই তথ্যটি পড়েছিলাম ২০০৮ সালে *প্রথম আলোতে* প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে। ভাগ্যের পরিহাস, সেই বুলেটের অনিবার্য মুখেই মুজিব এগিয়ে যান ধীর গতিতে—নিজের এবং তাঁর মোশায়েবদের অজ্ঞাতে।

আগেই বলেছি, তিনি নিজে যেমন দেশবাসীকে ভালোবাসতেন, দেশবাসীরাও তেমনি তাঁকে ভালোবাসতেন। কিন্তু তিনি দেশবাসীর মনে যে-গভীর প্রত্যাশা জাগিয়ে তুলেছিলেন, তা পূরণের মতো ক্ষমতা তাঁর ছিলো না। কারোই ছিলো না। তাঁর ব্যর্থতার দরুন জনগণের কাছে তাঁর ভাবমূর্তি বদলে যায়। সাধারণ মানুষ দু বেলা খেতে এবং লজ্জা নিবারণের মতো কাপড়চোপড় পেলেই সন্তুষ্ট হন। তারও প্রচণ্ড অভাব দেখা দিয়েছিলো। যুদ্ধের আগে এবং অব্যবহিত পরে শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা ছিলেন তাঁর খুবই অনুরাগী। কিন্তু কিভাবে তাঁদের মধ্যেও তাঁর ভাবমূর্তি বদলে যায়, তার একটা প্রমাণ পাই, রফিক আজাদের কবিতা 'ভাত দে হারামজাদা!'য়। এর প্রতিফলন লক্ষ করি একজন গৃহবধূর কথা থেকেও। এই গৃহবধূ রাজনীতি করতেন না। কিন্তু রাজনীতি-সচেতন ছিলেন। এঁর নাম জাহানারা ইমাম। তিনি সরদার ফজলুল করিমকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন :

> তিনি আমাদের অবিসংবাদিত নেতা—আমরা সবাই তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। তাঁকে আমরা প্রাণের চেয়ে বেশি ভালোবাসি। তিনি তার আগে বহু বছর ধরে স্বাধিকার আন্দোলনে নিজের জীবনটাই এক রকম উৎসর্গ করেছিলেন, ক্রমে তিনি দেশের সবচেয়ে বড়ো নেতা হয়েছেন ...। শেখ যখন এলেন, তখন আমার মনে হয় যে তিনি দেশবাসীর, মুক্তিযোদ্ধাদের মোকাবেলা করতে পারলেন না। ... দেখা গেলো যে আসল মুক্তিযোদ্ধাদের বলা হলো যে তোমরা অপেক্ষা করো কিংবা তোমরা নিজের স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যাও। এদিকে আবার অনেক ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা সার্টিফিকেট পেয়ে গেলো। ... সত্যিকারের মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ মুক্তিযোদ্ধারা ক্রমশ হতাশাগ্রস্ত হয়ে গেলো। ... কতো সোনার ছেলে, কতো তরুণ—যাদের মনের মধ্যে ছিলো আদর্শ, চোখে ভবিষ্যতের স্বপ্ন—মৃত্যু বরণ করেছে।
>
> ... কয়েকটা ভুলও বোধ হয় ওই সরকার করেছিলো। যেমন দালালদের ক্ষমা করে দেওয়া হলো। তারা তখন জেলে জেলে রয়েছে, কেউ লুকিয়ে রয়েছে। ক্ষমা করে দেওয়ার পর তারা বেরিয়ে এসে বেশ কিছু দিন মাথা নিচু করে থাকলো। আস্তে আস্তে নিজেদের শক্তি সঞ্চয় করতে লাগলো। তখন যদি ওই দালালদের শেষ করে দেওয়া যেতো, তা হলে তারা তো এই ক্ষতি করতে পারতো না।
>
> আমাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় নেতা শেখ মুজিবের কিছু পারিবারিক ব্যাপারে দুর্বলতা ছিলো। নিজের ছেলে, নিজের ভাগ্নেকে তিনি কন্ট্রোল করতে পারতেন না। ... তাঁর যে ভাই খুলনায় মারা গিয়েছিলেন, আমি শুনেছি লোকের মুখে, সেখানকার লোকেরা নাকি আনন্দে মিলাদ পড়িয়েছে। তিনি এতোই অত্যাচারী ছিলেন। এসব বলতে খারাপ লাগে, কষ্ট লাগে। কিন্তু এমন ঘটনা ঘটেছে তো! তারপর তাঁর ভাগ্নে শেখ মণিকে তো অনেকে পছন্দ করতো না। ... তাঁর আরও আরও আত্মীয়স্বজন এগুলো যে করতো—অনেককে অত্যাচার করা, অন্যায় সুযোগ-সুবিধা নেওয়া—এগুলো সে

> সময়কার লোকেরা সবাই জানে। কিন্তু শেখ স্নেহে অন্ধ হয়ে এগুলোর কিছু করেননি। ... এসব ঘটনা ঘটে যাওয়ায় সেই সময় লোকেদের মন সত্যিই খুব বিরূপ হয়েছিলো। ... তা ছাড়া একদলীয় শাসন — সেটাও আমি মনে করি আমাদের দেশের জন্যে ক্ষতি হয়েছিলো এবং রক্ষী বাহিনীর সৃষ্টিটাও আমাদের দেশের জন্যে ক্ষতি করেছিলো।' (*প্রথম আলো*, ঈদসংখ্যা ২০০৯)

তাঁর ভাগ্নে হিশেবে জাহানারা ইমাম কেবল শেখ মণির নাম উল্লেখ করলেও, তিনিই একমাত্র ভাগ্নে ছিলেন না—যিনি জনগণের চোখে জনপ্রিয়তা হারিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে ছিলেন শেখ শহীদুল ইসলাম এবং আবুল হাসনাত। অভ্যুত্থানের মাত্র পাঁচ দিন আগে, ২৪ বছর বয়সে শহীদুল ইসলাম আওয়ামী ছাত্র লীগের প্রধান হিশেবে বাকশালের মন্ত্রী পর্যায়ের ১৫ জন ব্যক্তির মধ্যে অন্যতম বলে মনোনীত হন। শেখ মণি ১৯৭০ সালে সাংবাদিক হিশেবে কাজ শুরু করেছিলেন ২৭৫ টাকা বেতনে। কিন্তু '৭২ সালের মধ্যেই তিনি মতিঝিলে *বাংলার বাণী*-ভবনসহ অনেক টাকাপয়সার মালিক হয়েছিলেন। যুব লীগের প্রধান হিশেবে রাজনৈতিক ক্ষমতারও তুঙ্গে উঠেছিলেন। শেখ মুজিব তাঁর ভগ্নিপতিদেরও পৃষ্ঠপোষণা করেছিলেন। যেমন, আবদুর রব সেরনিয়াবাত। তিনি নিজে দুর্নীতিমুক্ত বলে সুনাম অর্জন করলেও, মন্ত্রী হওয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ রাজনীতিক ছিলেন না। অন্য এক ভগ্নিপতি সৈয়দ হোসেন '৭১ সালে সেকশন অফিসার হিশেবে পাকিস্তানে কাজ করেছিলেন। '৭২ সালে দেশে ফিরে তিন বছরের মধ্যে অতিরিক্ত সচিব হয়েছিলেন। একমাত্র ভাই শেখ নাসেরও জাতির জনকের নাম ভাঙিয়ে তিন-চার বছরের মধ্যে বিরাট ধনী হয়েছিলেন। (ফ্র্যান্ডা, ১৯৮২) জনগণ এসব ভালো চোখে দেখেননি। এভাবেই তাঁর ভাবমূর্তি বিনষ্ট হয়েছিলো তাঁদের চোখে। তাঁর কাছে জনগণের প্রত্যাশা বেশি ছিলো বলেই জনগণ হয়তো তাঁর ওপর বেশি হতাশ হয়েছিলেন।

মুজিব-হত্যার পর অনেকেই তার কারণ খুঁজে বের করতে চেষ্টা করেছেন। দেশে দুর্ভিক্ষ, আইন-শৃঙ্খলার অভাব এবং একদলীয় স্বৈরশাসন প্রবর্তন ছাড়া যে-কারণটার কথা অনেকেই বলেছেন, তা হলো : সেনাবাহিনীর মধ্যে সাধারণভাবে তাঁর বিরুদ্ধে অনেক ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছিলো। দেশকে শত্রুমুক্ত করার জন্যে সেনাবাহিনীর জওয়ান এবং অফিসাররা অসামান্য ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু এই ত্যাগের কারণে তাঁদের যথেষ্ট পুরস্কৃত করা হয়নি বলে তাঁদের অনেকেরই ধারণা হয়েছিলো। '৭২ সালের ৮ই এপ্রিল আইনত সেনাবাহিনী গঠিত হয়েছিলো ঠিকই, কিন্তু এই বাহিনীকে একটা সুসজ্জিত বাহিনী হিশেবে গড়ে তোলার ব্যাপারে মুজিবের আগ্রহ অথবা উৎসাহ ছিলো না। পাকিস্তানী আমল থেকেই ক্ষমতা দখলের ব্যাপারে সেনাবাহিনীর যে-ভূমিকা তিনি লক্ষ করেছিলেন, তাতে মিলিটারির প্রতি তাঁর মনে যথেষ্ট বিদ্বেষ তৈরি হয়েছিলো। সেনাবাহিনীর কাছ থেকে নির্যাতনও কম ভোগ করেননি তিনি। (অ্যান্টনি, ১৯৮৬)

তদুপরি, তিনি নিজে হয়তো ভেবে দেখেছিলেন যে, বাংলাদেশের তিন দিকে ভারত। ভারতের মুখোমুখি দাঁড়াবার মতো সেনাবাহিনী গড়ে তোলার জন্যে যে-লোকবল এবং অর্থবল দরকার ছিলো, তার কোনোটাই বাংলাদেশের ছিলো না। অপর পক্ষে, ভারতের সঙ্গে মিত্রতার সম্পর্ক থাকলে বাংলাদেশের ওপর অন্য কেউ আক্রমণ করার মতো ছিলো না। সে ক্ষেত্রে নামে মাত্র সেনাবাহিনী রাখলেই যথেষ্ট হবে। ফলে প্রতিরক্ষা খাতে যে-বিপুল ব্যয় হতে পারতো, তা দেশের উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করা সম্ভব হবে। ভারতও বাংলাদেশে একটা শক্তিশালী সেনাবাহিনী দেখতে চায়নি। উভয় তরফের এই ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের এই মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় '৭২ সালের মার্চ মাসে।

সুতরাং সেনাবাহিনীকে মুজিব যথেষ্ট মর্যাদা অথবা যত্নের সঙ্গে গড়ে তোলেননি। এর জন্যে যে-অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ—এমন কি—পোশাক-আশাক প্রয়োজন, তারও পর্যাপ্ত আয়োজন করেননি। সেনাবাহিনী এটাকে তাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ বলে বিবেচনা করেছিলো। একদিকে, দেশে এক শ্রেণীর লোকেদের মধ্যে চলছিলো দুর্নীতি এবং লুটপাট, অন্যদিকে, সেনাবাহিনী বঞ্চিত হচ্ছিলো তাদের ন্যায্য প্রাপ্য থেকে। ফলে বহু সেনাসদস্য ব্যক্তিগতভাবে মুজিবের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। রক্ষী বাহিনী গড়ে তোলায়, তাকেও সেনাবাহিনী তাদের প্রতিপক্ষ হিশেবে বিবেচনা করেছিলো। এই রক্ষী বাহিনীকে যতোটা সাজ-সরঞ্জাম দেওয়া হয়েছিলো, সেনাবাহিনীকে তাও দেওয়া হয়নি বলে সেনা সদস্যদের অনেকের ধারণা হয়েছিলো।

এক কথা বললে অদ্ভুত শোনাবে যে, সেনাসদস্যরা প্রায় সবাই মুক্তিযোদ্ধা হওয়ায়, তাও একটা সমস্যা সৃষ্টি করেছিলো। মুক্তিযুদ্ধে তাঁরা অংশ নিয়েছিলেন, বিদ্রোহ করে। অর্থাৎ সেনাবাহিনীর কাছে যা সবচেয়ে বেশি প্রত্যাশিত—শৃঙ্খলা এবং চেইন অব কম্যান্ড, তা ভঙ্গ করে তাঁরা মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। এটা দেশের প্রতি তাঁদের ভালোবাসা এবং প্রত্যাশা বাড়িয়ে দিয়েছিলো। আবার, বিদ্রোহ করার এবং চেইন অব কম্যান্ড ভাঙার মানসিকতারও জন্ম দিয়েছিলো। যে-দেশের মুক্তির জন্যে তাঁরা প্রাণের মায়া ত্যাগ করে লড়াই করেছিলেন, সেই দেশে দুর্নীতি, বিশৃঙ্খল শাসন এবং হালুয়া-রুটির ভাগাভাগি দেখে তাঁরা বিরক্ত হয়েছিলেন। সেনাবাহিনীকে যখন অস্ত্র উদ্ধার, পাচার এবং দুর্নীতি নির্মূল করার দায়িত্ব দেওয়া হয়, তখন তাঁরা দুর্নীতি এবং স্বজনপ্রীতি কী ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিলো, তার প্রত্যক্ষ পরিচয় পান। তাঁরা দেখতে পান, দলীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের আশ্রয়ে কিভাবে লুটপাট এবং দুর্নীতি চলছিলো। যখনই তাঁরা ছোটো অথবা বড়ো কোনো অপরাধীকে ধরেছেন, তখন তারা ওপর মহলের হুকুমে ছাড়া পেয়েছে। ফলে প্রতিবার কর্তাব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তাঁদের মনে ক্ষোভ দানা বেঁধেছে। এমন কি, আইন হাতে তুলে নেওয়ার কথাও মনে হয়েছে। তার ওপর, আবু তাহের,

জিয়াউদ্দীন এবং জলিলের মতো রাজনীতি-সচেতন বহু সেনাসদস্যও ছিলেন—যাঁরা ভিন্ন ধরনের সেনাবাহিনী গড়ে তোলার কথা ভেবেছিলেন।

মুজিব হত্যার সবচেয়ে বড়ো নেতা ফারুকও এমনি এক ক্ষুব্ধ মেজর। মুন্সিগঞ্জে গিয়ে দারুণভাবে তার চোখে পড়ে দুর্নীতি এবং স্বজনপ্রীতি। তখনই নাকি ফারুকের মনে হয় যে, জাতির পিতাকে হত্যা করবেন। টঙ্গী অঞ্চলে অনুরূপ 'অপারেশন' করতে গিয়ে মেজর নাসেরেরও তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছিলো। প্রতিবারেই এ ধরনের ঘটনায় ধরা-পড়া আসামীরা দলীয় পরিচয়ের সূত্রে মুক্ত হয়। এতে সেনাবাহিনীর একটা অংশ ক্ষুব্ধ হয়। (অ্যান্টনি, ১৯৮৬)

তা ছাড়া, আইন হাতে তুলে নেওয়ার প্রবণতা দেখা দেয় একেবারে '৭২ সাল থেকে। সিনিয়রিটি ভেঙে মুজিব যখন সফিউল্লাহকে প্রধান সেনাপতি করেন, তখন মেজর জিয়াউদ্দীন নিজে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে এর প্রতিবাদ করেন। এটা সেনা-আইনের গুরুতর লঙ্ঘন ছাড়া আর-কিছু নয়। এমনি আর-একটি দৃষ্টান্ত মুজিব হত্যার আর-এক 'বীর'—ডালিমের। গাজী গোলাম মোস্তফা ছিলেন মুজিব-পরিবারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। পেশায় সাংবাদিক হলেও, স্বাধীনতার পর এই ঘনিষ্ঠতার কারণে তিনি রেড ক্রস সোসাইটির প্রধান নিযুক্ত হন। প্রচুর টাকাপয়সার মালিক হওয়া ছাড়াও, তিনি খুব প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। তাঁর এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের (মার্কাস ফ্র্যান্ডার মতে, পুত্র) সঙ্গে ডালিমের ব্যক্তিগত তিক্ততা সৃষ্টি হয়। শোনা যায়, তার স্ত্রীকে নাকি প্রকাশ্যে অপমান করা হয়েছিলো। (ফ্র্যান্ডা, ১৯৮২) এই ঘটনার পরের দিন হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের প্ররোচনায় ডালিমের সহকর্মীরা 'চেইন অব কম্যান্ড' ভেঙে গোলাম মোস্তফার বাড়ি ভাঙচুর করে। ওদিকে, ডালিম ছিলো মুজিব-পরিবারের ঘনিষ্ঠ এক বন্ধুর জামাতা। (অ্যান্টনি, ১৯৮৬) এই সূত্রে বিবাদ মীমাংসার জন্যে দুই পক্ষকে ডেকে পাঠান স্বয়ং জাতির জনক। এবং তিনিই এর সালিশী করেন। তিনি যে এ রকমের ছোটোখাটো ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতেন, এবং তাঁর কাছে আত্মীয়তা, পরিচয় অথবা দলীয় সূত্রে যে-কেউ যেতে পারতো, তা ছিলো অবাঞ্ছিত। এসবের মীমাংসা হওয়া উচিত ছিলো আইনের পথে।

এ রকম আর-একটি দৃষ্টান্ত শাফায়াত জামিলের। '৭৫-এর গোড়ার দিকে শেখ মুজিব তাঁকে ডেকে পাঠান। তাঁকে তিনি বলেন যে, তাঁর সঙ্গে সিরাজ সিকদারের যোগাযোগ ছিলো বলে অভিযোগ আছে। শাফায়াত তার উত্তরে বলেন যে, সিরাজ সিকদারের সঙ্গে কোনো কালেও তাঁর যোগাযোগ ঘটেনি। মুজিব বুঝতে পারেন যে, অভিযোগটা সত্য নয়। তাঁর কাছে এই গুজব পৌঁছে দিয়েছিলেন বিচারপতি বি এ সিদ্দিকী—যাঁর চাকরি চলে গিয়েছিলো যুদ্ধের পরে। (জামিল, ২০০৯) বিচারপতি সিদ্দিকীর কান-কথা রাষ্ট্রপতির শোনার কথা নয়। তবু তিনি শুনেছিলেন। তার চেয়ে বেশি অপ্রত্যাশিত, একজন ব্রিগেডিয়ারকে ডেকে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা। কারণ, এ-ও চেইন অব কম্যান্ড ভাঙা।

এ ধরনের ছোটোখাটো ঘটনায় তিনি যে কান দিতেন এবং নিজেই তার সমাধান করতে চেষ্টা করতেন, তার ফল তাঁর জন্যে মারাত্মক হয়েছিলো। কারণ, কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ক্ষোভ না-জমে, ভুক্তভোগীদের ক্ষোভ জন্মাতো ব্যক্তি-মুজিবের ওপর। অনেক সময় তিনি যেসব অভিযোগের কথা শুনতেন, তাও ছিলো অতিরঞ্জিত অথবা ভিত্তিহীন। বিশেষ করে, তিনি বহু গুরুত্বপূর্ণ পদে যাঁদের বসিয়েছিলেন, তাঁরা সত্যিকার বিশ্বস্ত লোক ছিলেন না। অনেকেই ছিলেন মোশায়েব।

সেনাবাহিনীতে পাকিস্তান-ফেরত যে-অমুক্তিযোদ্ধারা যোগ দিয়েছিলেন, তাঁদের সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধা সেনাদের ছিলো বেশ রেষারেষির সম্পর্ক। পাকিস্তানে আটকে-পড়া সেনাকর্মকর্তাদের মনে একটা কমপ্লেক্স কাজ করতো। তাঁরা ভাবতেন যে, তাঁদের অন্যরা বোধ হয় দালাল হিশেবে ধরে নিচ্ছে। সেই সঙ্গে তাঁরা মনে করতেন যে, মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়ার জন্যে তাঁদের তুলনায় অনেক কম অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মকর্তারা উচ্চতর পদ লাভ করেছেন এবং বেশি সুযোগসুবিধা পাচ্ছেন। সুতরাং মুক্তিযোদ্ধাদের কোনো ক্ষতি করতে পারলে অনেকে সে সুযোগের অপব্যবহার করতেন না।

শাফায়াত জামিল এ রকমের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন সামরিক গোয়েন্দা বিভাগ থেকে। তিনি লিখেছেন যে, পাকিস্তানের সামরিক গোয়েন্দা বিভাগে এমন বাঙালিদের নেওয়া হতো, যারা সত্যিকার পাকিস্তানপন্থী এবং বাঙালি-বিদ্বেষী। সেই গোয়েন্দা বিভাগের সদস্যদেরই বাংলাদেশের সামরিক গোয়েন্দা বিভাগে নিয়োগ করা হয়েছিলো। এঁরা মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে যদ্দুর সম্ভব বানোয়াট অভিযোগ খাড়া করতেন। যখন শেখ মুজিব নিহত হন, তখন এঁদের বড়ো কর্তাও ছিলেন এমনি একজন পাকিস্তান-ফেরত। তিনি শেখ মুজিবকে বাঁচানোর জন্যে কোনো চেষ্টা করেননি। এমন কি, যথাসময়ে খবরও দিতে পারেননি। (জামিল, ২০০৯) প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, জিয়াউর রহমানও পাঁচ বছর কাজ করেছিলেন পাকিস্তানের সামরিক গোয়েন্দা বিভাগে।

মোট কথা, যে-সেনাবাহিনীকে মুজিব অপছন্দ এবং অনেকটা অপ্রয়োজনীয় মনে করতেন, সেই বাহিনীর মধ্যে গোড়া থেকেই শৃঙ্খলার অভাব ছিলো। অভাব ছিলো ওপরওয়ালাদের প্রতি আনুগত্যেরও। সেনাবাহিনীর বেশির ভাগ সদস্যের এই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটে '৭৩ সালের গোড়ার দিকেই। '৭৩-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ অমন বিপুল ভোটাধিক্যে নির্বাচিত হলেও, সেনাছাউনিতে আওয়ামী লীগের পক্ষে ভোট পড়েছিলো শতকরা মাত্র বিশ ভাগ। (অ্যান্টনি, ১৯৮৬) কিন্তু জাতির পিতা সেদিকে কোনো মনোযোগ দিয়েছিলেন বলে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। '৭৪ সালে এই মুজিব-বিরোধিতা সেনাবাহিনীর মধ্যে আরও দানা বাঁধে।

এই পরিস্থিতিতে কয়েকজন সেনা সদস্যের মাথায় আসে কী করে জাতির পিতাকে হত্যা করে জাতিকে 'অগ্রগতির'র দিকে এগিয়ে নেওয়া যায়। এই ষড়যন্ত্রের নায়ক

ফারুক রহমান। একাধিক মন্ত্রী, সাবেক মন্ত্রী এবং সেনাবাহিনীর খালেদ মোশাররফ ছিলেন তাঁর আত্মীয়। ষড়যন্ত্রের অন্য সদস্যদের মধ্যে বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য খন্দকার রশিদ। দুজনই আবার নিকটাত্মীয়। একই এলাকাবাসী হিশেবে খন্দকার মোশতাকের সঙ্গে রশিদের ছিলো ভালো পরিচয়, শোনা যায় আত্মীয়তাও ছিলো। এদের বিস্তর সঙ্গী এবং উৎসাহদাতাও জুটে যায়। প্রায় সবাই মুক্তিযোদ্ধা। এমন কি, একজন 'বীর উত্তম'ও উৎসাহ জোগান, যদিও শেষ পর্যন্ত সরে যান।

দুর্নীতিগ্রস্ত শাসন-ব্যবস্থা এবং ব্যক্তিগত ক্ষোভ ছাড়া, আর কী কারণ ছিলো ষড়যন্ত্রের পেছনে, তার সঠিক তথ্য মেলে না। মোশতাক এবং তাহেরউদ্দীন ঠাকুর ছাড়া কোনো প্রভাবশালী উস্কানিদাতার কথাও জানা যায় না। কোনো প্রভাবশালী বহিঃশত্রুর সঙ্গে যুক্ত ছিলো কিনা, সে সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। সাংবাদিক আবদুল মতিন লিফ্‌সুলটজের বরাত দিয়ে লিখেছেন যে, ফারুকদের সঙ্গে সিআইএর যোগাযোগ ঘটেছিলো। (মতিন, ১৯৯৯) ঢাকার মার্কিন দূতাবাস যে আসন্ন অভ্যুত্থানের কথা জানতো—সেও সম্প্রতি প্রকাশিত দলিলপত্র থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়। প্রধান ষড়যন্ত্রকারীরা ব্যক্তিগত জীবনে ধার্মিক ছিলো বলে কোনো প্রমাণ নেই—যদিও ফারুক এবং রশিদ দুজনই ইসলাম ধর্ম বিপন্ন হয়েছিলো বলে তাদের একাধিক সাক্ষাৎকারে উল্লেখ করেছিলো। (ফ্র্যান্ডা, ১৯৮২) তাদের ইসলামী জাতীয়তাবাদী পরিচয় যে প্রবল ছিলো এটা পরিষ্কার। মুজিব-হত্যার পরে ডালিমের বেতারের ঘোষণা এবং পাকিস্তানপন্থীদের দেশে ফিরিয়ে নিয়ে আসা থেকেই এটা পরিষ্কার বোঝা যায়। তা ছাড়া, ফারুক-রশিদ-ডালিমের মধ্যে আইন না-মানার এবং বিদ্রোহ করার প্রবণতা ছিলো প্রায় সহজাত। ১৯৭৬ সালের এপ্রিল-মে মাসে তারা জিয়াউর রহমানের বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ ঘটানোর চেষ্টা করেছিলো।

মুজিব হত্যার সঙ্গে জিয়াউর রহমানের যোগাযোগের কথা বলেছেন অনেকে। তাঁর ব্যক্তিগত ক্ষোভ ছিলো যে, তাঁকে প্রধান সেনাপতি করা হয়নি, অথচ তিনি কেবল বাঙালি মেজরদের মধ্যে সবচেয়ে সিনিয়র ছিলেন না, তদুপরি, তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন চট্টগ্রাম বেতার থেকে। এ ছাড়া, তিনি উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন, তাও তাঁকে উস্কানি দিতে উদ্বুদ্ধ করে থাকতে পারে। সত্যিকার অর্থে মুজিব হত্যা থেকে কেউ যদি সবচেয়ে লাভবান হয়ে থাকেন, তা হলে তাঁর নামই বলতে হয়। কিন্তু তাঁর যোগাযোগ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য নেই। আবু তাহের, জিয়াউদ্দীন, জলিল—এঁদের আগেই চাকরি থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিলো। কাজেই এঁদের পক্ষে প্ররোচনা দেওয়া সম্ভব ছিলো, কিন্তু সরাসরি সাহায্য করা সম্ভব ছিলো না। চাকরি না-থাকা সত্ত্বেও এই হত্যাযজ্ঞে সরাসরি যারা অংশ নিয়েছিলো, তারা হলো ডালিম আর নূর। এক বছর আগে এদের চাকরি চলে যাওয়ায় এদের ব্যক্তিগত ক্ষোভ ছিলো।

সে যা-ই হোক, এ রকম একটা ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের জন্যে যে-ধরনের অস্ত্রশস্ত্রের দরকার ছিলো, ঘটনাচক্রে তা-ও এই ষড়যন্ত্রকারীদের হাতে এসে গিয়েছিলো পর্যাপ্ত পরিমাণে। '৭৩ সালের আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের সময়ে মুজিব বাংলাদেশ থেকে মিশরকে এক উড়োজাহাজ চা উপহার দিয়েছিলেন। তার প্রতিদানে মিশরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত মিশর থেকে পরের বছর পাঠান, খেজুর নয়—৩০টি ট্যাঙ্ক। সঙ্গে ৪০০ গোলা। (অ্যান্টনি, ১৯৮৬) তার থেকেও মন্দভাগ্য মুজিবের, সেনাবাহিনীর প্রধান সফিউল্লাহ এই ট্যাঙ্ক বহরের কম্যান্ডার করলেন ফারুক রহমানকে। তা ছাড়া, ফারুক, রশিদ-সহ ষড়যন্ত্রকারীদের কর্মস্থান ছিলো, ঢাকা অথবা তার কাছাকাছি। এমন কি, ৩২ নম্বর বাড়ির পাহারাদার বাহিনীও কিছু দিনের জন্যে ছিলো ফারুকের নিজস্ব ল্যান্সার বাহিনীর জওয়ান। কাজেই তাঁদের পক্ষে এই ষড়যন্ত্র বাস্তবায়িত করা সহজ হয়েছিলো।

সিনিয়র কর্মকর্তাদের অনেকের সঙ্গেই কথা হয় ফারুকের। সরাসরি মুজিব হত্যার কথা নয়। কিন্তু দেশের অব্যবস্থার একটা কিছু বিহিত করার। অনেকেই দেশের অবস্থা দেখে অসন্তুষ্ট ছিলেন। চীফ অব জেনারেল স্টাফ শাফায়াত জামিলও। কিন্তু তিনি 'কী করুম' বলে কোনো কিছু করতে অস্বীকার করেন। (অ্যান্টনি, ১৯৮৬) তখন সেনাবাহিনীর উপ-প্রধান ছিলেন জিয়াউর রহমান। ২০শে মার্চ তিনি ষড়যন্ত্রের কথা শোনেন আর-একটু খোলাশা করে। ষড়যন্ত্রকারীদের উদ্দেশ্য: শেখ মুজিবকে হত্যা করা। এ কথা ফারুকই তাঁকে বলেছিলো। জিয়াউর রহমান তাতে বলেন, 'তোমরা করতে চাইলে, করতে পারো। কিন্তু আমি তাতে যোগ দিতে পারবো না।' অর্থাৎ তিনি নিজে কোনো ঝুঁকি নিতে একেবারেই তৈরি ছিলেন না। তাই মেজর ফারুক তাঁর অফিস থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জিয়া তাঁর এডিসিকে বলেন, এই মেজরকে যেন তাঁর সঙ্গে দেখা করার আর কোনো সুযোগ দেওয়া না-হয়। স্বয়ং ফারুকের মুখ থেকে এ কথা শোনেন অ্যান্টনি ম্যাসকারেনহ্যাস। ম্যাসকারেনহাস কিছুকাল পরে জিয়ার সাক্ষাৎকার উপলক্ষে যখন এ কথা তাঁকে মনে করিয়ে দেন, জিয়া তখন 'হ্যাঁ' অথবা 'না'—কিছুই বলেননি। (অ্যান্টনি, ১৯৮৬)

এর অর্থ: দেশের রাষ্ট্রপতিতে হত্যা করার ষড়যন্ত্র হচ্ছে সেনাবাহিনীর ভেতরে—এ কথা হত্যাকাণ্ডের প্রায় পাঁচ মাস আগে থেকেই জিয়া জানতেন। কিন্তু সেনাপ্রধান অথবা রাষ্ট্রপতি—কাউকেই তিনি এ কথা জানাননি। তাঁর সততার জন্যে জিয়া সেনাবাহিনীতে বেশ জনপ্রিয় ছিলেন। মিলিটারি অ্যাকাডেমি থেকে পাশ-করা তাঁর বহু ভক্ত ছাত্রও ছিলেন সেনাবাহিনীতে। যোদ্ধা হিশেবেও তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। কিন্তু তিনি যে এই ষড়যন্ত্রের কথা সেনাপ্রধান অথবা রাষ্ট্রপতিতে জানাননি, সেটা তাঁর পবিত্র দায়িত্ব পালনের ব্যর্থতা। এর আর-একটা অর্থ হতে পারে: তিনিও চাইছিলেন যে শেখ মুজিবকে হত্যা করা হোক, কিন্তু

নিজে এ কাজে যুক্ত হয়ে কোনো বিপদে পড়তে চাননি। সুতরাং অন্যদের উৎসাহ না-দেন, অন্তত নীরব সম্মতি দিয়েছিলেন। সে দিক দিয়ে বিচার করলে মুজিব-হত্যার পরোক্ষ দায় তিনি এড়াতে পারেন না।

ফারুকের হিশেবে এই হত্যার জন্যে দরকার ছিলো ৮০০ জওয়ান এবং কর্মকর্তার। তারা কেউ রক্ষী বাহিনী, সেনাবাহিনী এবং বিডিআরকে সম্ভাব্য প্রতিরোধ ঠেকাবে, কেউ ঘাতকের কাজ করবে। তার ল্যান্সার বাহিনীতে নিজের ট্রেনিং-দেওয়া বাধ্যগত তেমন সেনাসদস্য তার ছিলো। কিন্তু কেবল ট্যাঙ্ক বাহিনী দিয়ে যুদ্ধ করা যায় না। তার জন্যে পদাতিক বাহিনীও দরকার। অতি বিশ্বস্ত পদাতিক বাহিনীর একাধিক কম্যান্ডারের সঙ্গেও ফারুক কৌশলে কথাবার্তা বললেও কার্যকালে কেউই তাকে সাহায্য করতে আসেনি। নিজের ল্যান্সারদেরই ব্যবহার করতে হয়েছিলো পদাতিক বাহিনীর মতো। শেষ পর্যন্ত দলে তার ছিলো মাত্র শ চারেক লোক। (অ্যান্টনি, ১৯৮৬)

ওদিকে, শেখ মুজিব যে কোনো খবরই পাননি, তা নয়। উড়ো খবর তিনি পাচ্ছিলেন যে, সেনাবাহিনীতে ভেতরে ভেতরে ষড়যন্ত্র চলছিলো। কিন্তু এই ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করার জন্যে তিনি কোনো সত্যিকার কার্যকর ব্যবস্থা নেননি। তিনি যে গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলোতে হয় অযোগ্য, নয় বিশ্বাসঘাতক এবং দালালদের বসিয়েছিলেন, তাঁরা কেউই তাঁকে রক্ষা করতে পারেননি। তাঁকে ভারত এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের দূতাবাস থেকে নাকি সতর্ক করা হয়েছিলো। কিন্তু তিনি তা গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেননি। শোনা যায়, হত্যার কদিন আগে মণি সিংহও নাকি তাঁকে সতর্ক করেছিলেন।

অসামান্য সাহস এবং আত্মবিশ্বাস ছিলো মুজিবের। জনগণকে তিনি ভালোবাসতেন এবং বিশ্বাস করতেন। তিনি কল্পনাও করতে পারেননি যে, বাঙালিরা তাঁকে খুন করতে পারে। কিন্তু জনগণের চোখে তাঁর পুরোনো ভাবমূর্তি যে হারিয়ে গিয়েছিলো, মোশায়েব-ঘেরা অবস্থায় তিনি তা টের পাননি। আগেই বলেছি, এই মোশায়েবদের তিনি তাঁর চক্ষু-কর্ণে পরিণত করেছিলেন। এঁরা সবাই 'হুজুর হুজুর' করে প্রিয় হওয়ার প্রত্যাশায় চাটুকারিতা করেছেন কিন্তু তাঁর কাছে সত্য কথা প্রকাশ করেননি। জনগণ থেকে তিনি আসলে সরে গিয়েছিলেন অনেক দূরে। উপলব্ধিই করতে পারেননি যে, এক সময়ে তিনি যে-জনপ্রিয়তার চূড়ায় বসেছিলেন, সেই তলে তলে সেই চূড়াটি ভেঙে পড়েছিলো।

তাঁর এই ভ্রান্ত ধারণা, তাঁর পতনের জন্যে দায়ী। একদিকে, তিনি নিজের রাজনৈতিক ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী এবং নিরঙ্কুশ করার উদ্দেশ্যে গণতন্ত্র বিসর্জন দিয়ে একদলীয় শাসন প্রবর্তন করেছিলেন। নিহত হওয়ার দিন তাঁর যাওয়ার কথা ছিলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। শোনা যায়, সেখানে তাঁকে আজীবন রাষ্ট্রপতি থাকার

অনুরোধ করার প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিলো। মোট কথা, তিনি ক্ষমতাকে মজবুত করার জন্যে সব আয়োজনই করেছিলেন। কিন্তু সরলতার কারণে নিজের নিরাপত্তার কোনো ব্যবস্থা করেননি। তিনি বঙ্গভবনে বাস করলে সেখানে তাঁর যে-রক্ষা ব্যবস্থা থাকতো, ধানমন্ডিতে ছিলো তার অংশ মাত্র। তাঁর গার্ড বাহিনী কিছুক্ষণের জন্যে প্রতিরোধ দিতে সমর্থ হলেও, হয়তো সাহায্য এসে পৌঁছাতো। বস্তুত, তাঁর অদূরদর্শিতা তাঁর পতনের কারণ হয়েছিলো। মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম এক সাক্ষাৎকারে আমাকে বলেছেন যে, দেখা করতে গিয়ে তিনি নাকি একবার জাতির জনককে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তিনি বঙ্গভবনে থাকেন না কেন। তার উত্তরে মুজিব বলেন যে, একদিন তিনি ক্ষমতায় না-থাকলে তাঁর তো থাকতে হবে নিজের বাড়িতেই। তাই বঙ্গভবনের বিলাসিতায় তিনি অভ্যস্ত হতে চান না। (সাক্ষাৎকার, ২৮. ৯. ২০০৯) এটা নিতান্ত সাধারণত মানুষের সরল ভাষণ, একনায়ক হতে অভিলাষী রাজনীতিকের কথা নয়।

ওদিকে, ফারুক যা করেছিলো, তাকে তুলনা করা যায় জুয়ো খেলার সঙ্গে। এই নিষ্করুণ হত্যাকাণ্ড ঘটাতে গিয়ে সে ব্যবহার করেছিলো ২৮টি ট্যাংক। কিন্তু একটা ট্যাংকেও কোনো গোলা ছিলো না। সম্বলের মধ্যে ছিলো কয়েকটা কামান আর মেশিন গান। সেরেফ ধোঁকা দিয়ে বীর বাঙালিদের ঠকিয়ে ছিলো সে। ট্যাংক দেখে রক্ষী বাহিনী থেকে আরম্ভ করে জাতির পিতার নিজস্ব প্রহরী বাহিনী—সবাই ভড়কে গিয়েছিলো। আচরণ করেছিলো কাপুরুষের মতো। অথচ ট্যাংক নিয়ে সংসদ-সড়কের পথে যাওয়ার সময় সে এলাকায় যুদ্ধের উর্দি-পরা রক্ষী বাহিনীর তিন হাজার সদস্য কুচকাওয়াজ করছিলো। কিন্তু ট্যাংক তাদের স্তব্ধ এবং স্তম্ভিত করে দিয়েছিলো। ট্যাংকে নয়, সত্যিকার খুনীরা এগিয়ে যায় ট্রাকে আর জীপে করে। তাদের লক্ষ্য : শেখ মুজিব, শেখ মণি আর আবদুর রব সেরনিয়াবাতের বাসভবন। এ ছাড়া, অন্য জওয়ানরা কামান নিয়ে অবস্থান নেয় ধানমন্ডি, কলাবাগান, মিরপুর রোড আর নিউমার্কেটের কাছে। এসব জায়গায় ট্যাংক মোতায়েন করা হয় শক্তির প্রতীক হিশেবে। একটা কামান দিয়ে ৩২ নম্বর বাড়ির ওপরে সাত/আটটি গোলা ছুঁড়েছিলো মহিউদ্দীন। তার মধ্যে একটি গোলা গিয়ে পড়েছিলো মোহাম্মদপুরের শেরশাহ শুরি রোডের ৮ ও ৯ নম্বর বাড়িতে। এখানে দুই পরিবারের ১৪ জন নিহত হন। (*প্রথম আলো*, ১৯. ১১. ২০০৯)

গোলার শব্দেই ঘুম ভেঙেছিলো শেখ মুজিবের। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ফোন করেন, রক্ষী বাহিনীর প্রধানকে। তারপর ফোন করেন সেনাপ্রধান সফিউল্লাহ এবং নিজের মিলিটারি সেক্রেটারি ব্রিগেডিয়ার হককে। সফিউল্লাহ তাঁকে অর্থহীন আশ্বাস দেন। জিজ্ঞেস করেন, তিনি কোনোমতে বাড়ি থেকে পালাতে পারেন কিনা। মুজিব শেষে ফোন করেন সামরিক গোয়েন্দা বাহিনীর কর্নেল জামিলকে। সঙ্গে সঙ্গে জামিল নিজের গাড়িতে করে ছুটে যান ৩২ নম্বরের দিকে। কিন্তু পথে তিনি নিহত হন

ফারুকের বাহিনীর হাতে। ঐ পর্যন্ত। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে বাঁচাতে গিয়ে অন্য কোনো বাঙালি নিজের প্রাণ দেয়নি।

বাড়ির প্রবেশ পথে তেমন কোনো বাধা ছিলো না। কারণ, রক্ষীরা ছিলো আর্টিলারির। তাদের বলা হয় যে, এটা সামরিক বাহিনীরই অভ্যুত্থান। কালো উর্দি পরা নিজেদের ল্যান্সার বাহিনীর সহকর্মীদের দেখে তারা পথ ছেড়ে দিয়েছিলো। তারা বাড়িতে ঢোকে সওয়া পাঁচটার দিকে। অন্যতম পাহারাদার হাবিলদার কুদ্দুস সিকদারের আদালতে দেওয়া সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে, বাড়িতে প্রথম ঢোকে বজলুল হুদা আর নূর। সঙ্গে আরও কয়েকজন। মুজিব তাদের প্রধান লক্ষ্য হলেও, বাড়িতে ঢুকেই সামনে দেখতে পায় শেখ কামালকে। সঙ্গে সঙ্গে বজলুল হুদা স্টেনগান দিয়ে তাঁকে গুলি করে। শেখ কামাল বারান্দা থেকে ছিটকে গিয়ে অভ্যর্থনা-কক্ষের মধ্যে পড়ে যান। সেখানে তাঁকে আবার গুলি করে হত্যা করা হয়। (*প্রথম আলো*, ১৯. ১১. ০৯) কিন্তু অ্যান্টনি ম্যাসকারেনহ্যাসের বিবরণে বলা হয় যে, ঘাতকরা বাড়ির ওপর হামলা চালালে পুলিশ এবং ব্যক্তিগত প্রহরীদের সঙ্গে তাদের কিছু গোলাগুলির বিনিময় হয় তাদের। এমন কি, কামাল নিজে স্টেনগান দিয়ে ঘাতকদের বাধা দিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি তাদের একজনকে হত্যা এবং দুজনকে খানিকটা আহত করতে পেরেছিলেন মাত্র। (অ্যান্টনি, ১৯৮৬) ম্যাসকারেনহ্যাস বিবরণ পেয়েছিলেন প্রধান ষড়যন্ত্রকারী, ফারুকের কাছ থেকে। সুতরাং তাঁর বিবরণ ঠিক নয় বলেই মনে করি। কিন্তু হাবিলদার কুদ্দুস এবং মুজিবের আবাসিক ব্যক্তিগত সহকারী এবং হত্যা-মামলার বাদী মহিতুল ইসলামের প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যের মধ্যে মিল আছে। এবং মনে হয়, তাঁরাই ঠিক বলেছেন।

শেখ কামাল নিহত হওয়ার পর মহিউদ্দীন এবং তার সঙ্গীরা বাড়ির ভেতরে ঢুকে মুজিবকে খুঁজতে থাকে প্রতিটা কক্ষে। শেষে তাঁর দেখা মিললো সামনের ব্যালকনিতে। সাহসের প্রতিমূর্তি মুজিব দাঁড়িয়ে আছেন প্রশান্তভাবে, হাতে পাইপ। তাঁকে দেখে খুনি মহিউদ্দীন পর্যন্ত ভড়কে যায়। সে তাঁকে গুলি করতে পারেনি। কেবল বলে, 'স্যার, আপনে আসেন!' শেষে যখন তাঁকে ধরে সিঁড়ি দিয়ে নামাতে আরম্ভ করে, তখন তিনি চিৎকার করে বলেন, 'তোরা আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস?' ওদিকে, মহিউদ্দীনকে এক পাশে সরতে বলে হুদা আর নূর স্টেনগান দিয়ে গুলি করে রাষ্ট্রপতির ওপর। ভোর পাঁচটা চল্লিশে মুখ থুবড়ে বঙ্গবন্ধু লুটিয়ে পড়েন সিঁড়িতেই। তখনো তাঁর ডান হাতে ধরা পাইপ। কয়েকটা গুলি তাঁর বুকের ডান দিকে এবং পেটে লেগেছিলো। ফলে যখন সূর্য ওঠার কথা, সেই সূর্য ওঠার সময় 'বঙ্গের গৌরব-রবি গেলা অস্তাচলে।'

এর পর মহিউদ্দীন, হুদা এবং নূর তাদের লোকজন নিয়ে বাড়ির বাইরে চলে যায়। কিন্তু ঘাতকদের মিশন তখনো পুরো হয়নি। সেটা পূরণ করতে কিছুক্ষণ পরে ল্যান্সার আর আর্টিলারির সেনাদের নিয়ে আসে আজিজ পাশা আর

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু, নিহত মুজিব পড়ে আছেন সিঁড়ির ওপর

মুসলেমউদ্দীন। পাশা তার সঙ্গীদের নিয়ে দোতলায় যায়। আগে থেকেই সেখানে ছিলো সুবেদার ওয়াহাব জোয়ারদার। তারা গিয়ে প্রধান শোবার ঘরের দরজার ওপর গুলি করে। তখন দরজা খুলে দেন বেগম মুজিব। সেখান থেকে ঘাতকরা রাসেল, শেখ নাসের এবং বাড়ির এক ভৃত্যকে নিচে নিয়ে যায়। বেগম মুজিবকে

সিঁড়ি পর্যন্ত আনলে তিনি স্বামীর লাশ দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন। তখন তাঁকে আবার নিয়ে যাওয়া হয় শোবার ঘরে। সেখানে তাঁকে, জামালকে এবং কামাল ও জামালের সদ্য বিবাহিতা স্ত্রীদের স্টেনগানের গুলি দিয়ে হত্যা করে পাশা আর মুসলেমউদ্দীন। কামাল আর জামালের স্ত্রীদের তখনো তাঁদের হাত থেকে মুছে যায়নি বিয়ের মেহেদী।

নিচে নিয়ে ঘাতকরা রাসেলকে প্রথমে বসিয়ে রেখেছিলো গেইটের পাশে পাহারাদারের চৌকিতে। তাকে হত্যা করা হবে কিনা, সম্ভবত সে সিদ্ধান্ত তারা তখনও নিতে পারেনি। ফারুক ইত্যাদির হুকুম শুনতে চেয়েছিলো। ওদিকে, মায়ের কাছে যাবে বলে রাসেল তখন কাঁদছিলো। পাশা একজন হাবিলদারকে তখন হুকুম দেয় রাসেলকে তার মায়ের কাছে নিয়ে যেতে। সেই হাবিলদার সত্যি সত্যি তাকে মায়ের কাছেই পাঠিয়েছিলো দোতলায় নিয়ে গিয়ে, একবারে কাছ থেকে গুলি করে। তার মাথার একটা অংশ উড়ে গিয়েছিলো।

হাতের মধ্যে পেয়েও মুজিব-পরিবারের ওপর এমন 'বীরত্ব' ফলাতে পারেনি বর্বর পাকসেনারাও। কিন্তু মুজিব নিজে যে-দেশকে স্বাধীন করেছিলেন, সেই দেশের হৃদয়হীন সেপাইরা তাঁর সমগ্র পরিবারকে নির্মমভাবে হত্যা করে সেই অকল্পনীয় 'বীরত্ব' দেখাতে পেরেছিলো। এবং এভাবেই মোশতাক, ফারুক আর রশিদের ষড়যন্ত্র সূর্যের আলো দেখে। ডালিম আর নূরের প্রতিশোধ নেওয়া চরিতার্থ হয়। যা আশ্চর্য, তা হলো: এই নির্মম খুনিরা ঘটনাচক্রে সবাই এক সময়ে ছিলো মুক্তিযোদ্ধা।

বঙ্গবন্ধুর মৃতদেহটাকেও ন্যূনতম সম্মান দেখায়নি খুনিরা। খুনিদের একজন তাঁকে কোনো দিন কাছ থেকে দেখেনি। একটু ভালো করে দেখার জন্যে সে বুট দিয়ে দেহটাকে উল্টে দিয়েছিলো। চার ঘণ্টা পরে সেই অবস্থাতে সরকারী ফটোগ্রাফার এসে তাঁর ছবি তুলেছিলো। (অ্যান্টনি, ১৯৮৬) তারপর লাশ সেখানে পড়ে থেকে পচতে থাকে।

পরের দিন বেলা দশটার পর এসে সেপাইরা তাঁর মৃতদেহ নিয়ে যায় বিমানবন্দরে। সেখান থেকে হেলিকপ্টারে করে রাজধানী থেকে বহু দূরে—টুঙ্গিপাড়ায়। যাতে তাঁর কবরও কোনো কালে রাজধানীর লোকদের কাছে তাঁর কথা মনে করিয়ে না-দেয়। যাতে সে কবর লোকেদের উদ্বুদ্ধ করতে না-পারে। যেমন এখন একটি রাজনৈতিক দলের সমর্থকদের করে জিয়াউর রহমানের কবর। মৃত মুজিবও তাড়িয়ে বেড়িয়েছেন ঘাতকদের। যে-মুজিবকে ইয়াহিয়ার ঘাতক সৈন্যরাও খুন করতে সাহস পায়নি অথবা তিনবার কবর খুঁড়েও সাহস পায়নি ফাঁসি দিতে, সেই মুজিবই নিহত হলেন তাঁর নিজের দেশের কিছু ষড়যন্ত্রকারী এবং ঘাতকের হাতে। আর সেই কাপুরুষদের কীর্তি দেখে স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে থাকলেন তাঁর মন্ত্রীরা, তাঁর স্বজনরা, তাঁর মোশায়েবরা, এমন কি, তাঁর

সেনাপতিরা। থ হয়ে গেলেন, কিন্তু কেউ কাঁদলেন না। তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ—কেউ প্রতিবাদ করলেন না। তাঁর সাধের বাংলাদেশের কোথাও না। এই বাঙালিরা একদিন কী করে পাকসেনাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন, ভাবলে অবাক হতে হয়।

খুনিদের অন্য দুটি দল সওয়া পাঁচটায় পৌঁছে গিয়েছিলো ধানমন্ডির আর-একটি সড়কে—শেখ মণির বাড়িতে; আর মিন্টো রোডে আবদুর রব সেরনিয়াবাতের বাড়িতে। সেখানেও একই রকমের তাণ্ডব ঘটায় তারা। কেবল মণি আর সেরনিয়াবাতকে তারা হত্যা করেনি। নির্বিচারে এরা হত্যা করে তাঁদের পরিবারের যাকে সামনে পায়, তাঁকেই। সেরনিয়াবাতের স্ত্রী, পুত্রবধূ এবং এক কন্যা গুলিতে গুরুতরভাবে আহত হলেও শেষ পর্যন্ত বেঁচেছিলেন। কিন্তু নিহত হয়েছিলো বালিকা কন্যা, এগারো বছরের পুত্র এবং পাঁচ বছরের পৌত্র। আর, মণিকে কেবল নয়, তাঁর গর্ভবতী স্ত্রীকেও ঘাতকরা মেরে ফেলেছিলো। মুজিব-পরিবারের বেঁচে যান কেবল হাসিনা আর রেহানা—দেশের বাইরে থাকার জন্যে।

মুজিব-পরবর্তী অরাজকতা

জাতির জনক শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার অল্প পরেই ট্যাংকের বহর নিয়ে ফারুক এবং তার চেলারা ফিরে যায় সেনাছাউনিতে। আর, মণি এবং তাঁর স্ত্রীকে হত্যা করে ডালিম যায় সোজা বেতার-ভবনে। সেখান থেকে সে বারবার ঘোষণা করে যে, শেখ মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে এবং সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করেছে খন্দকার মোশতাকের অধীনে। সারা দেশে সামরিক আইন জারি করার ঘোষণাও দেয় সে। আরও ঘোষণা করে যে, অতঃপর বাংলাদেশের নাম হবে 'ইসলামিক রিপাবলিক অব বাংলাদেশ'। (সে কথা বিশ্বাস করে সৌদী আরব সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছিলো। চীনও স্বীকৃতি দিয়েছিলো অল্পদিনের মধ্যে।)

যে-মেজররা ষড়যন্ত্র এবং হত্যা করেছিলো, তারা সেনাবাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ছিলো না। তারা জানতো যে, 'মহা বীরত্ব' দেখালেও দেশ শাসনের ক্ষমতা তাদের ছিলো না। তারা তাই ক্ষমতা গ্রহণের জন্যে শিখণ্ডী হিশেবে খাড়া করেছিলো মোশতাককে। আগে থেকেই মোশতাকের সঙ্গে একাধিক বার বৈঠক করে মেজররা তৈরি করেছিলো তাদের ষড়যন্ত্রের নীলনকশা।

মুজিব-হত্যার প্রধান নায়ক ফারুক হলেও, হত্যার পরবর্তী রাজনীতির নায়ক ছিলো তার ভায়রা, খন্দকার রশিদ। মুজিব হত্যার খবর নিয়ে সে-ই যায় মোশতাকের বাড়িতে। সেখান থেকে তাঁকে নিয়ে যায় বেতার-ভবনে। কিন্তু মোশতাক জানতেন, ক্ষমতা দখল করা একটা ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। তাই বেতারে কিছু বলার আগেই তিনি শর্ত দিয়েছিলেন, তিন বাহিনীর প্রধানরা আনুগত্য স্বীকার করলে, তবেই তিনি রাষ্ট্রপতি হওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। এর পর রশিদ গেলো সেনাছাউনিতে, সেনাপতিদের রাজি করাতে। রাজি করাতে তার আদৌ বেগ পেতে হয়নি।

ঢাকা ব্রিগেডের কম্যান্ডার ছিলেন শাফায়াত জামিল। তিনি লিখেছেন, সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের পরিচালক লে. কর্নেল সালাউদ্দীন আদালতে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে, তিনি সেনাপ্রধান সফিউল্লাহকে বিদ্রোহের খবর দিয়েছিলেন ভোর সাড়ে চারটায়। কিন্তু এই বিদ্রোহ দমন করার কোনো উদ্যোগ সেনাপ্রধান তখনই নেননি। এমন কি, সওয়া পাঁচটার পরে শেখ মুজিব যখন তাঁকে ফোন করে সাহায্য পাঠাতে অনুরোধ করেন, তখনো তিনি কথা বলেছিলেন বিভিন্ন ইউনিট-কম্যান্ডারের সঙ্গে, কিন্তু বিদ্রোহ দমন করার জন্যে জামিল অথবা অন্য কোনো কম্যান্ডারকে নির্দেশ দেননি। রশিদ অন্য দুজন সেনা কর্মকর্তাকে নিয়ে জামিলের বাসায় হাজির হলে তবেই জামিল জানতে পান যে, শেখ মুজিবকে মেরে ফেলেছে তারা। এবং তারা ক্ষমতা গ্রহণ করেছে মোশতাকের অধীনে। জামিলকে রশিদ এই বলে হুঁশিয়ার করে দেয় যে, তিনি কোনো পাল্টা ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা করলে গৃহযুদ্ধ হতে পারে। এর ঠিক পরে সফিউল্লাহ ফোন করেন জামিলকে। বিধ্বস্ত কণ্ঠে তিনি জামিলকে জানান যে, বঙ্গবন্ধুর বাড়ির ওপর কারা যেন গোলাগুলি করেছে এবং বঙ্গবন্ধু সাহায্য চেয়েছেন। বোঝা যায়, মুজিব নিহত হওয়ার বেশ কিছুক্ষণ পরের ঘটনা এটা। কারণ, ছটার পরে বেতারে ডালিমের ঘোষণা শুনে রশিদ গিয়েছিলো মোশতাকের বাড়িতে। সেখান থেকে মোশতাককে নিয়ে যায় বেতার-ভবনে। (অ্যান্টনি, ১৯৮৬) বেতার-ভবনে মোশতাকের শর্ত শোনার পর আসে সেনাছাউনিতে। ঘণ্টাখানেকের কমে এতোসব ঘটার কথা নয়। তারপরে সফিউল্লাহ ফোন করেন জামিলকে। (জামিল, ২০০৯)

সফিউল্লাহর ফোনের উত্তরে জামিল জানান যে, বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে মোশতাকের অধীনে ক্ষমতা দখল করেছে সেনাবাহিনী। তারপর ব্রিগেড দপ্তরের দিকে যাওয়ার পথে তিনি যান জিয়ার বাড়িতে। জিয়া তখন দাড়ি কামাচ্ছিলেন। মুজিব হত্যার খবর শুনে তিনি বিচলিত হননি। বরং ঠান্ডা গলায় বলেছিলেন, 'রাষ্ট্রপতি যখন নেই, তখন উপ-রাষ্ট্রপতি তো আছেন! আপনার সৈন্যদের প্রস্তুত থাকতে বলুন। আমরা সংবিধান রক্ষা করবো।' (জামিল, ২০০৯)

কিন্তু রশিদ এসে যখন সেনাপ্রধানদের হুকুম করলো বেতার-ভবনে যাওয়া জন্যে, তখন জিয়া এবং তাঁর ওপরওয়ালা—কেউই আর সংবিধান রক্ষা করার কথা ভাবেননি। কথায় বলে, চাচা আপন বাঁচা! প্রত্যেকেই বিশৃঙ্খল সৈন্যদের ভয়ে কুঁকড়ে গিয়েছিলেন। সৈন্যদের এই বিশৃঙ্খলা মেনে নেওয়ার ফল অবশ্য ভালো হয়নি। সফিউল্লাহকে তাঁর পদ থেকে মেজররা সরিয়ে দেয় মাত্র ন দিন পরেই। আর নভেম্বর মাসে জিয়ার ক্ষমতা দখলের পর অন্তত বিশটি অভ্যুত্থান হয়েছিলো তাঁর জীবদ্দশাতেই। অর্থাৎ গড়ে প্রতি তিন মাস দশ দিনে একটি করে অভ্যুত্থানের চেষ্টা অথবা বিদ্রোহ হয়েছিলো। যে-সেনাবাহিনীর প্রধান আদর্শই হলো শৃঙ্খলা আর ওপরওয়ালার হুকুম পালন করা, একবার শৃঙ্খলা ভঙ্গের প্রশ্রয় দিলে, তাকে

আবার ফিরিয়ে আনা অসম্ভব না-হলেও, দারুণ কঠিন হয়ে পড়ে। বাংলাদেশের সেনাবাহিনী এবং বিডিআর-এর মধ্যে এই শৃঙ্খলা ভঙ্গের উদাহরণ তৈরি হয়েছিলো '৭৫-এর আগেই। এবং তা চলতে থাকে বহু বছর ধরে।

মোশতাকের শর্ত পূরণ করার উদ্দেশ্যে আধ-ঘন্টার মধ্যেই রশিদ তিন বাহিনীর প্রধানদের বেতার-ভবনে নিয়ে হাজির করেছিলো—স্থল বাহিনীর সফিউল্লাহ, বিমানবাহিনীর এ কে খোন্দকার আর নৌবাহিনীর মোশাররফ হোসেন খান। আর বাড়তি নিয়ে গিয়েছিলো জিয়াকে। এঁরা সবাই 'বীর উত্তম'। কিন্তু বীরত্ব দেখানো তো দূরের কথা, রাষ্ট্রপতিকে হত্যার একটা প্রতিবাদ পর্যন্ত করলেন না। গোলা-শূন্য ট্যাংক আর দুই মেজরের ভয়ে বাধ্যগত ছেলের মতো মোশতাকের আনুগত্য স্বীকার করে নিলেন—যদিও মোশতাক বৈধ রাষ্ট্রপতি কেন, উপ-রাষ্ট্রপতিও ছিলেন না। এবং সেনাবাহিনীও অভ্যুত্থান ঘটায়নি। তিন বাহিনীর প্রধান এবং জিয়া এতো সিনিয়র হয়েও, স্বল্পসংখ্যক অবাধ্য জুনিয়র অফিসারকে শাসন করতে ব্যর্থ হন। এভাবেই ভেঙে পড়ে চেইন অব কম্যান্ড।

সেনাবাহিনীর সবচেয়ে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের আনুগত্য ঘোষণা করার পর, নিশ্চিন্ত মনে মোশতাক ক্ষমতা গ্রহণ করলেন। বেতারে ভাষণ দিলেন রাষ্ট্রপতি হিশেবে। বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী তাঁর রাষ্ট্রপতি হওয়ার সঙ্গত কোনো কারণই ছিলো না। কারণ, রাষ্ট্রপতি না-থাকলে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করবেন উপ-রাষ্ট্রপতি। উপ-রাষ্ট্রপতি না-থাকলে, সে দায়িত্ব পালন করবেন সংসদের স্পীকার। মোশতাক-এর কোনোটাই ছিলেন না। মোট কথা, তাঁকে বেআইনিভাবে ক্ষমতায় বসিয়েছিলো কয়েকজন মেজর—সমগ্র সেনাবাহিনী নয়। অথবা তিনি বেআইনিভাবে ক্ষমতায় বসেছিলেন মেজরদের কাঁধে চড়ে।

১৫ তারিখেই মোশতাক মন্ত্রিসভা গঠন করলেন। তখনো মুজিবের মৃতদেহ সমাহিত হয়নি—তখনো তা পড়েছিলো ধানমন্ডির বাড়িতে। অগস্টের ভ্যাপসা গরমে তাঁর লাশে পচন ধরেছিলো। সেই অবস্থায় মন্ত্রীদল জুটে গেলো। এইচ টি ইমাম ফোন করে এই মন্ত্রীদের জড়ো করেন শপথ গ্রহণের জন্যে। নতুন মুখ এলো কিছু। কিন্তু শেখ মুজিবের বিশ্বস্ত মন্ত্রীরাও এসে যোগ দিলেন মন্ত্রিসভায়—সাবেক রাষ্ট্রপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, এ আর মল্লিক, ফণি মজুমদার—সবাই। কদিন পরে ওসমানীও যোগ দিলেন উপদেষ্টা হিশেবে। যে-অজ্ঞাত লোকটিকে মুজিব স্পীকার এবং রাষ্ট্রপতির আসন দিয়েছিলেন, সেই মোহাম্মদউল্লাহ এসে মোশতাকের উপরাষ্ট্রপতি হলেন। সেনাপ্রধানদের মতো তাঁরাও সবাই ভালো ছেলে।

এক ধরনের শাসন-কাঠামো গড়ে তোলার পর মোশতাক পেছন থেকে দুর্বুদ্ধি জোগালেও, সত্যিকার দেশ চালাতে থাকে ফারুক আর রশিদ। সেনাছাউনির বদলে তারা থাকতেও আরম্ভ করেছিলো বঙ্গভবনের নিরাপদ আশ্রয়ে। আর,

বঙ্গভবন এবং সোহরাওয়ার্দী উদ্যান-সহ রণকৌশলগত জায়গায় তারা মোতায়েন করেছিলো তাদের ট্যাংক বাহিনী। তবে পার্থক্য এই যে, ততোদিনে ট্যাংকগুলো আর গোলাশূন্য ছিলো না। সেনাপ্রধানের হুকুমে গোলা আনা হয়েছিলো গাজীপুরের অস্ত্র কারখানা থেকে। (জামিল, ২০০৯) মোশতাকের মন্ত্রিসভা থেকে বাদ পড়েছিলেন মোশতাকের সেই পুরোনো শত্রুরা—তাজউদ্দীন, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মনসুর আলী আর কামরুজ্জামান। পাছে এঁদের কেউ তাঁর বিরুদ্ধে সম্ভাব্য আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন, সেটা ঠেকানোর জন্যে মোশতাক আগে থেকেই তাঁদের গ্রেফতার করান। গ্রেফতার করান আবদুস সামাদ আজাদকে—যাঁকে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তাঁর পরিবর্তে পররাষ্ট্রমন্ত্রী করা হয়েছিলো। সব মিলে ২৬ জনকে গ্রেফতার করেছিলেন মোশতাক। ডালিমও অবিলম্বে প্রতিশোধ নিয়েছিলো গাজী গোলাম মোস্তফার বিরুদ্ধে।

মোশতাকের কিছু আপত্তি ছিলো। কিন্তু ফারুক আর রশিদের পীড়াপীড়িতে জিয়াউর রহমানকে নিয়োগ করা হয় সেনাপ্রধানের পদে। ফারুক-রশিদের জিয়া-প্রীতির কারণ জানা যায় না। হতে পারে জিয়া তাদের নীরব আশীর্বাদ দিয়েছিলেন বলে। তা ছাড়া, আর-একটা কারণ হয়তো এই যে, এরা দুজনই ছিলো মিলিটারি অ্যাকাডেমিতে জিয়ার পুরোনো ছাত্র। 'সুবোধ বালক' সফিউল্লাহকে করা হলো পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ওএসডি। পরে রাষ্ট্রদূত। কিন্তু জিয়াকে সেনাপ্রধান করলেও, তাঁকে পুরোপুরি প্রাধান্য দেওয়া হলো না। জিয়াকে ক্ষমতা দিতে মোশতাকের ঠিক ভরসা হয়নি, কারণ জিয়া যে উচ্চাভিলাষী, সে কথা অতিধূর্ত মোশতাক ভালো করেই জানতেন। তাই জিয়ার ওপরে বসানো হলো পাকিস্তান-ফেরত খলিলুর রহমানকে। তাঁর জন্যে নতুন পদ তৈরি করা হলো—চীফ অব ডিফেন্স স্টাফ। খলিলের ওপরে বসানো হলো মুক্তিযুদ্ধের সময়কার সেনাপতি জেনারেল ওসমানীকে। তিনি হলেন রাষ্ট্রপতির সামরিক উপদেষ্টা। মোশতাকের মতো বিশ্বাসঘাতকের সঙ্গে হাত মেলাতে ওসমানীর মুহূর্ত মাত্র দেরি অথবা দ্বিধা হয়নি।

জিয়ার সহকারী হিশেবে মোশতাক নিয়োগ করেন হুসেইন মুহম্মদ এরশাদকে। এরশাদ তখন ছিলেন দিল্লিতে একটা ট্রেনিং-এর জন্যে। এবং তাঁর র‍্যাঙ্ক ছিলো ব্রিগেডিয়ারের। ট্রেনিং-এ থাকার সময়ে কারও পদোন্নতি হওয়ার কথা নয়। কিন্তু সিনিয়রিটি ভেঙে ডাবল প্রমোশন দিয়ে তাঁকে মেজর জেনারেল করে সেনাবাহিনীর উপ-প্রধান পদে নিযুক্ত করা হয়। তাঁর থেকে সিনিয়র ছিলেন মাশহুরুল হক, চিত্তরঞ্জন দত্ত এবং কাজী গোলাম দস্তগীর। ওদিকে, মোশতাকের প্রতি বিমান বাহিনীর প্রধান এ কে খন্দকার আগেই আনুগত্য ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু মোশতাক তাঁকেও সরিয়ে দিলেন। ঠিক করলেন, পাকিস্তান বিমানবাহিনীর সাবেক কর্মকর্তা তোয়াবকে নিয়ে আসবেন তাঁর জায়গায়। তোয়াব তখন জার্মেনিতে এক

ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা। রশিদ জার্মেনিতে গিয়ে তাঁকে রাজি করিয়ে নিয়ে আসে বাংলাদেশের বিমান বাহিনীর প্রধান হওয়ার জন্যে।

সামরিক ফ্রন্ট গুছিয়ে নেওয়ার করার পর, মোশতাক দৃষ্টি দিলেন প্রশাসনিক কাঠামোর দিকে। '৭১-এ মুক্তিযুদ্ধের সময়ে অধিকৃত বাংলাদেশের চীফ সেক্রেটারি ছিলেন শফিউল আজম। মোশতাক তাঁকে নিয়ে আসেন পাকিস্তান থেকে। তাঁকে করা হলো ক্যাবিনেট সেক্রেটারি। নিয়ে আসা হলো '৭১-এর স্বরাষ্ট্র সচিব সালাহউদ্দীনকে। তাঁকে করা হলো স্বরাষ্ট্র সচিব। পাকিস্তানের গোয়েন্দা বাহিনীর সাবেক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা সাফদারকে পাকিস্তান থেকে নিয়ে এসে করা হলো জাতীয় নিরাপত্তা বাহিনী—এনএসআই-এর প্রধান। পাকিস্তানের পররাষ্ট্র দপ্তরের সাবেক কর্মকর্তা তবারক হোসেনকে মোশতাক নিয়োগ করলেন তাঁর পররাষ্ট্র সচিব হিশেবে। আর, পাকিস্তানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক—সম্ভব হলে কনফেডারেশন গড়ার প্রস্তাব নিয়ে পীর মহসিন আলি দুদু মিয়াকে পাঠালেন পাকিস্তানে, বিশেষ দূত হিশেবে। অন্যদিক থেকে ভুট্টো লন্ডনে আলোচনার জন্যে পাঠান মাহমুদ আলিকে—যে-মাহমুদ আলি ৫০-এর দশকের গোড়ায় পূর্ববাংলায় ধর্মনিরপেক্ষ দল গঠন করেছিলেন। (অ্যান্টনি, ১৯৮৬) বাংলাদেশকে পাকিস্তানের অংশ করার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সব রকমের প্রস্তুতি নিলেন এদিকে মোশতাক, ওদিকে ভুট্টো।

এই অবৈধ সরকারকে প্রবীণ রাজনীতিকরা অনেকেই সমর্থন জানিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে মওলানা ভাসানীর নাম সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। তিনি কখনো মুজিবকে নিজের পুত্র বলে অভিহিত করেছেন; কখনো পাকিস্তানকে আসলামামু আলাইকুম বলেছেন; কখনো ইন্দিরা গান্ধীর কাছে ভারত-বাংলাদেশ কনফেডারেশন গড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন; কখনো আসামে স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্যে জমি চেয়েছেন ইন্দিরা গান্ধীর কাছে। (ফ্র্যান্ডা, ১৯৮২) কিন্তু এবারে সম্ভবত বাংলাদেশ যে 'হিন্দুস্থানের' দিক থেকে সরে এসে পশ্চিম-মুখী হলো, তার জন্যেই তাকে স্বাগত জানালেন।

মোশতাক ক্ষমতায় ছিলেন মাত্র ৮২ দিন। এরই মধ্যে দেশকে পাকিস্তানীকরণের দিকে এগিয়ে নেওয়া ছাড়া তাঁর সবচেয়ে বড়ো দুটি 'কীর্তি' হলো—জেলে চার নেতাকে খুন করা এবং ১৫ই অগস্টের খুনিদের বিচার করা যাবে না—এই মর্মে ইনডেমনিটি অর্থাৎ দায়মুক্তির অধ্যাদেশ জারি করা। এ অধ্যাদেশ তিনি জারি করেন ২৬শে সেপ্টেম্বর। ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জারি করেছিলেন, তাঁকে যারা রাষ্ট্রপতি করেছিলো—সেই মেজরদের গলা বাঁচানোর জন্যে। মোশতাক জেলে নির্মম হত্যাকাণ্ড ঘটান ৩রা নভেম্বর ভোর রাতে। এটা তিনি ঘটিয়েছিলেন, তাঁর সম্ভাব্য প্রতিপক্ষকে ধুয়ে-মুছে ফেলার উদ্দেশ্যে।

দায়মুক্তি অধ্যাদেশে বলা হয় যে, ১৫ই অগস্ট সামরিক বাহিনীর লোকেদের

হাতে যেসব আইন-বহির্ভূত ঘটনা ঘটেছে, তার বিরুদ্ধে কোনো আইনী ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না—কোনো আদালতেই। অর্থাৎ শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে সেনাবাহিনীর অধঃস্তন সদস্যরা রাষ্ট্রপতিসহ অতোগুলো লোককে মেরে ফেলার যে-গুরুতর অপরাধ ঘটিয়েছে, বেসামরিক অথবা সামরিক আদালতে তার কোনো বিচার হতে পারবে না।

মোশতাক রাষ্ট্রপতির পদ থেকে সরে যেতে বাধ্য হন ৬ই নভেম্বর। তারপর ক্ষমতা লাভ করেন বিচারপতি আবু সাদত সায়েম। তবে আসল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয় জিয়াউর রহমানের হাতে। জিয়া ইচ্ছে করলে বিদ্রোহী মেজরদের বিচার করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। কেবল তাই নয়, তাদের অপরাধের পুরস্কারস্বরূপ তিনি তাদের বিদেশী দূতাবাসগুলোতে চাকরি দিয়েছিলেন। এই বিদ্রোহীদের পদোন্নতিও হয়েছিলো। এখানেই শেষ নয়, তিনি ইনডেমনিটি অধ্যাদেশটি পুনর্বহাল করেন। বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী যে-কোনো অধ্যাদেশ জারি করার এক মাসের মধ্যে তা সংসদকে দিয়ে পাশ করিয়ে নিতে হয়। ২৬শে সেপ্টেম্বরের অধ্যাদেশ ২৬শে অক্টোবর মোশতাকের আমলেই বাতিল হয়ে গিয়েছিলো। সুতরাং জিয়া ন্যায় বিচারক হলে, রশিদ, ফারুক ও ডালিম যখন পরের বছর দেশে ফিরে আসে তাঁর বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান ঘটানোর উদ্দেশ্যে, তখনই তাদের গ্রেফতার করে বিচার করতে পারতেন। তার বদলে, ১৯৭৭ সালের ২৩শে এপ্রিল তিনি নতুন একটি অধ্যাদেশ জারি করে মোশতাকের ইনডেমনিটি অধ্যাদেশটি পুনর্বহাল করেন। (গাজীউল হক, ২০০০) এখানেই শেষ নয়, ১৯৭৯ সালের নির্বাচনে জয়ী হয়ে তিনি এই দায়মুক্তি অধ্যাদেশকে রীতিমতো সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করেন। এভাবে অপরাধীর বিচার না-করে তিনি ভালো দৃষ্টান্ত স্থাপন করেননি। সে কারণেই হয়তো তাঁর আমলে বারবার অভ্যুত্থানের প্রয়াস চলে। এমন কি, তিনি নিহতও হন এমনি একটি অভ্যুত্থানে।

মোশতাক জেল-হত্যার পরিকল্পনা করেছিলেন কেবল ফারুক আর রশিদকে নিয়ে। তিনি ঠিক করেছিলেন যে, কোনো পাল্টা অভ্যুত্থান ঘটলে কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক তাজউদ্দীন, নজরুল ইসলাম, মনসুর আলী আর কামরুজ্জামানকে হত্যা করা হবে। যাতে নতুন সরকার গঠিত হলেও এই নেতারা তাতে নেতৃত্ব দিতে না-পারেন। খালেদ মোশাররফ দোসরা নভেম্বর ভোর রাতে অর্থাৎ তেসরা খুব ভোরে অভ্যুত্থান ঘটান শাফায়াত জামিলের সহায়তা নিয়ে। বিমান বাহিনীও তাঁদের সহায়তা দেয়। খালেদ অথবা জামিল—এঁরা কেউই রাজনীতির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন না। ছিলেন নিবেদিত-প্রাণ মুক্তিযোদ্ধা এবং পেশাদার সৈনিক। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিলো মেজরদের স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ করে সেনাবাহিনীতে শৃঙ্খলা এবং চেইন অব কম্যান্ড ফিরিয়ে আনা। ১৫ই অগস্টের অকল্পনীয় অপরাধের তদন্ত করে তার বিচার নিশ্চিত করাও ছিলো তাঁদের একটি

লক্ষ্য। ফারুক আর রশিদের ট্যাঙ্ক বাহিনী থাকা সত্ত্বেও, এই অভ্যুত্থান করতে তাঁদের বেশি বেগ পেতে হয়নি।

এই অভ্যুত্থান শুরু হয়েছিলো রাত দুটোয়। এটা টের পেয়েই ফারুক আর রশিদ একটি ঘাতক দল পাঠায় ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে। এর নেতৃত্ব দেয় মুসলেমউদ্দীন—এর আগে যে-ঘাতক সেরনিয়াবাত এবং তারপর শেখ মুজিবের বাড়িতে পাইকারি হত্যাকাণ্ড চালিয়েছিলো পরিবারের সদস্যদের ওপর। এই ঘাতক দলের একমাত্র মিশন ছিলো তাজউদ্দীন ও নজরুল ইসলাম-সহ চার নেতাকে হত্যা করা।

সেখানে ঢোকার পথে জেল কর্তৃপক্ষ তাদের বাধা দেয়। কারণ বাইরের অস্ত্রধারীদের জেলে প্রবেশ পুরোপুরি বেআইনি। এ নিয়ে সেখানে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাদের সঙ্গে বচসা হয়। তারপর ঘাতক বাহিনী তাদের নির্দেশদাতাদেব সঙ্গে বঙ্গভবনে টেলিফোনে যোগাযোগ করে। এর পর তাদের ঢুকতে দেওয়ার নির্দেশ আসে সর্বোচ্চ মহল থেকে। (তালুকদার, ১৯৯১) জেলের এক কক্ষে থাকতেন তাজউদ্দীন আর নজরুল ইসলাম। পাশের কক্ষে মনসুর আলী আর কামরুজ্জামান। ঘাতকরা তাঁদের সবাইকে তাজউদ্দীনের কক্ষে একত্রিত করে। তারপর সেখানেই তাঁদের গুলি করে এবং বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করা হয়। তাজউদ্দীন কিছুক্ষণ বেঁচে ছিলেন। কিন্তু অন্য তিনজন মারা যান প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। রাত চারটায় টেলিফোনে ডিআইজি খবরটা জানান মোশতাককে। ডিআইজিকে মোশতাক কী নির্দেশ দিয়েছিলেন, জানা যায় না। কিন্তু জেলে-বন্দী চার নেতাকে হত্যার খবর সেদিন সম্ভবত বাইরে প্রকাশ পায়নি। বেশি কেউ জানতেন বলে কেউ উল্লেখ করেননি।

খালেদ মোশাররফ ক্ষমতা নিয়েছিলেন ঠিকই। কিন্তু নিজের উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন না। এমন কি, ক্ষমতা পুরোপুরি ব্যবহার করার ব্যাপারেও দোটানায় ছিলেন। তিনি যে অভ্যুত্থান ঘটিয়েছেন, অথবা ক্ষমতা দখল করেছেন, তা জানিয়ে বেতারেও তিনি কোনো ভাষণ দেননি। তিনি বলেছিলেন যে, প্রেসিডেন্ট সে কাজ করবেন। সে জন্যে তিন তারিখে তিনি নিজের ক্ষমতাকে জোরদার না-করে, সারা দিন মোশতাক, ওসমানী, খলিলুর রহমান ও বিদ্রোহী মেজরদের সঙ্গে টেলিফোনে দর কষাকষি করেন। সন্ধ্যের সময় আলাপ-আলোচনার জন্যে একটি দলকে পাঠান বঙ্গভবনে। তখনো তিনি বিশ্বাসঘাতক মোশতাককে প্রেসিডেন্ট পদে থাকার অনুরোধ জানান। আর, মেজরদের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত রফা হয় এই বলে যে, তাদের নিরাপদে ব্যাংককে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হবে। রাত এগারোটায় একটি ফকার ফ্রেন্ডশিপ বিমানে করে ফারুক, রশিদ এবং তাদের অনুচরেরা ঢাকা ত্যাগ করে। তখনো অভ্যুত্থানের অন্যতম নায়ক শাফায়াত জামিল জানতে পারেননি যে, জেলে চার নেতাকে এমন মর্মান্তিকভাবে

হত্যা করা হয়েছে। তিনি এ খবর শুনতে পান পরের দিন সকালবেলায়। তিনি লিখেছেন যে, জানলে তিনি কিছুতেই খুনিদের ছেড়ে দিতেন না। (জামিল, ২০০৯) ফারুকদের সঙ্গে মোশতাক, জিয়া এবং বিমান বাহিনীর তোয়াবও দেশ ছাড়তে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের যাবার অনুমতি দেননি খালেদ মোশাররফ। (ফ্র্যান্ডা, ১৯৮২)

৫ তারিখে খালেদ মোশাররফ প্রায় সারাদিন বঙ্গভবনে সমস্যার সমাধান করার ব্যাপারে আলাপ-আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু শাফায়াত জামিল তরুণ কিছু অফিসারকে নিয়ে উত্তেজিতভাবে বঙ্গভবনে ঢুকে পড়েন। মন্ত্রিসভা-চলতে থাকার সময়েই সেই কক্ষে ঢোকেন তাঁরা। তিনি মোশতাককে বলেন যে, তাঁর পদত্যাগ করতে হবে এবং প্রেসিডেন্ট হবেন প্রধান বিচারপতি। মোশতাক ভয় পেয়ে রাজি হয়েছিলেন। সরে যাওয়ার আগে মোশতাককে দিয়ে দুটি বিষয়ে সম্মতি আদায় করা হয়—একটি হলো জিয়াউর রহমানের পদত্যাগপত্র গ্রহণ এবং অন্যটি হলো খালেদ মোশাররফকে পদোন্নতি দিয়ে সেনাপ্রধান নিয়োগ করা। হাইকোর্টের বিচারপতির নেতৃত্বে জেলহত্যার তদন্ত করার সিদ্ধান্তও গৃহীত হয় এখানে। তারপর মোশতাক থাকেন গৃহবন্দী হয়ে। পরের দিন প্রধান বিচারপতি আবু সাদত মোহাম্মদ সায়েম রাষ্ট্রপতি হতে রাজি হন। সেদিনই রাতে তিনি বেতার ভাষণ দিয়ে জাতিকে জানান সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে।

ওদিকে, দেশে একটা অভ্যুত্থান ঘটেছে একজন প্রধান মুক্তিযোদ্ধার অধীনে, এ কথা শোনার পর ৪ তারিখে একটি শোক মিছিল বের হয়েছিলো। এটি শেষ হয় ৩২ নম্বরে গিয়ে। এ ছাড়া, এদিন অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয় তাজউদ্দীন-সহ চার নেতার স্মরণে। এই মিছিলকে জনগণ দেখে আওয়ামী লীগপন্থী বলে। আওয়ামী লীগপন্থীই ছিলো হয়তো। এই মিছিলে খালেদ মোশাররফের মা এবং ভাই অংশ নিয়েছিলেন। পত্রিকায় তাঁদের ছবিও ছাপা হয়। এ থেকে অনেকেই ভেবেছিলেন যে, খালেদ মোশাররফ আওয়ামী-পন্থী এবং এই অভ্যুত্থান ঘটানো হয়েছে ভারতের সহায়তা নিয়ে। ফলে ভারত-ভীতি আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। কিন্তু খালেদ আওয়ামীপন্থী অথবা ভারতপন্থী—এর কোনোটাই ছিলেন না।

ওদিকে, নতুন প্রশাসন কাঠামো যখন মোটামুটি একটা আকার নিতে যাচ্ছিলো, তখন সৈন্যদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা এবং ভারত-ভীতিকে কাজে লাগান জাসদের নেতারা। এতে নেতৃত্ব দেন সিরাজুল আলম খান আর অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল আবু তাহের। এঁরা ১৯৭৪ সালেই জাসদের সমাজতান্ত্রিক আদর্শ দিয়ে সেনাবাহিনীর মধ্যে 'বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা' নামে একটি সংগঠন তৈরি করেছিলেন। তাঁদের ইচ্ছা ছিলো বাংলাদেশের সেনাবাহিনী ব্রিটিশ অথবা পাকিস্তানী সৈন্যদের মতো হবে না—হবে চীনা গণবাহিনীর মতো। সেই সংস্থার পক্ষে তেসরা নভেম্বরের পর দিন থেকে সৈন্যদের মধ্যে নানা দাবির স্লোগান তুলে একটি পোস্টার ছড়িয়ে দেওয়া

হয়। এই কাজে বিশেষ ভূমিকা ছিলো সেনাবাহিনীর জওয়ানদের। ('গণহত্যা' ডকুমেন্টারিতে আবদুল হাই মজুমদারের সাক্ষাৎকার) এই পোস্টারে ছিলো বারো দফা দাবি। যেমন, যাঁদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই, এমন রাজবন্দীদের মুক্তি দিতে হবে; সৈন্যদের মধ্যে এতো র‍্যাঙ্ক থাকবে না; বেতন বাড়াতে হবে; থাকা ও খাওয়ার উন্নতি করতে হবে ইত্যাদি। আর সবচেয়ে জনপ্রিয় দাবি ছিলো ব্যাটম্যান প্রথা লোপ। ব্যাটম্যানদের কর্মকর্তারা ব্যবহার করতেন, বলতে গেলে, তাঁদের নিজেদের ভৃত্যের মতো। এ কাজটাকে নিম্নপদস্থ সৈনিকরা খুবই ঘৃণা করতেন। সুতরাং তাঁদের বিভিন্ন দাবিদাওয়া সংবলিত এই পোস্টার তাঁদের আকৃষ্ট এবং উত্তেজিত করে।

এ ছাড়া, ডানপন্থী দলগুলোও (সম্ভবত মুসলিম লীগ) 'বিপ্লবী গণবাহিনী' নাম দিয়ে একটি পোস্টার প্রচার করে বলে দাবি করেছেন ম্যাসকারেনহ্যাস। (অ্যান্টনি, ১৯৮৬) ডানপন্থীদের এই পোস্টারে সৈনিকদের দাবিদাওয়া ছাড়াও, খালেদ মোশাররফ যে ভারতের দালাল, এটা খুব জোরের সঙ্গে বলা হয়। এই ডান ও বামের মিলন সৈন্যদের মধ্যে বিভ্রান্তি এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে।

বিশেষ করে তাহের এবং সিরাজুল আলম খান যে সেনাবাহিনীতে রাতারাতি সাম্যবাদ চালু করতে চান, তা সাধারণ সৈন্যদের মধ্যে খুব অনুকূল সাড়া তুলেছিলো। এ ব্যাপারে তাঁদের, বিশেষ করে তাহেরের, ব্যক্তিগত প্রভাব এবং আকর্ষণও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলো। সৈন্য বাহিনীতে আবুদল হাই মজুমদার-সহ তাঁর বহু অনুগত সদস্য ছিলেন। তাঁর প্রচারকে তাঁরা আক্ষরিকভাবে বিশ্বাস করেছিলেন। বস্তুত, চকিতে দেশের মধ্যে দুধ এবং মধুর নহর বয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখেন তাঁরা। তাঁরা প্রায় সবাই স্লোগান তোলেন—'সেপাই সেপাই ভাই ভাই, অফিসারদের রক্ত চাই।' তাঁরা সর্বোচ্চ অফিসার চান সুবেদার। ব্যস, তার ওপর কিছু নেই।

এদিকে খালেদ তাঁর অভ্যুত্থানের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন। কেবল শাফায়াত জামিলের বাহিনী নিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন না তিনি। তাই তাঁর দীর্ঘ দিনের অনুগত দশম ও পঞ্চদশ রেজিমেন্টকে তিনি রংপুর থেকে ঢাকায় ডেকে পাঠান। আর-একটি রেজিমেন্ট ডেকে পাঠান কুমিল্লা থেকে। যদিও এটি শেষ পর্যন্ত আসেনি। ৫ তারিখে রংপুরের সৈন্যরা ঢাকায় আসতে আরম্ভ করে। এতে ঢাকার সাধারণ সৈন্যরা আশঙ্কিত হয়। কারণ তারা জানতো যে, খালেদ এবং শাফায়াত জামিল—দুজনই বেশ শক্ত হাতে শৃঙ্খলা রক্ষায় অভ্যস্ত। সুতরাং ১৫ই অগস্ট এবং তার পরবর্তী বিশৃঙ্খলার জন্যে যারা দায়ী, তাঁরা তাদের কঠোরভাবে দমন করতে পারেন।

ছ তারিখ রাতের বেলা সাধারণ সৈন্যরা তাঁদের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে আসে এবং বিশৃঙ্খলভাবে গুলি ছুঁড়তে আরম্ভ করে। এই সৈন্যদের মধ্যে ফারুক আর

রশিদের অনুগত ল্যান্সার ও দ্বিতীয় ফিল্ড আর্টিলারির জওয়ানরাও ছিলো। সৈন্যদের সবার মুখে দুই শ্লোগান—'সেপাই সেপাই ভাই ভাই, অফিসারের রক্ত চাই।' আর, 'সুবেদারের উপরে অফিসার নাই।' তবে তাহের জানতেন যে, সেনাবাহিনীর মধ্যে একজন সিনিয়র অফিসার দরকার, যাঁকে সামনে রেখে এই বিদ্রোহ সফল করতে হবে। এ জন্যে তিনি বেছে নেন গৃহবন্দী বিপদগ্রস্ত জিয়াউর রহমানকে। তাঁর সঙ্গে তাহেরের পাঁচ তারিখেই টেলিফোনে সংক্ষিপ্ত আলাপ হয়েছিলো। জিয়া তাঁকে মুক্ত করার জন্যে তাহেরকে অনুরোধও করেছিলেন। শাফায়াত জামিলের সেনারা যখন জিয়াকে দু তারিখ ভোর রাতে গৃহবন্দী করে, তখন কেবল বসার ঘরের টেলিফোনের লাইন বিচ্ছিন্ন করেছিলো। কিন্তু তাদের জানা ছিলো না যে, এই টেলিফোনের আসল যোগাযোগ ছিলো শোবার ঘরে। সেখান থেকে বেগম জিয়া সবাইকে খবর দিয়েছিলেন। (অ্যান্টনি, ১৯৮৬) বঙ্গভবনকে তো বটেই। অন্য ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং হিতাকাঙ্ক্ষীদেরও।

ছ তারিখ ভোর রাতে জিয়াকে মুক্ত করতে যায় ফারুকের ল্যান্সার বাহিনীর একটি দল। এর মধ্যে ছিলো সেই ল্যান্সার মহিউদ্দীন, শেখ মুজিবকে হত্যার জন্যে পনেরোই অগস্ট ভোর বেলায় যার ছিলো একটা সক্রিয় ভূমিকা। তারা জিয়াকে মুক্ত করে নিয়ে আসে রশিদের দুই নম্বর আর্টিলারি রেজিমেন্টের দপ্তরে। জিয়া সেখানে এসে তাঁর অনুগত কয়েকজন অফিসারকে নিয়ে আসার অনুরোধ জানান। এঁদের মধ্যে ছিলেন মীর শওকত আলি, আবদুর রহমান আর আমিনুল হক। ওদিকে, জওয়ানরা রাত দেড়টায় গিয়ে হাজির হয়েছিলো বেতার ভবনে। বেতার ভবনে মোশতাকও গিয়েছিলেন—ঘোলা পানিতে মাছ ধরার জন্যে। কিন্তু পাত্তা পাননি। ৭ তারিখ দলে দলে জনগণও রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। উচ্ছ্বসিত, উল্লসিত জওয়ানদের উৎসবে শরিক হয় তারা। তাদের শ্লোগান ছিলো: সিপাহী বিপ্লব জিন্দাবাদ, জিয়াউর রহমান জিন্দাবাদ, আর বাংলাদেশ জিন্দাবাদ। তিন দিন ধরে ভারত-ভীতিতে তারা কুঁকড়ে গিয়েছিলো। খালেদের পরাজয়ে তারা নিশ্চিন্ত হলো যে, ভারত তা হলে বাংলাদেশ দখল করছে না।

জিয়াউর রহমানের আনন্দ ছিলো দুই কারণে—এক. তিনি খালেদের সম্ভাব্য হামলা থেকে বেঁচে গেছেন; আর দুই. নিজে চেষ্টা না-করেই পেয়ে গেছেন সেই বস্তু, যা ছিলো তাঁর কাছে সবচেয়ে কাম্য—ক্ষমতা। সদ্যনিযুক্ত রাষ্ট্রপতির সঙ্গে কথা না-বলেই তিনি যান বেতারে ভাষণ দিতে। '৭১-এর ২৭শে মার্চের মতোই সংক্ষিপ্ত ঘোষণা দিয়ে তিনি বলেন যে, সেনাবাহিনীর অনুরোধে তিনি প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্ব গ্রহণ করছেন। '৭১-এর ২৭শে মার্চ তিনি প্রথমে নিজেকে রাষ্ট্রপতি হিশেবে ঘোষণা করেছিলেন। পরে শুধরে নিয়েছিলেন। এবারেও তিনি নিজেকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিশেবে ঘোষণা করেন। পরে উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হয়েছিলেন। আসলে, তিনি ছিলেন

উচ্চাভিলাষী। তাঁর একমাত্র প্যাশন ছিলো সর্বোচ্চ ক্ষমতার শীর্ষে আসন নেওয়ার। তাঁর রাজনৈতিক অভিলাষও ছিলো। তার একটি ছোটো কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ প্রমাণ দিতে পারি। বাকশাল গঠিত হওয়ার পর, তাকে তিনি স্বাগত জানিয়েছিলেন। এমন কি, প্রতিটি জেলার বাকশাল প্রশাসককে অভিনন্দন জানিয়ে চিঠি লিখেছিলেন। (আবু সাইয়িদ, ১৯৮৮) একজন পেশাদার সৈনিক হিশেবে তাঁর রাজনৈতিক জনসংযোগ রাখার অথবা বাকশালের মতো একটি রাজনৈতিক পদক্ষেপকে অভিনন্দন জানানো কিংবা সমালোচনা করার কথা নয়।

ওদিকে, বঙ্গভবনে যখন সিপাহী বিদ্রোহের খবর পৌঁছায়, তখন বিমান ও নৌবাহিনীর প্রধানদের সঙ্গে খালেদ এবং শাফায়াত জামিলের বৈঠক হচ্ছিলো—পরের দিন সরকার গঠিত হলে কার কী মর্যাদা থাকবে সে বিষয়ে। তারই মধ্যে এই খবর পেয়ে খালেদ তাঁর দুই অনুগত অফিসার—কর্নেল হুদা আর লেফটেনেন্ট কর্নেল হায়দারকে নিয়ে বঙ্গভবন ত্যাগ করেন। নিজের গাড়িতে করে তাঁরা যাত্রা করেন মিরপুর রোড ধরে। তাঁরা কোথায় যাচ্ছিলেন, জানা যায় না। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পথে তাঁদের গাড়ি অচল হয়ে যায়। তখন তাঁরা রাত কাটাতে বাধ্য হন শেরে বাংলা নগরে অবস্থিত দশম বেঙ্গল রেজিমেন্টের সদর দপ্তরে। তারপর সকালে ফারুক আর রশিদের অনুগত ল্যান্সার ও আর্টিলারি বাহিনী আসে দশম রেজিমেন্টকে বিপ্লবে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানাতে। দশম বাহিনী তখন তথাকথিত বিপ্লব—অর্থাৎ বিশৃঙ্খলার যোগ দেয়। এবং তার প্রথম শিকারই হন তিন খ্যাতনামা মুক্তিযোদ্ধা—খালেদ (বীর উত্তম), কে এন হুদা (বীর উত্তম) আর এটিএম হায়দার (বীর বিক্রম)। তাঁরা তখন বসেছিলেন দশম বাহিনীর সদর দপ্তরে। দুজন কম্পেনি-কম্যান্ডার—আসাদ এবং জলিল—তাঁদের একেবারে কাছ থেকে গুলি করে হত্যা করে। (অ্যান্টনি, ১৯৮৬) এ ছাড়া, উচ্ছৃঙ্খল জওয়ানরা একজন মহিলা ডাক্তারসহ ১৩ জন সেনা-অফিসারকেও হত্যা করে। এমন কি, হত্যা করে একজন অফিসারের স্ত্রীকেও। (অ্যান্টনি, ১৯৮৬)

শাফায়াত জামিল বিদ্রোহের খবর পেয়েও থেকে গিয়েছিলেন বঙ্গভবনে। কিন্তু যখন বিদ্রোহী সেনারা বঙ্গভবনের কাছাকাছি পৌঁছে যায় স্লোগান দিতে দিতে, তখন তিনি সঙ্গীদের নিয়ে পেছনের দিকের দেওয়াল টপকে পালান। নামতে গিয়ে তাঁর পা ভেঙে যায়। সে অবস্থাতেই কাছে-থাকা একটি সামরিক যানে করে তাঁরা পালিয়ে যান। তিনি নৌকোয় করে পালাতে গেলে ভাগ্যচক্রে ধরা পড়েন এবং শেষ পর্যন্ত ঢাকায় আসতে বাধ্য হন। সৌভাগ্যক্রমে ততক্ষণে এক ধরনের শৃঙ্খলা ফিরে এসেছিলো। তাই তিনি নিহত হননি। তাঁর জায়গা হয় সামরিক হাসপাতালে। (জামিল, ২০০৯)

খালেদের অভ্যুত্থান ব্যর্থ হওয়ার কয়েকটি কারণ সহজেই চোখে পড়ে। প্রথমত, তাঁর রাজনৈতিক অনভিজ্ঞতা। তিনি ছিলেন পেশাদার সৈন্য। কূটনীতি

অথবা রাজনীতি বুঝতেন বলে মনে হয় না। দ্বিতীয়ত, তাঁর উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাঁর নিজেরই পরিষ্কার ধারণা ছিলো না। তৃতীয়ত, তিনি নিজের অবস্থান গুছিয়ে নেওয়ার জন্যে বড্ডো বেশি দেরি করে ফেলেছিলেন। চতুর্থত, দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁকে জনগণ বিবেচনা করে ভারতের দালাল হিশেবে। যদিও তিনি মোটেই তা ছিলেন না।

জিয়া অচিরেই নিজের অবস্থান পাকাপোক্ত করা˜ ব্যবস্থা নিতে থাকেন। তাহেরের অনুরোধে তিনি জওয়ানদের একটি সমাবেশে কোরান ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেন যে, তাঁদের কোনো কোনো দাবি মেনে নেবেন। যেমন, জলিল এবং আবদুর রব-সহ রাজবন্দীদের মুক্তি দেওয়া। যেমন, ব্যাটম্যান প্রথা লোপ। (আবদুল হাই মজুমদারের সাক্ষাৎকার, 'গণহত্যা') প্রথম দাবিটি তিনি ঠিকই মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু ক্রমে অন্যান্য দাবি মেনে নেওয়ার ব্যাপারে আগ্রহের অভাব দেখান। তাহের এবং সিরাজুল আলম খানের উস্কানি-দেওয়া এই বিপ্লব থেকে আর-কিছু অর্জিত হয়নি। তাহের এবং সিরাজুল আলম খান চেয়েছিলেন, বাংলাদেশে চীনের গণবাহিনীর মতো শ্রেণীহীন একটি সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলতে। যে-বাহিনীতে সাধারণ সৈনিকদের সঙ্গে অফিসারদের পার্থক্য হ্রাস পাবে, সৈন্যরা দেশ-গঠনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে এবং তাদের জীবনযাত্রার মান আরও উন্নত হবে। কিন্তু জিয়া বামপন্থায় বিশ্বাসী ছিলেন না, বরং বিশ্বাসী ছিলেন সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলায়। তাঁর সৈন্যরা অফিসারদের নির্দেশ মতো চলবে না, এটা মানতে তিনি আদৌ তৈরি ছিলেন না। তিনি ক্ষমতায় বসার কদিনের মধ্যেই—১০/১১ তারিখের মধ্যেই তাহের এবং তাঁর অনুগতরা এটা বুঝতে পারেন। তখন তাঁরা নতুন করে বিপ্লব করার আহ্বান জানিয়ে পোস্টার দেন সেনাবাহিনীর জওয়ানদের মধ্যে। কেবল তাই নয়, তাঁরা ২৪শে নভেম্বর একটা পাল্টা-অভ্যুত্থানেরও পরিকল্পনা করেন। (জিল্লুর, ১৯৮৪) কিন্তু জিয়া তা কঠোরভাবে দমন করেন। ২৩/২৪ তারিখে তিনি তাহের এবং জাসদের অন্য নেতাদের গ্রেফতার করেন। তাহেরকে মুক্ত করার জন্যে ২৬ তারিখ ভারতীয় হাই কমিশনার সমর সেনকে অপহরণ করার ব্যর্থ চেষ্টা করেন তাহেরের ভাই।

ম্যাসকারেনহ্যাস সিপাহী বিদ্রোহ ব্যর্থ হওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, এই বিদ্রোহ ব্যর্থ হওয়ার কারণ বাঙালি চরিত্রেই নিহিত ছিলো। বাঙালিরা মধ্যপথের পথিক। বিশেষ করে ধর্ম ও রাজনীতির ক্ষেত্রে তারা কট্টর ডান অথবা বাঁয়ে যেতে চায় না। জাসদের কট্টর বাম অবস্থান তাদের সমর্থন পায়নি। বরং জাসদের নেতাদের ঘাড়ে ভর করে ক্ষমতার মঞ্চে এলেও, তিন সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যে জাসদের নেতারাই জিয়ার আদেশে গ্রেফতার হন। এবং কয়েক মাস পরে '৭৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে তাঁদের বিচারও অনুষ্ঠিত হয়। বিচার না-বলে, তাকে অবিচার বলাই শ্রেয়। বিশেষ করে যেভাবে তাহেরকে

ফাঁসিতে ঝোলানো হয়। (আনোয়ার কবিরের ডকুমেন্টারি 'গণহত্যা'য় এই বিচারের জীবন্ত পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে।)

জিয়াকে বন্দী দশা থেকে উদ্ধার করলেও, তাহেরকে জিয়া পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারেননি। তাহেরের রাজনৈতিক আদর্শ এবং সেনাবাহিনীর কাছে জনপ্রিয়তা—কোনোটাই তিনি ভালো চোখে দেখতেন না। তা ছাড়া, একজন পেশাদার সৈনিক হিশেবে তিনি এটা ভালো করেই জানতেন যে, সৈন্যবাহিনীতে উচ্ছৃঙ্খতা অথবা 'সাম্য' থাকতে পারে না। কাজেই তিনি তাহের এবং জাসদের অন্য নেতাদের কয়েকজনের বিচার করেন। বিচার করতে বাধ্য হন। তাহের এবং এই নেতাদের এগারোজন সেনাবাহিনীর সদস্য ছিলেন না। সেদিক দিয়ে তাঁদের বিচার হওয়ার কথা বেসামরিক আদালতে। কিন্তু জিয়া তাঁদের বিচারের নির্দেশ দেন তাঁরই গঠিত সামরিক আদালতে। এই বিচার হয় ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে—রুদ্ধ কক্ষে। তাহেরের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ ছিলো এই যে, তিনি বৈধভাবে প্রতিষ্ঠিত সরকারকে উৎখাত করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু আর যাই হোক, এই অভিযোগ সত্য ছিলো না। কারণ, ৬ই নভেম্বর মোশতাক অথবা সায়েমের অধীনে যে-সরকার ছিলো, তা আদৌ বৈধ ছিলো না। এঁরা দুজনই ক্ষমতায় বসেছিলেন সম্পূর্ণ বেআইনি পথে।

এই দ্রুত বিচার আদালতের প্রধান বিচারক ছিলেন পাকিস্তান-ফেরত একজন কর্নেল—মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি তাঁর বিদ্বেষ ছিলো সবার জানা। অন্য সদস্যরাও সবাই ছিলেন পাকিস্তান থেকে ফিরে আসা এবং মুক্তিযোদ্ধা-বিরোধী গোষ্ঠীর সদস্য। ফলে অভিযোগ ভিত্তিহীন হলেও, বিচারে আসামীদের শাস্তি হয়। অন্যদের বিভিন্ন মেয়াদের জেল হলেও, তাহেরের হয় প্রাণদণ্ড—১৭ই জুলাই। এর পরে নিয়মমতো বিচারের সমীক্ষা এবং প্রাণ ভিক্ষা চাওয়ার জন্যে তাঁর কিছু দিন সময় পাওয়ার কথা। কিন্তু তাও দেওয়া হয়নি। রাষ্ট্রপতি তাঁর প্রাণভিক্ষার আবেদন নাকচ করেন ২০শে জুলাই। তারপর ঐ দিন রাতেই তড়িঘড়ি করে তাঁর ফাঁসির আদেশ কার্যকর করা হয়। জিনিভা চুক্তি অনুসারে, পঙ্গুদের ফাঁসি দেওয়া হয় না। কিন্তু তাহের পঙ্গু হলেও, তা বিবেচনা করা হয়নি। কারণ ছলে বলে কলে কৌশলে—যেভাবেই হোক, তাঁকে মেরে ফেলাই ছিলো জিয়ার ঐকান্তিক ইচ্ছা।

'প্রথম বাংলাদেশ, শেষ বাংলাদেশ'

সায়েম ক্ষমতায় বসেই ঘোষণা করেছিলেন যে, ছ মাসের মধ্যে দেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু জিয়াউর রহমান '৭৬ সালের মে মাসে সায়েমকে এই নির্বাচন বাতিল করতে বাধ্য করেন। তারপর নিজেই সর্বোচ্চ ক্ষমতা গ্রহণের পথে এগিয়ে যান দ্রুত গতিতে। পরের বছর ২১শে এপ্রিল তিনি সায়েমকে বাধ্য করেন পদত্যাগ করতে। সায়েম নিজে লিখেছেন যে, তাঁকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করানোর জন্যে জিয়া কয়েকজন জেনারেল পাঠান বঙ্গভবনে। তিনি তাতে সঙ্গে সঙ্গেই রাজি হয়ে যান। (সায়েম, ১৯৯৮) কেবল তাই নয়, তিনি সায়েমকে বাধ্য করেন রাষ্ট্রপতির পদে তাঁকে উত্তরাধিকারী হিশেবে নিয়োগ করতে। বিচারপতি হয়েও, এই অসাধারণ বেআইনি ঘোষণা দিতে সায়েম বাধ্য হন। কোনো নির্বাচন নেই, কোনো অভ্যুত্থান নেই, কোনো ঝুঁকি নেই—পৈতৃক সম্পত্তির মতো সহজেই জিয়া রাষ্ট্রপতির পদটি লাভ করলেন। শেক্সপীয়রের একটি কথা আছে, কেউ মহিমা নিয়েই জন্মগ্রহণ করেন, কেউ বা মহিমা অর্জন করেন, আর কারও কারও ওপর অন্যেরা মহিমা আরোপ করে দেন। জিয়া ছিলেন এই শেষ দলেরই ভাগ্যবান একজন। তিনি না-চাইতেই সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিলেন। '৭১-এর মার্চে স্বাধীনতার ঘোষণার মহিমা তিনি না-চাইতেই তাঁকে আরোপ করেছিলেন বেলাল মোহাম্মদ। বেলাল মোহাম্মদের অনুরোধ গ্রহণ করে বিনা চেষ্টাতেই তিনি প্রায় অমরত্ব লাভ করেন।

জিয়া যোদ্ধা হিশেবে কতোটা সফল হয়েছিলেন, বলা মুশকিল। তিনি নিজে বলেছেন যে, ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানের খেমকারানে যুদ্ধ করে প্রশংসা লাভ করেছিলেন। (জিয়াউর রহমান, ১৯৭৪) মুক্তিযুদ্ধে তিনি সেক্টর এবং জেড ফোর্সের কম্যান্ডার হিশেবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। যদিও রফিকুল ইসলামের মতে, তিনি তাঁর অঞ্চলে ভ্রান্তভাবে পরিকল্পিত একটি অভিযান করতে গিয়ে

একদিনে ৬৭ জন যোদ্ধা হারিয়েছিলেন। শাফায়াত জামিলও এই যুদ্ধের কথা লিখেছেন। গোটা মুক্তিযুদ্ধের সময়ে এ রকম ক্ষতি অন্য কোনো সেক্টরে কাউকে একটি অভিযান করতে গিয়ে দিতে হয়নি। (রফিকুল ইসলামের সাক্ষাৎকার, ২০. ৯. ২০০৯) তাঁর সৌভাগ্য, তিনি অনেক কজন বীরযোদ্ধাকে পেয়েছিলেন তাঁর বাহিনীতে। মুক্তিযুদ্ধে তাঁদের সম্মিলিত অবদান গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তাঁর সকল ব্যর্থতাকে মলিন করে দেয়, তাঁর অসামান্য একটি অবদান। সে হলো : মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা।

তিনি ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও ধূর্ত। খুব ঠান্ডা মাথায় সব সিদ্ধান্ত নিতেন। পাকিস্তানের সামরিক গোয়েন্দা বিভাগে দীর্ঘ দিন কাজ করার ফলে কোনো ঝুঁকি না-নিয়ে অন্যের কাছ থেকে কাজ আদায় করে নিতে পারতেন তিনি। নিজের সত্যিকার ইচ্ছা কাউকে বুঝতে দিতেন না। কালো চশমার আড়ালে চোখ দুটিকেও আড়াল করে রাখতেন। আর, প্রয়োজন হলে উত্তেজিত না-হয়েই কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন এবং পারতেন হুকুম দিতে। নিজের লক্ষ্য হাসিলের জন্যে পরম উপকারীকেও নির্দয়ভাবে খতম করে দিতে দ্বিধা বোধ করতেন না। নিজে দুর্নীতি না-করেও অন্যকে দুর্নীতি করার সুযোগ দিতেন। পরে তাঁদের কাজে লাগাবার উদ্দেশ্যে।

তাঁর নির্মম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা বোঝাতে গিয়ে অ্যান্টনি ম্যাসকারেনহ্যাস একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। কালুরঘাটে তাঁর ঐতিহাসিক ঘোষণা দেওয়ার পরের দিনের ঘটনা এটি। এদিন আঠারোজন অবাঙালি নারীপুরুষ কালুরঘাটের পথ দিয়ে চট্টগ্রামের দিকে যাচ্ছিলেন। তিনি তাঁর সৈন্যদের নির্দেশ দেন তাঁদের থামানোর জন্যে। তারপর যে-নির্দেশ দিলেন, তা তাঁর জওয়ানরাও প্রত্যাশা করেনি। তিনি এই অবাঙালিদের মেরে ফেলার আদেশ দিলেন। আর মেয়েদের দেখিয়ে বললেন, তোমরা এদের যা কিছু করতে পারো। (অ্যান্টনি, ১৯৮৬) বলা বাহুল্য, তিনি এ দিয়ে কী ইঙ্গিত করেছিলেন। তবে পার্থক্য এই যে, তিনি পাকিস্তানী কম্যান্ডারদের মতো নিজেও মহিলাদের ভাগ দাবি করেননি।

একবার রাষ্ট্রপতি হবার পর, তিনি আর মুজিবের মতো কোনো ফাঁক-ফোকর রাখেননি। নিজের ক্ষমতাকে নিশ্ছিদ্র করেছিলেন। এবারে তিনি কেবল প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হলেন না, সেই সঙ্গে হলেন সেনাপ্রধান এবং চীফ অব ডিফেন্স স্টাফ। অর্থাৎ একই সঙ্গে চারটি পদের অধিকারী। কিন্তু আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ততোদিনে ফৌজী রাষ্ট্রপতি হওয়াটা আর ফ্যাশনের ব্যাপার ছিলো না, যেমনটা ছিলো ষাটের দশকে। তাই আন্তর্জাতিক অনুমোদনের জন্যে তিনি '৭৭ সালের মে মাসে একটি লোক-দেখানো গণভোট গ্রহণ করেন। বলার প্রয়োজন করে না যে, এতে তিনি নিজের পক্ষে 'বিপুল ভোট' পেয়েছিলেন। বস্তুত, তিনি ভোট পেয়েছিলেন শতকরা ৯৮.৯ ভাগ।

আগে থেকে সব জায়গার কর্মকর্তাদের বলা হয়েছিলো যে, ভোটদাতার সংখ্যা যেন মোট ভোটদাতাদের শতকরা ৭০ ভাগের বেশি না-হয়। কিন্তু কর্মকর্তারা নিজেদের উৎসাহ এবং দক্ষতা প্রমাণ করে প্রচুর ভোটই দেওয়া হয়েছিলো বলে প্রমাণ করলেন। দেখালেন, এতে ভোট দিয়েছেন শতকরা ৮৮.৫ ভাগ ভোটদাতা। সুপরিকল্পিত ফলাফল। পরের বছর—'৭৮ সালের ৩রা জুন তিনি দেন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন। এতেও ফলাফলের কিছু ব্যত্যয় হলো না। ওসমানী পেলেন শতকরা ২১.৭ ভাগ ভোট। আর জিয়া শতকরা ৭৬.৭ ভাগ। (খান, ১৯৮৪) এবারের নির্বাচনে ভোটদাতাদের সংখ্যা অতো ছিলো না। কিন্তু কারচুপি হয়েছিলো নিঃসন্দেহে। মনে আছে, ভোট গ্রহণ শেষ হয়েছিলো বিকেল পাঁচটায়। আর কেরানীগঞ্জের একটি ভোটকেন্দ্রের ফলাফল বেতারে প্রচারিত হয়েছিলো সাড়ে পাঁচটার আগেই। কর্মকর্তারা তাঁদের অলৌকিক দক্ষতা দিয়েই এই অসম্ভবকে সম্ভব করেছিলেন। নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপি হয়েছিলো বলে ওসমানী অভিযোগ করেছিলেন। অন্য লেখকেরাও স্বীকার করেছিলেন যে, নির্বাচন অবাধ হয়নি।

অবাধ হয়েছিলো কিনা, তা নিয়ে বিতর্ক হতে পারে, কিন্তু যে-বিষয়ে বিতর্ক নেই, তা হলো : প্রেসিডেন্ট পদে প্রার্থী হওয়ার যোগ্যতাই তাঁর ছিলো না। '৭৮ সালের মে মাসে তিনি যখন নির্বাচনে দাঁড়ান, তখন তিনি চীফ অব আর্মি স্টাফ পদে সবেতনে চাকরি করছিলেন। চাকরিতে থাকা অবস্থায় কেউ প্রেসিডেন্ট পদ কেন, সংসদ সদস্য পদেও দাঁড়াতে পারেন না। সুতরাং তাঁর নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করাটাই ছিলো অবৈধ। পরের বছর ২৮শে এপ্রিল তারিখে তিনি নিজেকে এক বছর আগে থেকে (২৯ এপ্রিল ৭৮ থেকে) অবসরপ্রপাপ্ত বলে একটি অধ্যাদেশ জারি করেন। (অ্যান্টনি, ১৯৮৬) আইন খেলাপের বিষয়টি তিনি খেয়াল করেন প্রায় এক বছর পরে। এ জন্যে তিনি এক বছরের পেছনের তারিখ থেকে নিজেকে অবসরপ্রাপ্ত বলে ঘোষণা করেন। এটাকে আইনত অথবা ধর্মত—কোনোভাবেই ন্যায্য বলে প্রমাণ করা যায় না।

'৭৮ সালের জুন মাসে প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হয়েই তিনি বিচারপতি আবদুস সাত্তারকে ভাইস-প্রেসিডেন্ট পদে মনোনীত করেন। সাত্তারকেই তিনি দায়িত্ব দিয়েছিলেন একটি রাজনৈতিক দল গঠন করার। এই দলে আওয়ামী লীগের সত্যিকারের সমর্থকরা যোগ দেবেন না, এটা তিনি ভালো করেই জানতেন। মস্কোপন্থী ন্যাপ এবং কমিউনিস্ট পার্টি যোগ দেবে না, তাও জানা কথা। সে জন্যে তিনি হাত বাড়ান অন্যদিকে—ডানে এবং বামে। ডান দিকে তিনি মুসলিম লীগ থেকে লোক নিলেন। জামাতের দালাল বলে মার্কা-মারা লোকেরাও বাদ পড়লেন না। আর বাঁ দিকে নিলেন ভাসানীর চীনপন্থী ন্যাপকে। কট্টর বামপন্থীরা, যারা বাংলাদেশকেই মেনে নিতে রাজি ছিলেন না—তাঁদেরও

রাজনীতি করার প্রশ্রয় দিলেন। (মওদুদ, ১৯৯৫) অন্তত, তাঁরা প্রকাশ্যে তাঁদের কার্যক্রম আরম্ভ করলেও তিনি না-দেখার ভান করে থাকলেন। তাঁর দলের নাম তিনি দিলেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল। সংক্ষেপে বিএনপি। কিন্তু তিনি সেই জাতীয়তাবাদকে পতাকা হিশেবে খাড়া করলেন না, যার ছায়ায় তিনি এবং সকল মুক্তিযোদ্ধা লড়াই করেছিলেন। তাঁর জাতীয়তাবাদের তিনি নাম দিলেন 'বাংলাদেশী' জাতীয়তা।

একে-একে গণভোট, প্রেসিডেন্ট নির্বাচন, স্থানীয় পরিষদের ভোট নিয়ে জিয়ার মনে যথেষ্ট আস্থা গড়ে উঠেছিলো। এর পর তিনি পার্লামেন্টের নির্বাচন দেওয়ার পরিকল্পনা করেন। এই নির্বাচনে তিনি নেমেছিলেন তাঁর নতুন দল বিএনপিকে নিয়ে—যার বয়স তখনো এক বছর হয়নি। কিন্তু অলৌকিকভাবে এই দল পার্লামেন্টের ৩০০ আসনের মধ্যে জয়ী হলো ২০৭টি আসনে। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে এতো ভোটদাতা অংশ নিলেও, এ নির্বাচনে নাকি ভোট দিয়েছিলেন শতকরা মাত্র ৪২ ভাগ ভোটদাতা। একে অস্বাভাবিক মনে হতে পারে। বস্তুত, এ নির্বাচনেও যথেষ্ট কারচুপি হয়েছিলো বলে অনেকেই দাবি করেছেন। ফ্র্যান্ডা দৃষ্টান্ত হিশেবে উল্লেখ করেছেন, আওয়ামী লীগের প্রার্থী মেজর জেনারেল খলিলুর রহমানের নাম। তাঁকে প্রথমে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। তার দুই দিন পরে পুনরায় ভোট গণনার পরে তিনি হেরে গিয়েছেন বলে ঘোষণা করা হয়েছিলো। এর মধ্যে একবারও তাঁকে এই পুনরায় গণনার কথা জানানো হয়নি, অথবা তাঁর সম্মতিও নেওয়া হয়নি। (ফ্র্যান্ডা, ১৯৮২) প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এতো কম সময়ের মধ্যে পৃথিবীর অন্য কোনো রাজনৈতিক দল এতো 'বিপুল' সাফল্য দেখিয়েছে কিনা, সন্দেহ করি। নির্বাচনে জয়ী হয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রী করলেন মুসলিম লীগের শাহ আজিজুর রহমানকে। '৭১ সালে পাকিস্তানের পক্ষে দালালি করে জন্যে যিনি জেলে খেটেছিলেন।

যা বিস্মিত করে, তা হলো : পার্লামেন্টে এমন নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও তিনি পার্লামেন্টকে কার্যত কোনো ক্ষমতা দেননি। পার্লামেন্ট কোনো আইন পাশ করলে তা মেনে নিতে তিনি বাধ্য ছিলেন না। যে-কোনো আইনে ভিটো দেওয়ার ক্ষমতা থাকলো তাঁর। সেই ভিটোর বিরুদ্ধে পার্লামেন্ট আবার নতুন করে আইন প্রণয়ন করলে, তাও মেনে নিতে বাধ্য নন তিনি। তখন করতে হবে একটা গণভোট। সেই গণভোটে এই আইনের পক্ষে জনগণ রায় দিলে, তবেই সে আইন তিনি মেনে নিতে বাধ্য হবেন। এ ছাড়া, তিনি আরও একটি বিধান রাখলেন যে, পার্লামেন্ট যেমনই করুক না কেন, মন্ত্রীদের তিন ভাগের এক ভাগ নিয়োগ করবেন তিনি এবং তাঁদের পার্লামেন্টের সদস্য হতে হবে না। এভাবেই তিনি পার্লামেন্টকে পরিণত করে একটি ক্ষমতাহীন বিতর্ক সভায়।

পার্লামেন্টে তিনি সামরিক সদস্যদেরও নিয়ে আসেন। মন্ত্রীদের মধ্যেও

সামরিক ব্যক্তিরা ছিলেন। তা ছাড়া, তিনি নিজেই অনেকগুলো মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নিজের হাতে রেখেছিলেন। যেমন, '৭৮ সালের জুলাই মাস অবধি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ছিলো তাঁরই অধীনে। আর প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় তাঁর হাতে ছিলো তিনি নিহত না-হওয়া পর্যন্ত। নৌবাহিনীর প্রধানকে তিনি দায়িত্ব দিয়েছিলেন বিদ্যুৎ-জ্বালানী, বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের।

সংসদকে রাবার স্ট্যাম্পের মতো ব্যবহার করে মোশতাক, সায়েম এবং তিনি নিজে যতো অধ্যাদেশ জারি করেছিলেন, সেসব পাশ করিয়ে নেন। এই পার্লামেন্টকে দিয়েই তিনি সম্পূর্ণ বেআইনি এবং বাতিল হয়ে যাওয়া ইনডেমনিটি অধ্যাদেশকে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী হিশেবে পাশ করান অর্থাৎ অধ্যাদেশটিকে তিনি সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করান। অথচ বিদ্রোহী মেজররা যে তাঁর বন্ধু ছিলো, তা নয়। তারা '৭৬ সালের এপ্রিল মাসেই তোয়াবের সঙ্গে মিলে তাঁর বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করতে চেষ্টা করেছিলো। এ থেকে সন্দেহ হয়, বিদ্রোহী মেজররা তাঁর কোনো গোপন কথা জানতো কিনা, যা প্রকাশের ভয়ে জিয়া তাদের অতো খাতির করতেন। সে যাই হোক, ইনডেমনিটি অধ্যাদেশে সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদতে থাকলো। মুজিব হত্যা এবং জেল হত্যার তখন অথবা ভবিষ্যতে কোনো প্রতিকার পাওয়ার উপায় থাকলো না।

সামরিক গোয়েন্দা বিভাগে কাজ করে তিনি অন্যদের সন্দেহের চোখে দেখতেই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। বেশি লোকের ওপর তিনি ভরসা করতে পারতেন না, করেনওনি। এই কারণে, তিনি সামরিক বাহিনীকেও পুনর্গঠন করেছিলেন। নতুন সৈন্যদের দিয়ে তিনি নতুন পাঁচটি ডিভিশন তৈরি করেন। তা ছাড়া, মুক্তিযোদ্ধাদের অথবা যে-সৈন্যরা একত্রে দীর্ঘদিন কাজ করেছিলো, তাদেরও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দেন বিভিন্ন ডিভিশনে এবং বিভিন্ন জায়গায়। যে-প্রবীণ অফিসারদের তিনি গণ্য করতেন উচ্চাভিলাষী বলে, তাঁদের তিনি সরিয়ে দেন ঢাকা থেকে অনেক দূরে। যশোরে মীর শওকত আলি; কুমিল্লায় নূরউদ্দীন এবং চট্টগ্রামে মঞ্জুরকে। ঢাকায় তিনি তাঁর কাছে রাখেন যাঁকে মনে হয়েছিলো সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য এবং কম উচ্চাকাঙ্ক্ষী—হুসেইন মুহম্মদ এরশাদকে। এভাবে তিনি একটা অভ্যুত্থানের আশঙ্কা যদ্দুর সম্ভব কমিয়ে দেন। তা সত্ত্বেও তাঁর আমলে—আগেই বলেছি—বিশটিরই বেশি অভ্যুত্থান হয়েছিলো। এর মধ্যে '৭৭ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর যে-বড়ো রকমের অভ্যুত্থান হয়েছিলো, তার বিদ্রোহীরা তাঁর বাসভবনও আক্রমণ করেছিলো। কিন্তু তাঁর রক্ষীদল আক্রমণকারীদের হটিয়ে দিয়েছিলো।

একবার ফারুক-রশিদ ইত্যাদির শৃঙ্খলা ভঙ্গকে ক্ষমা করার পর জিয়া সেনাবাহিনীকে শৃঙ্খলার মধ্যে ফিরিয়ে আনতে খুবই চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু

একটা পর একটা অভ্যুত্থান সেনাবাহিনীতে হতেই থাকে। এবং প্রতিটি উত্থানের পর বহু সেনা সদস্যকে তিনি ফাঁসিতে ঝোলান। অনেককে বিনা বিচারেও পাইকারিভাবে হত্যা করে গণকবর দেওয়া হয়েছিলো। বিশেষ করে '৭৭ সালের দোসরা অক্টোবর বিমান বাহিনীর অভ্যুত্থানের পরে শত শত লোককে বিনা বিচারে অথবা সংক্ষিপ্ত বিচারে হত্যা করা হয়েছিলো। ফলে এমন অবস্থা দাঁড়ায় যে, বিমান বাহিনীতে মাত্র এগারোজন কর্মকর্তা থাকেন। তাঁদের মধ্যে বিমান চালাতে পারতেন মাত্র তিনজন। (ফ্র্যান্ডা, ১৯৮২) কারো কারো মতে, এই অভ্যুত্থান উপলক্ষে আড়াই হাজার সেনা সদস্য নিহত হয়। আনোয়ার কবিরের ডকুমেন্টারি থেকে এই অভ্যুত্থান পরবর্তী বিচার কী রকম প্রহসনে পরিণত হয়েছিলো, তার খানিকটা আঁচ করা সম্ভব।

জিয়া নিজে দারুণ পরিশ্রম করতে পারতেন। সেই কারণে দেশের একটি-দুটি নয়, ৪১৪টি থানা পরিদর্শন করেছিলেন। গ্রামের মাতবরদের মাধ্যমে তিনি সাধারণ লোকেদের সঙ্গে, বিশেষ করে যুব সম্প্রদায়ের সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন। ক্ষমতায় যাওয়ার পর মুজিব যেমন জনগণ থেকে অনেকটা দূরে সরে গিয়েছিলেন, জিয়ার ক্ষেত্রে হয়েছিলো তার উল্টোটা। সামরিক বাহিনীর লোক হিশেবে আগে তিনি ছিলেন জনগণ থেকে দূরে। কিন্তু রাজনীতিতে যোগদানের পর, তিনি জনগণের কাছাকাছি আসতে চেষ্টা করেন। তিনি যে মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছিলেন এবং মুক্তিযোদ্ধা হিশেবে বেশ সাফল্য দেখিয়েছিলেন—তা তাঁকে জনগণের কাছাকাছি যেতে সাহায্য করেছিলো। ক্রেইগ ব্যাক্সটার এবং জিল্লুর রহমান খান—দুজনেই লিখেছেন যে, মুজিব থেকে একটা ব্যাপারে তিনি ভিন্ন রকমের ছিলেন। সে হলো : মুজিব স্বজনপ্রীতি দেখিয়ে জনগণের কাছে নিজের ভাবমূর্তি ম্লান করেছিলেন। কিন্তু জিয়া স্বজনপ্রীতি না-দেখিয়ে জনগণের কাছে তাঁর নিজের ভাবমূর্তিকে আগের তুলনায় উন্নত করেছিলেন। (ব্যাক্সটার, ১৯৮৪; খান, ১৯৮৪)

কেবল স্বজনপ্রীতি করেননি, তা-ই নয়, জিয়া নিজে দুর্নীতিতে লিপ্ত ছিলেন বলেও কোনো সুনির্দিষ্ট অভিযোগ নেই। জনগণ তাঁকে সেদিক দিয়েও শ্রদ্ধা করতেন। কিন্তু তিনি অন্যদের দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিতেন। কী জন্যে দিতেন, জানা যায় না। যদিও তাঁরই দলের একজন নেতা—মওদুদ আহমদ তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থে লিখেছেন যে, জিয়া রাজনৈতিক দুর্নীতি ছাড়াও অন্য কিছু দুর্নীতির আশ্রয় নিয়েছিলেন। (মওদুদ, ২০০২)। সম্ভবত পরে তাঁদের ভয় দেখিয়ে অনুগত রাখার জন্যে। দেশে তিনি গঠন করেছিলেন হাজার হাজার 'যুব কমপ্লেক্স'। এগুলো গঠিত হয়েছিলো স্বেচ্ছাসেবকদের দিয়ে। তাদের কোনো বেতন ছিলো না। কিন্তু ছিলো স্থানীয় হাটবাজারের ইজারার অধিকার। এই ইজারা থেকে যুব কমপ্লেক্সের নেতারা বেতনের চেয়ে অনেক বেশি আয়

করতো। (অ্যান্টনি, ১৯৮৬) এভাবে দেশের যুব সমাজকেও দুর্নীতির দিকে ঠেলে দিয়েছিলেন তিনি। বিনিময়ে তিনি এদের ব্যবহার করতেন তাঁর দলের ক্যাডার হিশেবে।

এই ক্যাডার ছাড়া অন্য যুব সম্প্রদায় এবং ছাত্রদের তিনি বরং চেষ্টা করতেন রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে। সে জন্যে, বাংলাদেশ সৃষ্টির পরে তিনিই প্রথম চেষ্টা করেন তাদের খেলাধুলোর দিকে আকৃষ্ট করতে। এ জন্যে তিনি বাংলাদেশে অন্য দেশ থেকে খেলোয়াড়দের দল নিয়ে আসা ছাড়াও, দেশের ভেতরে খেলাধুলো সংগঠিত করতে চেষ্টা করেন।

এ ছাড়া, সহজেই চোখে পড়ার মতো যেসব উদ্যোগ নিয়েছিলেন, তা হলো : স্বনির্ভরতা এবং খাল খননের পরিকল্পনা। কথা ছিলো যে, স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে এসব খাল কাটা হবে। বুজে-যাওয়া নদী আবার বাঁচিয়ে তোলা হবে। তিনি বহু জায়গায় গিয়ে এ ধরনের খাল কাটার উদ্বোধন করেছিলেন। তিনি যেদিন যেতেন, সেদিন সেখানে হাজার হাজার লোক এসে মাটি কাটায় যোগ দিতেন এবং কয়েক গজ খাল কেটেও ফেলতেন। কিন্তু পরের দিন থেকে সে কাজ বন্ধ হয়ে যেতো। তারপর যেটুকু কাজ হতো, তা হতো 'খাদ্যের জন্যে কাজ' প্রোগ্যামের অধীনে। (অ্যান্টনি, ১৯৮৬) কোনো খাল পুরোপুরি কাটা হয়েছিলো জানা যায় না। কিন্তু যা জানা যায়, তা হলো : এর জন্যে যে যথেষ্ট অপচয় হয়েছিলো।

স্বনির্ভরতার জন্যে তিনি একটি আদর্শ গ্রাম বেছে নিয়েছিলেন—উলসি। সেখানে লাখ লাখ টাকা ব্যয় করে সত্যিই এক ধরনের সচ্ছলতা নিয়ে আসা হয়েছিলো। এই গ্রাম দেখিয়ে তিনি বলতেন যে, এ রকমের ৬৫ হাজার উলসি গড়ে তুলতে পারলেই বাংলাদেশ স্বনির্ভর হতে পারে। কিন্তু ৬৫ হাজার গ্রামের প্রতিটি গ্রামে তিনি লাখ-লাখ টাকা ব্যয় করতে রাজি ছিলেন না। বাংলাদেশের সে অর্থ ছিলোই না। অথচ উলসিকে তিনি একটি ধরতাই স্লোগানে পরিণত করেছিলেন।

দেশের যে প্রভূত উন্নতি হচ্ছে—এই ধারণা তৈরি সৃষ্টির জন্যে জিয়া বেশ কয়েকটি কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। তার মধ্যে একটি হলো নতুন নতুন রাস্তা নির্মাণ। কারণ রাস্তা নির্মাণই হলো সবচেয়ে এবং সবার আগে চোখে পড়ার মতো কাজ। রাস্তা দিয়েই তো মানুষ চলাফেরা করে! এ ছাড়া, আর-একটি পরিকল্পনা নিয়েছিলেন রাজধানী ঢাকাকে একটা চকচকে চেহারা দেওয়ার। পুরোনো ঢাকার পাশাপাশি তিনি গড়ে তুলেছিলেন একটি নতুন ঢাকা। এর কোনো কোনো পরিকল্পনা সম্ভবত মুজিবের আমলেই গৃহীত হয়েছিলো। কিন্তু তাদের বাস্তবায়ন ঘটে জিয়ার আমলে। কৃতিত্বও দাবি করেন তিনি। মোট কথা, তাঁর আমলে নতুন ঢাকার রাস্তাঘাট, বাড়িঘর সবই একটা

আধুনিক নগরীর চেহারা নিতে আরম্ভ করলো। রাস্তার নোংরা পরিষ্কার করার জন্যেও কর্মী নিয়োগ করা হয়। বিদেশীরা এসে এই নতুন ঢাকাকেই দেখতেন। পুরোনো ঢাকায় যেতেন না, অথবা যেতেন না বস্তি এলাকায়।

প্রকৃতিও জিয়ার আনুকূল্য করেছিলো। তাঁর আমলে বড়ো কোনো বন্যা অথবা খরা হয়নি। ফলে দেশে উৎপাদনের পরিমাণ ছিলো অপেক্ষাকৃত ভালো। যদিও তিনি উৎপাদনের বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে দেশকে স্বনির্ভরতা দিতে পারেননি। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগের মোকাবেলা করার প্রয়োজন হয়নি তাঁর।

আন্তর্জাতিক সমাজেও জিয়া বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে উন্নত করতে পেরেছিলেন। সত্যিকার অর্থে বৈদেশিক সম্পর্ক বিষয়ে মুজিব অতোটা মনোযোগ দেননি। কিন্তু জিয়া দিয়েছিলেন। তিনি তিরিশটিরও বেশি দেশ সফর করেছিলেন এবং এসব দেশের সবগুলোর না-হোক, অনেকগুলোর নেতাদের বাংলাদেশে নিয়ে এসেছিলেন। বিশেষ করে তিনি ইসলামী দেশগুলোর সম্মেলনে উৎসাহের সঙ্গে যোগ দেন এবং বাংলাদেশ যে একটা ইসলামী দেশ এটা প্রমাণের জন্যে কোনো প্রয়াস বাকি রাখেননি। বিনিময়ে এসব দেশের কাছ থেকে তিনি সামান্য কিছু ভিক্ষাও আদায় করতে সমর্থ হয়েছিলেন। সাহায্যের জন্যে তিনি ইউরোপীয় ইউনিয়নের কাছেও ধর্ণা দিয়েছিলেন। তা ছাড়া, ভারত এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছ থেকে সরে এসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনের ভালো খাতায় নাম লিখিয়েছিলেন।

দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে বড়ো এবং সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ ভারত। অন্য ছোটো দেশগুলোকে নিজের বাধ্যগত করে রাখার একটা প্রবণতা ভারতের থাকাই সম্ভব। সে জন্যে দক্ষিণ এশিয়ার সকল দেশকে নিয়ে জিয়া সার্ক গঠনে অগ্রণীর ভূমিকা পালন করেন। ভারতও এতে যোগ দেয়, ঠিকই। কিন্তু এ ছিলো অন্য দেশগুলোকে ভারতের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াস। তাই সার্ককে ভারত কখনো উৎসাহিত করেছে বলে জানা যায় না।

তবে এ কথা মনে রাখা দরকার যে, আন্তর্জাতিক সমাজে দেশের ভাবমূর্তি উন্নত করলেও; অথবা দেশের উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাকে উৎসাহিত করলেও, তিনি 'বাংলাদেশে'র চরিত্র বদলে দিয়েছিলেন। বাংলাদেশ গঠিত হয়েছিলো একটা ধর্মনিরপেক্ষ ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ফলে। বাংলাদেশের সংবিধান রচিত হয়েছিলো চারটি মূল আদর্শের ভিত্তিতে। এগুলো হলো গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সমাজতন্ত্র। নতুন দেশ দাঁড়িয়েছিলো এই চারটি স্তম্ভের ওপর। কিন্তু জিয়া বলতে গেলে সবগুলো স্তম্ভই ধ্বংস করেন একে একে। প্রথমেই ধ্বংস করেন গণতন্ত্র। মোশতাক ক্ষমতায় এসেছিলেন অগণতান্ত্রিক উপায়ে। তাঁকে ক্ষমতায় বসিয়েছিলো কয়েকজন বিদ্রোহী মেজর। কিন্তু তার পরও তিনি যে-সরকার গঠন করেন, তা ছিলো বেসামরিক সরকার।

অপর পক্ষে, জিয়াও ক্ষমতায় বসেছিলেন অবৈধ এবং অগণতান্ত্রিক উপায়ে। তাহেরের উস্কানিতে তাঁকে ক্ষমতায় বসিয়েছিলো সেপাইরা। তারপর সায়েম বাধ্য হয়ে দ্বিতীয়বার তাঁকে এ পদ প্রদান করেন অবৈধভাবে। কিন্তু মোশতাকের সঙ্গে তাঁর বড়ো পার্থক্য এই যে, তিনি বেসামরিক নয়, প্রতিষ্ঠিত করেন একটি ফৌজী সরকার। এ রকমের সামরিকীকরণের ফলে তাঁর গণতন্ত্র একদলীয় শাসনের থেকেও খারাপ চরিত্র লাভ করে। কেবল তাই নয়, তিনি তাঁর প্রশাসন কাঠামোতেও নিয়ে এসেছিলেন বহু সামরিক সদস্য। এর ফলে একদিকে গণতন্ত্র ব্যাহত হয়। অন্যদিকে, সামরিক বাহিনীর এই সদস্যদের দুর্নীতির দিকে ঠেলে দেওয়া হয়। এমন কি, সামরিক বাহিনী দেশের নিবেদিত সেবক না-হয়ে শাসকের মানদণ্ড ধরতে আগ্রহী হয়। তারই ধারা ধরে এরশাদ প্রায় এক দশক সামরিক শাসন চালিয়েছিলেন।

ধর্মনিরপেক্ষতার স্তম্ভ জিয়া ধ্বংস করেছিলেন তাঁর কলমের এক খোঁচায়। মুক্তিযোদ্ধা জিয়া জানতেন যে, মুক্তিযুদ্ধে মুসলমান-অমুসলমান সবাই অংশ নিয়েছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের মাশুলও দিতে হয়েছিলো মুসলমান-অমুসলমান সবারই। বাংলাদেশ মুসলমান-প্রধান দেশ—সন্দেহ নেই। কিন্তু বাংলাদেশের নাম বদল না-করেও তিনি তাকে এক অভিনব পন্থায় ইসলামী চেহারা দেন। যে-মুহূর্তে সংবিধানের সূচনা হয় 'পরম করুণাময় আল্লাহয় পূর্ণ বিশ্বাস রেখে' সে মুহূর্তে অমুসলমানদের সেই সংবিধান অনুযায়ী দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়। তাঁদের পরিণত করা হয় দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে। মুজিব বাংলাদেশে যে-রকমের ধর্মনিরপেক্ষতা প্রবর্তন করেছিলেন, তা ধর্মহীনতা ছিলো না। অথবা ছিলো না ইহলৌকিকতা। তা ছিলো সকল ধর্ম পালনের সমান স্বাধীনতা। সকল ধর্মের নাগরিকদের সমান অধিকার পাওয়ার প্রতিশ্রুতি।

আগেই বলেছি, বাংলাদেশ গঠিত হয়েছিলো বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে। পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমান-অমুসলমান সকল মানুষ একত্রিত হওয়ার একটি মাত্র সূত্র ছিলো, সে তাঁদের ভাষিক পরিচয়। সেই সম্মিলিত বাঙালিরা তারপর কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে আন্দোলন করেছিলেন বাংলাদেশের জন্যে। এমন কি, যুদ্ধও করেছিলেন সেই দেশের জন্যে। জিয়া নিজেও তা জানতেন। কেবল জানতেন না, সে কথা নিজেও তিনি লিখেছিলেন সাপ্তাহিক *বিচিত্রা* পত্রিকার '৭৪ সালের স্বাধীনতা দিবস সংখ্যায়। এতে তিনি লিখেছিলেন: 'পাকিস্তান সৃষ্টির পর পরই ঐতিহাসিক ঢাকা নগরীতে মি: জিন্না যেদিন ঘোষণা করলেন উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা, আমার মতে ঠিক সেদিনই বাঙালী হৃদয়ে অঙ্কুরিত হয়েছিল বাঙালী জাতীয়তাবাদ। জন্ম হয়েছিল বাঙালী জাতির।' এই বাঙালি জাতীয়তার জয়গান তিনি করেছিলেন মুজিব-হত্যার ষোলো/সতেরো মাস আগে। কিন্তু তিনি দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতা লাভের পরে বাংলাদেশের সেই 'বাঙালি' চরিত্র নিজেই বদলে দেন।

এই ক মাসের মধ্যে তাঁর চিন্তাধারা বদলে গিয়েছিলো বলে মনে করার কারণ নেই। ধারণা করি, এটা তিনি করেছিলেন নিজের জন্যে ডানপন্থী ইসলামী শক্তি এবং ভারত-বিরোধী শক্তির সমর্থন আদায় করার উদ্দেশ্যে। নিজের বিশ্বাসের চেয়েও তখন তাঁর কাছে বড়ো হয়ে দাঁড়ায় ক্ষমতায় টিকে থাকার গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি। যদি তাঁর ঐ লেখাটিকে বিশ্বাস করতে হয়, তা হলে এ কথা না-বলে উপায় নেই। আর, যদি তাঁর পরিবর্তিত 'বাংলাদেশী' পরিচয়কে বিশ্বাস করতে হয়, তা হলে তাঁর রচনাটিকে ভণ্ডামি বলে আখ্যায়িত করতে হয়। মোট কথা, 'বাঙালি'কে 'বাংলাদেশী'তে পরিণত করে তিনি সংবিধানের তৃতীয় স্তম্ভটিকে ধ্বংস করেছিলেন।

বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিকরা তাঁকে পিঠে করে ক্ষমতার আসনে বসালেও, তিনি নিজে কোনো কালেই সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করতেন না। মুজিবও করতেন না। কিন্তু মুজিবের সময় কার্যকারণে বহু শিল্প প্রতিষ্ঠান সরকারের হাতে এসে গিয়েছিলো। সমাজতন্ত্রের একটি শর্ত—রাষ্ট্রের মালিকানা এমনিতেই অংশত পূরণ হয়েছিলো। ক্ষমতায় এসে জিয়া বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসীদের উপদেশে সমাজতন্ত্রের দিকে এক পা-ও অগ্রসর হননি। বরং তাঁদের কাউকে ফাঁসি দেন, কাউকে দীর্ঘমেয়াদি কারাদণ্ড দেন। আর অনেক রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বিরাষ্ট্রীয়করণ করেন। কাজেই সংবিধানের বাকি স্তম্ভটিও তাঁর আঘাতে ভেঙে পড়েছিলো।

যে-জিয়া প্রাণ বাজি রেখে বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্যে লড়াই করেছিলেন, সেই জিয়াই বাংলাদেশের চার রাষ্ট্রীয় আদর্শকে বিনষ্ট করেন। তাই বলা যায়, গোড়াতে যে-বাংলাদেশ জন্মগ্রহণ করেছিলো, সেই বাংলাদেশকে এক অর্থে ধ্বংস করেন মুক্তিযোদ্ধা জিয়া। প্রথম বাংলাদেশ আর তাঁর শেষ বাংলাদেশে অনেক তফাৎ। আসলে, মুজিব সম্পর্কে যে-কথা প্রযোজ্য, জিয়া সম্পর্কেও সেই কথা সমান সত্য। নিরঙ্কুশ ক্ষমতা নিরঙ্কুশ বিকার লাভ করে। একনায়ক হয়ে জিয়া কেবল মানুষের মৌলিক অধিকার খর্ব করেননি, বাংলাদেশকে আমূল বদলে দিয়েছিলেন। তাঁর হাতে বাংলাদেশের ভাবমূর্তির পরিবর্তন কোন পর্যায়ে পৌঁছেছিলো, তার একটা ছোটো কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত দিতে পারি *অক্সফোর্ড রেফারেন্স ডিকশনারি* (১৯৮৫) থেকে। এতে পাকিস্তানের পরিচয় ইসলামী নয়; শ্রীলঙ্কার পরিচয় বিশেষ কোনো ধর্মীয় নয়, নেপালের পরিচয়ও ধর্মীয় নয়; আর ভারতের তো নয়ই। কিন্তু বাংলাদেশের পরিচয় দেওয়া হয়েছিলো একটি ইসলামী দেশ হিশেবে। এ থেকেই বোঝা যায়, জিয়া এবং তাঁর বিশ্বাসী উত্তরাধিকারী হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ কী নিপুণভাবে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ইসলামী ভাবমূর্তিকে তুলে ধরেছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে জিয়া ধার্মিক ছিলেন কিনা, জানিনে, অন্তত এরশাদ ছিলেন

না। কিন্তু ক্ষমতাকে জোরদার করার জন্যেই তাঁরা বাংলাদেশকে ইসলামী চেহারা দিয়েছিলেন। যেমন, ঢাকা বিমানবন্দরের ওপরে তিনটি ভাষায় লেখা বিমানবন্দরের নাম। ইংরেজি আন্তর্জাতিক ভাষা। বাংলা বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা। কিন্তু আরবি আসে কোন অধিকারে? দুই ফৌজী রাষ্ট্রপতির কীর্তি এটা। এটা প্রতীকী ইসলামী চেহারা।

আগেই বলেছি, জিয়ার আমলে প্রায় প্রতি তিন মাসে একটি করে অভ্যুত্থানের চেষ্টা চলে। শেষ পর্যন্ত '৮১ সালের ৩০শে মে তারিখে চট্টগ্রামে যে-অভ্যুত্থান ঘটে, তাতে তিনি নিহত হন। পোস্ট মর্টেম রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, তাঁর গায়ে আলাদা আলাদা বুলেটের চিহ্ন ছিলো অন্তত বিশটি। (অ্যান্টনি, ১৯৮৬)। একজনকে হত্যার জন্যে এতোগুলো বুলেট লাগে না। কিন্তু যে তাঁকে হত্যা করেছিলো, সে আক্রোশ নিয়েই করেছিলো। অনেক সময়ে মনে হয়, জিয়া যে-উচ্ছৃঙ্খল মেজর এবং তাদের সাগরেদদের বেআইনি হত্যার বিচার করেননি, তা-ই অন্যদেরও বিদ্রোহ করতে উৎসাহিত করেছিলো কিনা। কিন্তু করে থাকুক, অথবা না-ই থাকুক, মুজিব-হত্যা, সেরনিয়াবাত হত্যা, মণি-হত্যা এবং জেল হত্যাকে ক্ষমা করে জিয়া কোনো সৈনিক অথবা সৎ লোকের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেননি।

জিয়া খুনিদের বিচার না-করলেও, তাঁর বিশ্বস্ত জেনারেল, এরশাদ করেছিলেন। জিয়া হত্যার তদন্তের রিপোর্ট আজও প্রকাশিত হয়নি। এই হত্যার দায়ে যে-মুক্তিযোদ্ধাদের ফাঁসিতে ঝোলানো হয়েছিলো অথবা গুলি করে হত্যা করা হয়েছিলো, তারা এই ঘটনার সঙ্গে সত্যি সত্যি কতোটা জড়িত, তা-ও জানা যায় না। কিন্তু এরশাদ অন্তত লোক-দেখানো একটা বিচার করেছিলেন। হয়তো তিনি বিচার করেছিলেন বলেই ক্ষমতা থেকে সরতে হলেও, তাঁকে গুলি খেয়ে মরতে হয়নি।

এরশাদ ছিলেন জিয়ার যোগ্য অনুচর, এমন কি, তাঁর গুরু-মারা চেলা। গুরুর মতো তিনিও এক বিচারপতির আড়ালে কিছুদিন লুকিয়ে ছিলেন। তারপর বেরিয়ে আসেন সামনে। নিজেই প্রেসিডেন্ট হয়ে বসেন। জিয়া যা যা করেছিলেন, এরশাদ তার বেশ ভালো অনুকরণ করেছিলেন। জিয়া ক্ষমতায় এসেছিলেন, দেশের লোকেরা যখন বাকশালী ভীতিতে সন্ত্রস্ত। জিল্লুর রহমান খান লিখেছেন যে, বুদ্ধিজীবী সমাজ যখন জাতির পিতার জন্যে অশ্রু বর্ষণ করেননি, বরং এক ধরনের স্বস্তি লাভ করেছিলেন। (খান, ১৯৮৪) মুজিব-বিরোধী মনোভাবের পরিবেশে অনেকেই জিয়াকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। কিন্তু এরশাদ তেমন কোনো অনুকূল পরিবেশে ক্ষমতায় আসেননি। মার্কাস ফ্র্যান্ডার মতে, এরশাদ ক্ষমতায় এসেছিলেন দেশের ন্যূনতম সমর্থন নিয়ে। তিনি মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন না। সততার জন্যে তিনি পরিচিত ছিলেন না। এমন কি, দেশের লোকের কাছে তাঁর কোনো ক্যারিজমাও তৈরি হয়নি। (ফ্র্যান্ডা, ১৯৮২)।

তা সত্ত্বেও তিনি প্রায় এক দশক ধরে নিজের গদি রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তার কারণ, তিনি জিয়ার পদাঙ্কই নিখুঁতভাবে অনুসরণ করেছিলেন। বিচারপতি-প্রেসিডেন্টকে সরিয়ে দিয়ে গদিতে বসেছিলেন, নির্বাচন করেছিলেন, কারচুপি করেছিলেন, নতুন দল গঠন করেছিলেন। কী করে ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে রাখতে হয়, সে সবক তিনি জিয়ার বই থেকেই নিয়েছিলেন। তা ছাড়া, এরশাদের সম্ভবত একটা মানুষী চেহারা ছিলো। তদুপরি, ব্যবহার ছিলো ভদ্র। অসত্য ভাষণ এবং অভিনয়েও তিনি দক্ষ ছিলেন। যখন তাঁর বিরুদ্ধে আন্দোলন একেবারে প্রবল হয়ে উঠেছিলো, তিনি তখন খড়কুটো যা পান, প্রায় তা-ই ধরে বেঁচে থাকার বেপরোয়া চেষ্টা চালান। নিজে প্রবল ইসলাম-বিরোধী জীবন যাপন করলেও ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করেন। কেবল বাংলাদেশকে ইসলামিক রিপাবলিক ঘোষণা থেকে বিরত থাকেন। কিন্তু তাতেও ভরাডুবি থেকে রক্ষা পাননি। '৯০-এর শুরুতে তাঁকে ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়াতে হয় গণ-আন্দোলনের মুখে। কিন্তু তার আগে বাংলাদেশকে তিনি পুরোপুরি ইসলামী লেবাস পরান।

উপসংহার

ন মাসের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাঙালিরা তাঁদের স্বাধীনতা অর্জন করেছিলেন। এই স্বাধীন দেশে যে-ধরনের সর্বজনীন মানবাধিকার, আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য এবং গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতি গড়ে উঠবে বলে বাঙালিরা যুদ্ধের আগে প্রত্যাশা করেছিলেন, তা তাঁরা পাননি। কিন্তু তাঁরা ঔপনিবেশিক শাসনের নাগপাশ থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন।

বাঙালিরা শিল্প ও বাণিজ্যে কোনো কালে বিশেষ সাফল্য দেখাতে পারেননি। কিন্তু স্বাধীন দেশ গঠনের পর বাঙালিদের মধ্যে বহু উদ্যোগী ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতি দেখা দিয়েছেন। তা ছাড়া, বহির্বিশ্বে বাঙালিদের পরিচিতি আগে সামান্যই ছিলো। কিন্তু একটা স্বাধীন দেশের দৌলতে এখন তাঁদের পরিচিতি বিশ্বের সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়েছে। যে-বাংলা ভাষা ছিলো ভারতবর্ষের একটা আঞ্চলিক ভাষা, তা এখন বিশ্বের দরবারে সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত একটি বহুদেশীয় উন্নত ভাষা হিশেবে। জাতিসংঘেও সে ভাষায় বক্তৃতা শোনা যায়। একুশের ফেব্রুয়ারি বাঙালিদের ভাষা আন্দোলনের দিনকে স্মরণে রেখে একুশে এখন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিশেবে স্বীকৃত। কেবল তা-ই নয়, স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রভাষা হিশেবে বাংলা ভাষার বিকাশ ঘটার সম্ভাবনা থাকলো সীমাহীন। বাঙালি সংস্কৃতিও বিশ্বের দরবারে দিন দিন সুপরিচিত হয়ে উঠবে বলে মনে হয়।

একদিন বাঙালিদের পরিচয় ছিলো একটি ঘরকুনো জাতি হিশেবে। নিজের এলাকা আর পরিবেশের বাইরে যারা ক্বচিৎ যেতো। কিন্তু এখন বিশ্বের নানা দেশে আশি লাখেরও বেশি বাঙালি ছড়িয়ে পড়েছেন। সেও সম্ভব হয়েছে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সূত্র ধরে। পাকিস্তানের একটি প্রদেশ অথবা ভারতের একটি রাজ্যের প্রজা হিশেবে বাঙালির পক্ষে আজকের উচ্চতায় ওঠা সম্ভব হতো না।

এই ইতিবাচক অর্জন সবটাই সম্ভব হয়েছিলো স্বাধীনতার সোপান বেয়ে। বাঙালিদের এই স্বাধীনতা বাস্তবায়িত হয়েছিলো একজন বিশাল ক্যারিজমা-সম্পন্ন নেতার অসাধারণ ক্ষমতার দরুন। তিনি বহু-বিভক্ত বাঙালিদের ঐক্যবদ্ধ করতে না-পারলে কোনোদিনই বাঙালিরা স্বাধীন বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সমর্থ হতো না। শেখ মুজিব সে দিক দিয়ে বাংলাদেশের জন্মদাতা। বিতর্কাতীত জন্মদাতা। কিন্তু তাঁর সীমাবদ্ধতা ছিলো অন্য যে-কোনো মানুষের মতোই। সুতরাং তিনি বাংলাদেশকে জন্ম দিলেও, অভিপ্রেত পথে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে পারেননি। রাজনীতিক হিশেবে তিনি অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছিলেন। কিন্তু শাসক হিশেবে তিনি ছিলেন ব্যর্থ এবং অতি সাধারণ।

গত হাজার বছরে তাঁর থেকে প্রতিভাবান বাঙালি জন্মেছেন অনেকেই। কিন্তু তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের জন্মদাতা হিশেবে সর্বকালের ইতিহাসে একজন শ্রেষ্ঠ নেতা হিশেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তিনি বাংলা মায়ের চিরকালের এক শ্রেষ্ঠ সন্তান। তাঁর পরে যে-নেতারা এসেছেন, গায়ের জোরে অথবা তথাকথিত নির্বাচনভিত্তিক গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে, তাঁরা তাঁর তুলনায় খর্বকায় মাত্র। তাঁর বাংলাদেশকে আদর্শচ্যুত করেছেন তাঁরা। তা সত্ত্বেও বাঙালিরা একটা স্বাধীন দেশের নাগরিক হিশেবে মাথা উঁচু করে আজও বিশ্বসভায় দাঁড়িয়ে আছেন। বাংলা ভাষা, সাহিত্য এবং সংস্কৃতি উত্তরোত্তর এগিয়ে যাচ্ছে উন্নতির পথে।

উল্লিখিত গ্রন্থের তালিকা

আবদুল ওয়াহেদ তালুকদার, *৭০ থেকে ৯০ : বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট।* ঢাকা : পাণ্ডুলিপি, ১৯৯১।

আবদুল মতিন, *স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রবাসী বাঙ্গালী।* লন্ডন: রেডিকাল এশিয়ান পাবলিকেশনস, ১৯৮৯।

----------, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব: মুক্তিযুদ্ধের পর।* লন্ডন: রেডিকাল এশিয়ান পাবলিকেশনস, ১৯৯৯।

আবদুল মতিন ও আহমদ রফিক, *ভাষা আন্দোলন : ইতিহাস ও তাৎপর্য।* ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৯১।

আবু ওসমান চৌধুরী, ৮ নম্বর সেক্টরের অধিনায়কের কথা, *সেক্টর কম্যান্ডাররা বলছেন,* শাহরিয়ার কবির (সম্পাদক)। ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৫ (চতুর্থ মুদ্রণ)।

আবু তাহের, ১১ নম্বর সেক্টরের অধিনায়কের কথা, *সেক্টর কম্যান্ডাররা বলছেন,* শাহরিয়ার কবির (সম্পাদক)। ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৫ (চতুর্থ মুদ্রণ)।

আবু সাইয়িদ, *ফ্যাক্টস এ- ডকুমেন্টস।* ঢাকা : জ্ঞানকোষ, ১৯৮৮।

আবুসাদাত মোহাম্মদ সায়েম। *বঙ্গভবনে শেষ দিনগুলি।* ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৮।

আমীর-উল ইসলাম, *মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি।* ঢাকা : কাগজ প্রকাশনা, ১৯৯১।

এ কে খন্দকার ও অন্যান্য। *মুক্তিযুদ্ধের পূর্বাপর।* ঢাকা : প্রথমা, ২০০৯।

এইচ টি ইমাম, *বাংলাদেশ সরকার ১৯৭১।* ঢাকা : আগামী, ২০০৪।

একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়?। ঢাকা : মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র, ১৯৮৭।

একাত্তরের চিঠি (মুক্তিযোদ্ধাদের চিঠি)। ঢাকা : প্রথমা, ২০০৯।

এম আর আখতার মুকুল, *আমি বিজয় দেখেছি।* ঢাকা : অনন্যা : ২০০৭ (পুনর্মুদ্রণ; প্রথম সংস্করণ ১৯৮৫)।

এম এ জলিল, ৯ নম্বর সেক্টরের অধিনায়কের কথা, *সেক্টর কম্যান্ডাররা বলছেন,* শাহরিয়ার কবির (সম্পাদক)। ঢাকা : মওলা ব্রাদার্স, ২০০৫ (চতুর্থ মুদ্রণ)।

এম এ মঞ্জুর, ৮ নম্বর সেক্টরের অধিনায়কের কথা, *সেক্টর কম্যান্ডাররা বলছেন,* শাহরিয়ার কবির (সম্পাদক)। ঢাকা : মওলা ব্রাদার্স, ২০০৫ (চতুর্থ মুদ্রণ)।

এম এ হাসান, *যুদ্ধ ও নারী।* ঢাকা : তাম্রলিপি, ২০০৮।

এস. কে, বাশার, ৬ নম্বর সেক্টরের অধিনায়কের কথা, সেক্টর কম্যান্ডাররা বলছেন, শাহরিয়ার কবির (সম্পাদক)। ঢাকা : মওলা ব্রাদার্স, ২০০৫ (চতুর্থ মুদ্রণ)।

কাজী নূর-উজজামান, ২ নম্বর সেক্টরের অধিনায়কের কথা, *সেক্টর কম্যান্ডাররা বলছেন,* শাহরিয়ার কবির (সম্পাদক)। ঢাকা : মওলা ব্রাদার্স, ২০০৫ (চতুর্থ মুদ্রণ)।

কাদের সিদ্দিকী, *স্বাধীনতা ৭১।* কলকাতা : দেজ পাবলিশিং, ১৯৮৫।

কামাল হোসেন, *মুক্তিযুদ্ধ কেন অনিবার্য ছিল।* ঢাকা : মওলা ব্রাদার্স, ২০০৬ (চতুর্থ মুদ্রণ)।

----------, সাক্ষাৎকার, ১৮. ৯. ২০০৯।

কালীরঞ্জন শীল, 'জগন্নাথ হলে ছিলাম', রশীদ হায়দার সম্পাদিত *ভয়াবহ অভিজ্ঞতা* গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৬।

খালেদ মোশাররফ, ২ নম্বর সেক্টরের অধিনায়কের কথা, *সেক্টর কম্যান্ডাররা বলছেন,* শাহরিয়ার কবির (সম্পাদক)। ঢাকা : মওলা ব্রাদার্স, ২০০৫ (চতুর্থ মুদ্রণ)।

খালেদ মোশাররফ, *২ নম্বর সেক্টর এবং কে ফোর্স কম্যান্ডার খালেদের কথা।* ঢাকা : সেন্টার ফর বাংলাদেশ লিবারেশন স্টাডিজ, ২০০৯।

গাজীউল হক, *আমার দেখা আমার লেখা।* ঢাকা : মেরী প্রকাশন, ২০০০।

গোলাম মুরশিদ, রবীন্দ্রবিশ্বে *পূর্ববঙ্গ, পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রচর্চা।* ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩ (দ্বি. সং.)।

চিত্তরঞ্জন দত্ত, ৪ নম্বর সেক্টরের অধিনায়কের কথা, *সেক্টর কম্যান্ডাররা বলছেন,* শাহরিয়ার কবির (সম্পাদক)। ঢাকা : মওলা ব্রাদার্স, ২০০৫ (চতুর্থ মুদ্রণ)।

জাহানারা ইমাম, *একাত্তরের দিনগুলি।* ঢাকা : সন্ধানী ২০০৫ (পঞ্চবিংশতি সং.)।

----------, 'সাক্ষাৎকার', *প্রথম আলো,* ঈদ সংখ্যা, ২০০৯।

জিয়াউর রহমান, 'একটি জাতির জন্ম', *বিচিত্রা,* স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা, ১৯৭৪।

----------, ১ নম্বর সেক্টরের অধিনায়কের কথা, *সেক্টর কম্যান্ডাররা বলছেন,* শাহরিয়ার কবির (সম্পাদক)। ঢাকা : মওলা ব্রাদার্স, ২০০৫ (চতুর্থ মুদ্রণ)।

বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি,* তৃতীয় খণ্ড। চট্টগ্রাম : বইঘর, ১৯৮৫।

----------, *সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা।* ঢাকা : মওলা ব্রাদার্স, ১৯৬৯।

বাসন্তী গুহঠাকুরতা, *একাত্তরের স্মৃতি।* ঢাকা : ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯১।

বেলাল মোহাম্মদ, *স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র।* ঢাকা : অনুপম প্রকাশনী, ২০০৬ (চতুর্থ সং, পুনর্মুদ্রণ)।

মঈদুল হাসান, *মূলধারা '৭১।* ঢাকা : ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯২ (দ্বি. সং.)।

মওদুদ আহমদ, বাংলাদেশ : *শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল।* ঢাকা : ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৩।

মতিউর রহমান, *ইতিহাসের সত্য সন্ধানে।* ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৪।

মাহবুব আলম, *গেরিলা থেকে সম্মুখ যুদ্ধে।* দুই খণ্ড। ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৭ (চতুর্থ মুদ্রণ)।

মীর শওকত আলী, ৫ নম্বর সেক্টরের অধিনায়কের কথা, *সেক্টর কম্যান্ডাররা বলছেন,* শাহরিয়ার কবির (সম্পাদক)। ঢাকা : মওলা ব্রাদার্স, ২০০৫ (চতুর্থ মুদ্রণ)।

মুনতাসীর মামুন (সম্পাদক), *একাত্তরের বিজয়গাথা।* ঢাকা : আগামী, ১৯৯২।

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান, *পূর্বাপর ১৯৭১ : পাকিস্তানী সেনা-গহ্বর থেকে দেখা।* ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৯ (দ্বি. সং.)

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *বাংলাদেশের তারিখ।* ঢাকা : মওলা ব্রাদার্স, ২০০৮ (তৃতীয় সং.)।

মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, সাক্ষাৎকার, ২৮. ৯. ২০০৯।

রফিকুল ইসলাম, *একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে।* ঢাকা : ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৮ (তৃতীয় মুদ্রণ)।

রফিকুল ইসলাম (বীর উত্তম), ১ নম্বর সেক্টরের অধিনায়কের কথা, *সেক্টর কম্যান্ডাররা বলছেন,* শাহরিয়ার কবির (সম্পাদক)। ঢাকা : মওলা ব্রাদার্স, ২০০৫ (চতুর্থ মুদ্রণ)।

----------, সাক্ষাৎকার, ২০. ৯. ২০০৯।

রেহমান সোবহান, *বাংলাদেশের অভ্যুত্থান : একজন প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য।* ঢাকা : ভোরের কাগজ প্রকাশনী, ১৯৯৪।

সফিউল্লাহ, ৩ নম্বর সেক্টরের অধিনায়কের কথা, *সেক্টর কম্যান্ডাররা বলছেন,* শাহরিয়ার কবির (সম্পাদক)। ঢাকা : মওলা ব্রাদার্স, ২০০৫ (চতুর্থ মুদ্রণ)।

শাফায়াত জামিল, *একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ রক্তাক্ত মধ্য-আগস্ট ও ষড়যন্ত্রময় নভেম্বর।* ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৯ (তৃতীয় মুদ্রণ)।

শাহরিয়ার কবির, *সেক্টর কম্যান্ডাররা বলছেন : মুক্তিযুদ্ধের স্মরণীয় ঘটনা।* ঢাকা : মওলা ব্রাদার্স, ২০০৫ (চতুর্থ সং.)।

শেখ মুজিবুর রহমান, 'শোষিতের গণতন্ত্র চাই', ২৬ মার্চ ৭৫ তারিখে প্রদত্ত বক্তৃতা। ঢাকা : তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়, তারিখ নেই।

সুপ্রকাশ রায়, ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড। কলকাতা : বিদ্যোদয় লাইব্রেরী, ১৯৭০।

স্বরোচিষ সরকার, *একাত্তরের বাগেরহাট।* ঢাকা : সাহিত্য বিলাস, ২০০৬।

হামিদুল্লাহ খান, ১১ নম্বর সেক্টরের অধিনায়কের কথা, *সেক্টর কম্যান্ডাররা বলছেন,* শাহরিয়ার কবির (সম্পাদক)। ঢাকা : মওলা ব্রাদার্স, ২০০৫ (চতুর্থ মুদ্রণ)।

News Papers

London

Daily Telegraph, 27. 3; 29. 3; 30. 3; 2. 4; 3. 6; 3. 7.71

Evening News, 26.3; 1971

Evening Standard, 26 3; 27. 3; 29. 3; 8. 4; 14. 4; 20, 4; 5. 6. 71.

Express, 28. 3.

Financial Times, 27. 3. 1971

Guardian, 27. 3; 29. 3; 31. 3; 3. 4; 5. 4; 7. 4; 12. 4; 16. 4; 17. 4; 15. 5; 5. 6. 1971

Spectator, 19. 6. 1971

Sunday Observer, 4. 4; 18. 4; 6. 6; 1971

Sunday Telegraph, 28. 3; 1971

Sunday Times, 4. 4; 18. 4; 3. 6; 13. 6. 1971

Times, 26. 3; 27. 3; 30. 3; 1. 4.; 3. 4; 17. 4; 24. 4; 19. 4; 27. 5; 28. 5; 5. 6; 7. 6; 7. 7. 1971

Paris

Herald Tribune, 6. 7.

US

News Week, 5. 4; 28. 6.

Books

Ahmad, Salim., *Blood Beaten Track: Sheikh Mujib's Nine Months in Pakistan Prison*. Lahore: Book Traders, 1997. (পাকিস্তানী জেলে শেখ মুজিবের আটক থাকার এবং তাঁর বিচারের তথ্যপূর্ণ আলোচনা।)

Ahmed, M . *South Asia : Crisis of Development.* Dhaka : UPL, 2002.

----------, *Democracy and the Challenge ɔf Development,* Dhaka : UPL, 1995.

Ahmed, O., *Revolution Military Personnel and the War of Liberation in Bangladesh*. Dhaka: Dizzy Publication, 204 (2nd ed.).

Ali, Rao F., *How Pakistan Got Divided*. Lahore: Jang Publishers, 1992. (বাংলাদেশ-বিরোধী পাকিস্তানী জেনারেলের বানোয়াট কাহিনী এবং একপেশে বিবরণ।)

Azad, S., *Contribution of India in the War of Liberation of Bangladesh*. New Delhi: Bookwell, 2006. (বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদান-সম্পর্কিত তথ্যবহুল গ্রন্থ। বিশ্লেষণ কম।)

Calcutta University Calendars, 1901, 1940-46.

Dixit, J.N. *Liberation and Beyond : Indo-Bangladesh Relations.* Dhaka : UPL, 1999.

Franda, M., *Bangladesh: The First Decade*, New Delhi: South Asian Publishers, 1982. (তথ্য ও তত্ত্বমূলক গ্রন্থ।)

Gautam, P. K., *Operation Bangladesh*. New Delhi: Manas Publications, 2007.

Islam, R., *A Tale of Millions: Bangladesh Liberation War*. Dhaka: Muktadhara, 1986 (Reprint). (মুক্তিযুদ্ধ-সম্পর্কিত অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। হয়তো লেখকের নিজরে ভূমিকা বিষয়ে কিছু বেশি কথা আছে।)

Jagmohan, *The Black Book of Genocide in Bangladesh*. New Delhi: Geeta Book Centre, 1971.

Kabir, M. G., *Changing Face of Nationalism: The Case of Bangladesh*. New Delhi: South Asian Publishes, 1994. (বাঙালি মুসলমানদের দোদুল্যমান স্বরূপ সম্পর্কে তথ্য ও তত্ত্বমূলক আলোচনা।)

Kabir, M., *Experiences of an Exile at Home: Life in Occupied Bangladesh*. Dhaka: N. Kabir, 1972. (মুক্তিযুদ্ধের সময়ে বাংলাদেশের ভেতরে সাধারণ মানুষরা কী কষ্টের মধ্যে ছিলেন, সে বিষয়ে তথ্যমূলক আলোচনা।)

Kamal, A., *State Against the Nation: The Decline of the Muslim League in Pre-independence Bangladesh, 1947-54*. Dhaka: The University Press Ltd., 2009.

Khan, Z. A., The Way it Was. Karachi: Dynavis, 1998. (পাকিস্তানী জেনারেলের একপেশে আলোচনা।)

Khan, Z. R., *Martial Law to Martial Law: Leadership Crisis in Bangladesh*. Dhaka: The University Press, 1984 (First Bangladesh ed.) (তথ্য ও তত্ত্বমূলক অত্যন্ত মূল্যবান আলোচনা।)

Maniruzzaman, T. *The Bangladesh Revolution and its Aftermath*. Univeristy Press Ltd, 1988 (2nd ed.). (মূল্যবান গ্রন্থ।)

Mascarenhas, A., *The Rape of Bangladesh*. New Delhi: Vikas Publishers, 1971. (এই গ্রন্থের মধ্য দিয়ে বিশ্ববাসী বাংলাদেশে পাকিস্তানী হামলার বিস্তৃতি এবং ভয়াবহতা সম্পর্কে জানতে পান।)

----------, *Bangladesh: A Legacy of Blood*. London: Hodder and Stoughton, 1986. (তথ্য ও তত্ত্বপূর্ণ অত্যন্ত মূল্যবান গ্রন্থ।)

Niazy, A. A. Khan, *The Betrayal of East Pakistan*. Karachi: Oxford University Press, 1988. আমি ব্যবহার করেছি প্রধানত মিজানুর রহমান কল্লোলের বাংলা অনুবাদ, *দ্য বিট্রেয়াল অব ইস্ট পাকিস্তান।* ঢাকা : আফসার ব্রাদার্স, ২০০৮। মূল বই থেকেও কোথাও কোথাও ব্যবহার করেছি। বাংলা উদ্ধৃতিতে ভাষার কিছু পরিবর্তনও করেছি।

Rummel R. J., *Death by Government.* New Burnswick: Transaction Publishers, 1994. (বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সরকারী উদ্যোগে পরিচালিত গণহত্যার মূল্যবান আলোচনা।)

Safiullah, K. M., *Bangladesh at War*. Dhaka: Academic Publishers, 1989.

Siddiqi, A. R., *East Pakistan: The Endgame: An Onlooker's Journal.* Karachi: Oxford University Press, 2004.

Salik, Siddiq, *Witness to Surrender*. Karachi: Oxford University Press, 1978. আমি ব্যবহার করেছি প্রধানত মাসুদুল হকের বাংলা অনুবাদ, *নিয়াজীর আত্মসমর্পণের দলিল।* ঢাকা : নভেল পাবলিকেশনস, ১৯৮৮। মূল বই থেকেও কোথাও কোথাও ব্যবহার করেছি। বাংলা উদ্ধৃতিতে ভাষার কিছু পরিবর্তনও করেছি।

Sarkar, Sumit, *The Swadeshi Movement and Partition of Bengal.* Ne Delhi: The People's Publishing House, 1973.

Singh, L., *Victory in Bangladesh.* Dehra Dun: Nataraj Publishers, 1981. (ভারতীয় জেনারেলের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা মুক্তিযুদ্ধের বিশেষ করে ডিসেম্বরের যুদ্ধের মূল্যবান আলোচনা।)

Umar, B., *The Emergence of Bangladesh*, Vol. 2. Karachi: Oxford University Press, 2006. (তথ্য ও বিশ্লেষণপূর্ণ আলোচনা। সর্বত্র বামপন্থীদের বিশেষ দৃষ্টিকোণ লক্ষ করার মতো। সে জন্যে কোথাও কোথাও একপেশে।)

নির্বাচিত নির্ঘণ্ট